সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জাল প্রতাপচাঁদ

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী
সম্পাদিত

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

JAAL PRATAP CHAND

of

Sanjib Chandra Chattopadhaya

Edited By

Jajneswar Chauduri

প্রকাশক ঃ
শ্রীমতী আনন্দময়ী চৌধুরী
৫এ, শান্তিনগর বাই লেন
পোঃ-ভদ্রকালী (উত্তরপাড়া)
জেলা-হুগলী
পিন-৭১২ ২৩২

প্রচ্ছদ ঃ
অমিয় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ মুদ্রক ঃ
ওয়েলনোন প্রিণ্টার্স
রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৯

মুদ্রক ঃ
শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স
৩২, বিডন রো
কলিকাতা-৬

জাল প্রতাপচাঁদ

বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Published By Radhanath Banerjee
For The Propreitor
1883

বিজ্ঞাপন

আমাদের ইতিহাস নাই। যাহা আমরা বাঙ্গালীর ইতিহাস বলিয়া পাঠ করি, তাহা ইংরেজের ইতিহাস বঙ্গভূমে ইংরেজের কীর্ত্তিকলাপকে বাঙ্গালীর জিনিষ বলিয়া আমরা এখন গ্রহণ করিতেছি। এই ভ্রম দূর করিবার সময় এখনও হয় নাই। যখন সে সময় উপস্থিত হইবে, তখন ইতিহাসোপযোগী উপকরণের অভাব না হয়, এই প্রত্যাশায় এক এক সময়ের সামাজিক দুই চারিটা কথা লিখিয়া রাখিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। সেইজন্য আপাততঃ জাল রাজাকে উপলক্ষ করা গিয়াছে।

যাহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার অনেক অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মুদ্রাঙ্কনের ভুল থাকায় স্থানে স্থানে ভাষার দোষ ঘটিয়াছে, তাহা ভাষাজ্ঞ মাত্রেই বুঝিবেন, এইজন্য আর সতন্ত্র শুদ্ধিপত্র দেওয়া গেল না।

জাল প্রতাপচাঁদ

বর্দ্ধমান রাজার গল্প

১

পূর্ব্ব কথা

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইতে চলিল, হুগলীতে জাল রাজার মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সে প্রতাপচাঁদ নাই, সে পরাণবাবু নাই, সে জজ নাই, সে মেজেষ্টার নাই, সে মহিবুল্লা দারোগা নাই, সে আসাদ আলি নাজির নাই, সে মনসারাম সেরেস্তাদার নাই; সুতরাং এ পুরাতন কথা তুলিলে কাহারও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। দুই একজন সাক্ষী অদ্যাপি জীবিত আছেন, ভরসা করি তাঁহারা আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া ক্ষমা করিবেন।

আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ ছিল, বিচারপ্রণালী কিরূপ ছিল, আর সে সময়ে আমাদের এই অঞ্চলের এই বাঙ্গালিরা কিরূপ ছিলেন, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা জাল রাজার কথা আলোচনা করিতে বসিয়াছি। মোকদ্দমা সম্বন্ধে যে সকল কাগজপত্র সেই সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া এই বিষয়টি লিখিলাম। এই স্থলে বলিয়া রাখি যে, লেখক নিজে সেই সময় হুগলীতে উপস্থিত ছিলেন, তখন তাঁহার বয়স অল্প, কিন্তু এই মোকর্দ্দমা লইয়া ঘরে ঘরে যেরূপ হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল তাহা তাঁহার স্মরণ আছে।

এ অঞ্চলের স্ত্রীলোক মাত্রেই জাল রাজার পক্ষপাতী হইয়াছিল। তাহারা গঙ্গার ঘাটে গিয়া, আপনার কথা ভুলিয়া, শিবপূজা ভুলিয়া, কেবল প্রতাপচাঁদের কথা কহিত। ভিক্ষুকেরা কৃষ্ণগীত ছাড়িয়া কেবল প্রতাপচাঁদের গীত গাইত, প্রতাপচাঁদের জয় হউক বলিয়া তাহারা ভিক্ষা চাহিত। ভিক্ষুকদের গীত বালকেরা শিখিয়া পথে ঘাটে দল বাঁধিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাইত—"পরাণবাবু, হয়ে কাবু, হাবুডুবু খেতেছে," এই গীত যখন তখন যেখানে সেখানে তাহাদের মুখে শোনা যাইত।

মূল কথা, এই অঞ্চলের কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই জাল রাজার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল। মোকদ্দমার সময় হুগলীর চতুষ্পর্শ্বস্থ দুই তিন ক্রোশের অন্যূন দশ হাজার লোক নিত্য আদালতে আসিয়া গাছতলায় উপস্থিত হইত। জেল-খানার দ্বার হইতে কাছারি পর্য্যন্ত পথে ঠাসাঠাসি করিয়া দাঁড়াইত। যাহারা পথে স্থান পাইত না, তাহারা গাছে চড়িয়া বসিয়া থাকিত। যে দিকে চাও সেই দিকেই লোক, লোকের উপর লোক—পথে, গাছে, ছাদে। এত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর মধ্য দিয়া জাল

রাজাকে পদব্রজে কাছারিতে পাঠাইতে জেল দারোগার সাহস হইত না। সুতরাং পালকী করিয়া শত সিপাহী দ্বারা তাঁহাকে ঘেরাইয়া পাঠান হইত। তাহাতে কেহ জাল রাজাকে দেখিতে পাইত না, পাল্কীর ছাদ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। লোকে তাহাতেই তৃপ্ত হইত। নিঃশব্দে অতি গম্ভীরভাবে তাহারা তাহাই দেখিত, আর এক এক দিন এক বাক্যে আকাশ পূরিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত "জয় হউক"। দশ সহস্র কণ্ঠধ্বনি একত্রে—সে গম্ভীর শব্দে যেন দশদিক শিহরিয়া উঠিত। বাঙ্গালী তখনও সজীব, তখনও দশ হাজার লোক একজনের নিমিত্ত একত্রে চীৎকার করিতে পারিত। পেনাল কোডের ভয়ে হউক, অথবা অন্য কারণে হউক, এখন দশজন লোকের কণ্ঠ একত্রে স্ফূর্ত্তি হয় না। মানুষের নিমিত্ত একত্রে চীৎকার আর শুনা যায় না, যাহা এখন শুনা যায়, তাহা শব বাহকের চীৎকার—পথ হইতে লোক তাড়াইবার চীৎকার।

এখন সে সকল কথা অনর্থক। যাহারা জাল রাজাকে দেখিবে বলিয়া পথে দাঁড়াইয়া থাকিত তাহারা জাল রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আদালতে গিয়া গাছতলায় দাঁড়াইত; কে কে সাক্ষী দেয়, কে কি বলে শুনিয়া যাইত, গ্রামে গিয়া সেই সকল পরিচয় দিত। যে দিবস সাক্ষীরা প্রতাপচাঁদের সাপেক্ষ কথা বলিত, সে দিবস আর আহ্লাদের সীমা থাকিত না; সে দিন গঙ্গার বক্ষে শত শত নৌকা ছুটাছুটি করিত, ময়রার দোকানে খরিদ্দারের উপর খরিদ্দার ঝুঁকিত। ঘরে ঘরে সত্যনারায়ণের সিন্নি হইত। আর যে দিবস সাক্ষীরা বিপক্ষতা করিত, সে দিবস লোকে একপ্রকার ক্ষিপ্তপ্রায় হইত। সাক্ষীর প্রাণরক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিত। একদিন একজন মেচুনী কোন সম্ভ্রান্ত সাক্ষীর শিরে আঁইশ চুবড়ি নিক্ষেপ করিয়াছিল।

প্রতাপচাঁদের দুর্গতি সকলের অন্তঃকরণ স্পর্শ করিয়াছিল। জাল প্রমাণের পূর্ব্বেই তাঁহার পীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্ব রটনা অনুরোধেই হউক, আবালবৃদ্ধ সকলেই জাল রাজার স্বাপক্ষ হইয়াছিল।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর এই রটনা হইয়াছিল যে, প্রতাপচাঁদ কোন পাপিষ্ঠার কৌশলে পড়িয়া মহাপাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস গিয়াছেন—মরেন নাই। প্রকাশ্যে গৃহত্যাগ করিলে যদি অজ্ঞাতবাস সিদ্ধ না হয়, তাই তিনি কালনার ঘাটে শব সাজিয়াছিলেন। এ রটনা সহজেই লোকে বিশ্বাস করিল। বিশ্বাসের তাৎপর্য্যও ছিল। একে যুবা, তাহাতে আবার রাজপুত্র, ঐশ্বর্য্যাদি সকল ছাড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিলেন! এরূপ যাওয়াই বীরত্ব। এ বীরত্বের কথা শুনিয়া বাঙ্গালির অন্তঃকরণে কেমন এক প্রকার পবিত্র সুখ উদয় হইল। সে পবিত্র সুখ লোকে ত্যাগ করিতে পারিল না। সুতরাং সকলে এ রটনা বিশ্বাস করিল, প্রতাপচাঁদের উপর লোকের ভালবাসা বাড়িল, সকলেই ঘরে বসিয়া তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল। "আহা! ভালয় ভালয় আবার ফিরিয়া আসুন"—এ কামনা স্ত্রীলোক মাত্রেই করিল।

পনর বৎসর পরে একজন আসিয়া বলিল, আমি প্রতাপচাঁদ। তৎক্ষণাৎ সকলের অন্তঃকরণ একেবারে উথলিয়া উঠিল। সকলেই ভাবিল, তাঁহার আসিবার ত কথাই ছিল। কিন্তু যখন লোকে শুনিল, প্রতাপচাঁদকে বর্দ্ধমান হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, মেজেস্টার তাঁহাকে কয়েদ করিয়াছে, তখন লোকের আর সহ্য হইল না। তাহাই এতটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল পরিচয় আনুপূর্ব্বিক দিবার অগ্রে প্রতাপচাঁদের পিতা মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কেন না, পরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা অনেকটা সেই প্রকৃতির ফল। দুই একটি ঘটনা বলিলে তাঁহার প্রকৃতি সহজেই অনুভব হইতে পারিবে।

২

তেজচন্দ্র বাহাদুর

(বর্দ্ধমানের বুড়া রাজা)

প্রতিদিন প্রাতে দেওয়ান, মোহসাহেব, ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা, অন্দরমহলের দ্বারে আসিয়া তেজচন্দ্র বাহাদুরের বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতেন; তেজচন্দ্র যথাসময়ে এক স্বর্ণপিঞ্জর হস্তে বহির্গত হইতেন, পিঞ্জরে কতকগুলি "লাল" নামা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী আবদ্ধ থাকিত, তিনি তাহাদের ক্রীড়া ও কোন্দল দেখিতে দেখিতে আসিতেন। সম্মুখবর্ত্তী হইবা মাত্র তাঁহাকে সকলে অভিবাদন করিত, মহারাজও হাসিমুখে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিতেন। একদিন প্রাতে তিনি পিঞ্জর হস্তে অন্দরমহল হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময় একজন প্রধান কর্ম্মচারী অগ্রসর হইয়া যোড়করে নিবেদন করিল, "মহারাজ হুগলীতে খাজনা দাখিল করিবার নিমিত্ত সে দিবস যে এক লক্ষ টাকা পাঠান হইয়াছিল, তাহা তথাকার মোক্তার আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়াছে।" তেজচন্দ্র বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "চুপ। হামারা লাল ঘবরাওয়েগা!" এক লক্ষ টাকা গেল শুনিয়া তাঁহার কষ্ট হইল না, কিন্তু কথার শব্দে লালপক্ষী ভয় পাইবে এইজন্য তাঁহার কষ্ট হইল! এই মনে করিয়া কর্ম্মচারী বড় রাগ করিলেন, পাপীষ্ঠ মোক্তারকে সমুদয় টাকা উদগীরণ করাইব, নতুবা কর্ম্ম ত্যাগ করিব এই সংকল্প করিলেন। মোক্তারের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল যে, মোক্তার আপন বাটীতে বসিয়া পুষ্করিণী কাটাইতেছে, দেউল দিতেছে, আর যাহা মনে আসিতেছে, তাহাই করিতেছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য রাজসরকার হইতে সিপাহী ও হাওয়ালদার বাহির হইল। কিন্তু রাজা তেজচন্দ্র তাহা জানিতেন না। মোক্তার ধৃত হইয়া রাজবাটীতে আনীত হইলে তেজচন্দ্র বাহাদুর মোক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঃ—

"তুমি আমার এক লক্ষ টাকা চুরি করিয়াছ?

মোক্তার। না, মহারাজ, আমি চুরি করি নাই, আমি তাহা বাটীতে লইয়া গিয়াছি।

তেজচন্দ্র। কেন লইয়া গেলে?

মোক্তার। মহারাজের কার্য্যে ব্যয় করিব বলিয়া লইয়া গিয়াছি। আমাদের গ্রামে একটীও শিবমন্দির ছিল না, কুমারীরা শিবমন্দিরে দীপ দানের ফল পাইত না, যুবতীরা শিবপূজা করিতে পাইত না। এক্ষণে মহারাজের পুণ্যে তাহা পাইতেছে। আর, একটি অতিথিশালা করিয়াছি, ক্ষুধার্ত্ত পথিকেরা এখন অন্ন পাইতেছে।

তেজচন্দ্র। তুমি কি সমুদয় টাকা ইহাতেই ব্যয় করিয়াছ?

মোক্তার। আজ্ঞা না মহারাজ! আমাদের দেশে বড় জলকষ্ট ছিল; গোবৎসাদি দুই প্রহরের সময় একটু জল পাইত না, আমি মহারাজের টাকায় একটি বড় পুষ্করিণী কাটাইয়াছি। মহারাজের পুণ্যে তাহার জল কিরূপ আশ্চর্য্য পরিষ্কার ও সুস্বাদু হইয়াছে, তাহা সিপাহীদের জিজ্ঞাসা করুন।

তেজচন্দ্র। পুষ্করিণীটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছ?

মোক্তার। আজ্ঞা না, টাকায় কুলায় নাই।

তেজচন্দ্র। এখন কত টাকা হইলে প্রতিষ্ঠা হয়?

মোক্তার। নূন্যকল্পে আর দুই হাজার টাকা চাই।

তেজচন্দ্র। কিন্তু দেখ!—খবরদার।—দুই হাজার টাকার এক পয়সা বেশী না লাগে, তাহা হইলে আর আমি দিব না।

তাহার পর পূর্ব্বকথিত কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া মহারাজ বলিলেন, আমি ত মোক্তারের কোন দোষ দেখিতে পাইলাম না। মোক্তার যাহা করিয়াছে, তাহাতে আমার টাকা সার্থক হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আমি আর কি ভাল ব্যয় করিতাম। কর্ম্মচারী নিরুত্তর হইল।

মহারাজ তেজচন্দ্রের মধ্যবয়সের একটা কথা বলি, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্রের আর একদিকে দৃষ্টি হইবে। তিনি একদিন একটি দরিদ্র বালিকাকে পথে খেলিতে দেখিলেন, বালিকা পরমা সুন্দরী। মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহার পিতার সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। লোক আসিয়া বলিল পিতার নাম কাশীনাথ,[১] জগন্নাথ দর্শনে[২] যাইবে বলিয়া সপরিবারে লাহোর[৩] হইতে এখানে আসিয়াছে। জাতিতে ক্ষত্রিয়। মহারাজের আর বিলম্ব সহিল না, দরিদ্রকে অর্থলোভ দেখাইয়া কন্যাটিকে বিবাহ করিলেন। তিনিই মহারাণী কমলকুমারী।[৪]

সেই অবধি দরিদ্র কাশীনাথের অদৃষ্ট ফিরিল, পুত্র লইয়া তিনি বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পুত্রটী বালক, তাহার নাম পরাণ[৫]—তিনি আমাদের এই গল্পের পরাণবাবু।

যেরূপ এক্ষণে বর্দ্ধমান রাজগোষ্ঠী বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য হইতে চাহেন না, পূর্ব্ব-রাজারা সেরূপ "এক ঘরের" মত থাকিতেন না। আপনাদের বাঙ্গালী বলিয়া জানিতেন, বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেন। এদেশী প্রধান ও ধনবানদের সঙ্গে আত্মীয়তা রাখিতেন। তেজচন্দ্র বাহাদুর মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন, এ অঞ্চলের যাবতীয় প্রধান লোকের সহিত মিশিতেন, সকলে তাঁহাকে সম্মান করিতেন,

তিনিও সকলকে ভালবাসিতেন, অনেকের বাড়ী পর্য্যন্ত যাইতেন, সালিখার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় মধ্যে মধ্যে গিয়া "প্রমারা" খেলিতেন। একদিন খেলিবার সময় মহারাজের হাতে "মাছ" জুটিল। তখন রাধামোহনবাবুর হাতে "কাতুর" ছিল ; দুই প্রধান "দান", সুতরাং দুইজনেই "ডাকাডাকি" চলিল। ক্রমে দেড় লক্ষ পর্য্যন্ত "ডাক" উঠিল। রাধামোহনবাবু দেড় লক্ষ টাকা সহিলেন। শেষে মহারাজ "মাছ" দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে দেড় লক্ষ টাকার নোট লইয়া চলিয়া আসিলেন।

এই সময় এ অঞ্চলে প্রমারা অতিশয় চলন ছিল। সকলেই প্রমারা খেলিত, পাড়ায় পাড়ায় প্রমারার আড্ডা ছিল। বালকেরা পর্য্যন্ত এ খেলায় দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। কোজাগর লক্ষী পূজার রাত্রে নারিকেল জল খাওয়া যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল, সেইরূপ ঐ কোথাও বা শ্যামা পূজার রাত্রে প্রমারা খেলাও অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। এমনকি, কলিকাতার সুবর্ণ বণিকদিগের মধ্যে অদ্যাপি প্রথা আছে যে, দেওয়ালি পর্ব্ব উপলক্ষে প্রমারা খেলিবার টাকা তাহারা জামাতাদের পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। কেহ আর প্রমারা খেলে না, তথাপি প্রমারা খেলার টাকা অদ্যাপি দিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন রাস যাত্রায়, ঝুলন যাত্রায়, বা যে কোন যাত্রায় পূর্ব্বে যেখানে লোক সমারোহ হইত, সেইখানেই প্রমারার দোকান খুলিত, বড় বড় বাটী ভাড়া করিয়া আড্ডাধারীরা পরিষ্কার দোসুতি বিছাইয়া তাহার উপর প্রমারার নূতন তাস সাজাইয়া বসিত। ক্রমে ক্রমে সেই আড্ডায় খেলওয়াড় জমিতে আরম্ভ হইত, শেষ বাটীর উপর, নীচ তলায় দালানে, বারেণ্ডায়, উঠানে কোথাও আর স্থান থাকিত না, সর্ব্বত্র প্রমারা চলিত। সে সময় দেখিতে চমৎকার! খেলোয়াড়রা চক্ষু নাশা উভয় কুঞ্চিত করিয়া একাগ্র চিত্তে তাস টিপিতেছেন, একবারে খুলিয়া দেখিতে সাহস হয় না, তাহাই তাস ক্রমে ক্রমে টিপিয়া দেখিতেছেন, ভয় আছে পাছে "ফিগরু" সরিয়া থাকে। পাছে বাজে রং সরিয়া থাকে! তাহা হইলেই সর্ব্বস্ব যাবে। আবার, যদি যাহা ধরিয়াছি তাহাই আসিয়া থাকে, যদি তেরেস্তার উপর পঞ্জা সরিয়া থাকে, তাহা হইলে সকলের কোল কুড়াইব, এই প্রবল আশা। এই আশা, এই ভয়। আবার এই ভয়, এই আশা। অন্য সময়ের এক যুগের চাঞ্চল্য সে সময়ের এক দণ্ডে উপস্থিত হয়। প্রমারা উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু খেলটী *Dramatic*। যে খেলা এ সংসারে সকলে নিত্য খেলিতেছি, সেই খেলার আশ্চর্য্য অনুকরণ এই প্রমারা। তবে প্রভেদ এই যে, এ সংসারে যে চাঞ্চল্য, যে বেগ, যে আশা দশ বৎসরে, ক্রমে ক্রমে, মন্দ গতিতে, কখন আইসে কখন আইসে না ; সেই আশা, সেই বেশ, সেই চাঞ্চল্য, এক দিনে, এক দণ্ডে, দুর্দ্দম বেগে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাই এ খেলার সুখ! আবার তাহার উপর অদৃষ্টের কুহক। প্রমারার অদৃষ্টের নাম "পড়্তা"। এ সংসারে অদৃষ্ট খুলিলে "ধূলা মুটা ধরিলে সোণা মুটা হয়" ; প্রমারার পড়তা লাগিলে যে কাগজ ধর, সেই কাগজেই তুমি জিতিবে। একরঙ্গা ফিগরু ধর, তুমি ফুরুস মারিবে ; ফুরুস পাচার কর ন্যূনকল্পে তোমার কোরেস্তা দান জুটিবে। পড়তা সম্বন্ধে

স্পেন্সার (*Spencer*) বলেন, যে তাস যেরূপ ভাল মন্দ পরম্পরাক্রমে সাজান থাকে, সেইরূপ একজন ভাল একজন মন্দ পায়। মিথ্যা কথা! তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া কাগজ সাজাইয়া দেও, ভাঁজিয়া দেও, পড়তা ঠিক থাকিবে, যে তাস লইয়া খেলিতেছিলে, সে তাস ফেলিয়া অন্য তাস দেও, পড়তা সেইরূপ থাকিবে।

আমি প্রমারা খেলার পক্ষপাতী নহি, বা সেজন্য এই খেলার পরিচয় দিতে বা প্রশংসা করিতে বসিয়াছি এমত নহে। তখনকার লোক কেন প্রমারায় মাতিয়া উঠিত তাহাই বুঝাইবার জন্য এত কথা বলিলাম। প্রমারা[৬] খেলায় উম্মত্ত হয়ে, দিন রাত্রি কখন আইসে কখন যায় তাহা খেলোয়াড় কিছুই জানিতে পারে না। এখন প্রমারা খেলা নাই তাই এখনকার লোক মদ খায়। একালে মদ খাইয়া যে অভাব পূরণ হয়, সেকালে প্রমারা খেলিয়া সেই অভাব পূরণ হইত। উভয়ের মধ্যে কোনটী ভাল আমি বলিব না। মোট কথা, পূর্ব্বে মহারাজাধিরাজ হইতে জেলেমালা পর্য্যন্ত প্রমারা খেলিত, আর—কবি শুনিত।

কবির কথা এখন আর তুলিব না। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, কবি সে সময়ের *Esthetic culture*র প্রধান সহায় ছিল। তদ্দ্বারা তখনকার লোক কবিত্ব বুঝিয়াছিল, কবিত্ব লইয়া মাতিয়াছিল। সেরূপ জিনিষ এখন কিছুই নাই। একালের পুঁজি কেবল নাটক! তাহা দেখিয়া শুনিয়া হাসি পায়, তাহা যে কিছুই নহে, একথা কেহ এখন বুঝিবে না, কাহারও বুঝাইবার সাধ্য নাই। এ নাটক এখনকার সময়োপযোগী। মূল কথা, এখন বাঙ্গালায় নাটক হইতে পারে না। নাটক উক্তর প্রত্যুক্তর নহে, উপন্যাস নহে। যাহা লইয়া নাটক তাহা বাঙ্গালির অদ্যাপি হয় নাই। নাটকের মজ্জা কার্য্যকারিতা, সে কার্য্যকারিতা ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত, সমাজগত! সে কার্য্য-কারিতা শক্তি আমাদের কই? ইস্পেন দেশ যখন কার্য্যকারিতায় অতুল, তখন তথায় সরবণ্টিস নাটক লিখিয়াছিলেন। মহারাজ্ঞী ইলিজেবেতের সময় ইংলন্ডের কার্য্যকারিতা শক্তি বড় প্রবল হইয়াছিল, সেই সময় ইংরেজি ভাষায় নাটক হয়। তাহার পর উভয় দেশের কার্য্যকারিতাশক্তি কমিয়াছে, উভয় দেশের নাটক প্রসবিনীশক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। তবে এখন যে সকল নাটক তথায় লেখালেখি হয়, তাহা প্রায় আমাদের বাঙ্গালা নাটকের মত কেবল বকাবকি, হাঁকাহাঁকি!

সে সকল কথা এখন যাক্। তেজচাঁদ বাহাদুরের কথা হইতেছিল, তিনি শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এক একটি করিয়া ক্রমে সাতটি বিবাহ[৭] করেন। শেষ বিবাহটি অতি বৃদ্ধ বয়সে করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার পুত্র প্রতাপচাঁদ যুবাপুরুষ, বিষয়কার্য্য তিনিই দেখেন, বৃদ্ধ রাজা অপটু বলিয়া সে সকল কার্য্য হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন।

৩

কুমার বাহাদুর

কুমার প্রতাপচাঁদের[৮] বালককালের কথা সবিশেষ বড় প্রকাশ নাই, তবে এই মাত্র

শুনা যায় যে, তিনি বড় দুরন্ত ছিলেন, ঘুঁড়ি উড়াইবার সখ তাঁহার বিশেষ বলবৎ ছিল, একবার ঘুঁড়ির লক পড়িয়া তাঁহার কর্ণের উপরিভাগ কাটিয়া গিয়াছিল। একবার একটা ঘোড়া তাঁহার পীঠ কামড়াইয়া মাংস তুলিয়া লইয়াছিল। সে চিহ্ন তাঁহার যাবজ্জীবন ছিল। গোলকচাঁদ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে ইংরেজি পড়াইতেন। এদেশে রাজকুমারদের যেরূপ বিদ্যা হইয়া থাকে, প্রতাপচাঁদের তাহাই হইয়াছিল।

অল্প বয়সেই তাঁহার গর্ভধারিণী নানকী রাণীর কাল হয়। সেই অবধি তাঁহার পিতামহী বিষণকুমারী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। বিষণকুমারীর[৯] আদরে প্রতাপচাঁদের কোন শিক্ষা হইতে পায় নাই। প্রতাপচাঁদ কোন অকার্য্য করিলে রাণী বিষণকুমারীর ভয়ে কেহ তাঁহাকে কোন কথা কহিতে পারিত না। অন্যের কথা দূরে থাক, স্বয়ং তেজচন্দ্র কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। সুতরাং কুমার বাহাদুর আলালের ঘরের দুলাল হইয়া দাঁড়াইলেন, কাহাকেও ভয় করিতেন না, কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না—যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন।[১০] এই বীজ অর্থাৎ এই দুর্দ্দম ইচ্ছা, তঁাহার কাল স্বরূপ হইয়াছিল। ইচ্ছা দমন করিতে তিনি শিখেন নাই।

তঁাহার বিমাতা কমলকুমারী তঁাহার প্রতি বড় সদয় ছিলেন না। বিমাতা সর্ব্বত্র কুমাতা, বিশেষ রাজবাটীতে। একা বিমাতা নহে, বিমাতার সহোদর পরাণবাবু প্রতাপচাঁদকে একেবারে দেখিতে পারিতেন না। প্রতাপ তাহা জানিতেন এবং তাহার প্রতিশোধ মধ্যে মধ্যে লইতেন। জনশ্রুতি আছে যে, এক দিন প্রতাপচাঁদ পরাণবাবুর পশ্চাদ্দেশে কলিকা পুড়াইয়া ছাপ দিয়াছিলেন।

সর্ব্বদাই প্রতাপচাঁদ আহ্লাদ আমোদ করিয়া বেড়াইতেন, তিনি হাসিতে বড় পটু ছিলেন, হাসিতে গেলে তাঁহার গালে টোল পড়িত। সর্ব্বদাই তাঁহার ঘর্ম্ম হইত, পৌষ মাসের শীতেও তিনি ঘামিতেন। এই ঘর্ম্মরোগ তাঁহার মৃত্যুকাল অবধি ছিল।

৪

ছোট রাজা

কুমার বাহাদুরের বয়ঃক্রম হইলে সকলে তঁাহাকে ছোট রাজা বলিত। তিনি বালককালে দুরন্ত ছিলেন, যৌবনকালে আরও দুরন্ত হইয়া উঠিলেন। তঁাহার সাহস ও শক্তি অসাধারণ ছিল এই জন্য সকলেই তঁাহাকে ভয় করিত। কিন্তু সামান্য লোকের নিকট তিনি বড় শান্ত ছিলেন। কোন ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া তঁাহার নিকট গেলে তিনি যেরূপ পারেন তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। তজ্জন্য যদি নিজে বিপদগ্রস্ত হইতে হইত, তাহাতে তিনি বরং সুখী হইতেন। বিপদ তিনি খুঁজিতেন। রাজা বলিয়া একটা দাম্ভিকতা তঁাহার মনে সর্ব্বদা জাগরিত থাকিত ; কেবল অন্যকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার সময় সেটি একেবারে লোপ পাইত।

মোগলেরা বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ বলিয়া প্রতাপচাঁদ তাহাদের ভালবাসিতেন, কয়েক

জনকে বডিগার্ড স্বরূপ রাজবাটীতে রাখিয়াছিলেন, সেই কয়েকজনের মধ্যে আগা আব্বাস আলি সর্ব্দা ছায়ার মত বেড়াইত, সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া তিনি অনেক দুঃসাহসিক কার্য্য করিতেন। অপঘাত মৃত্যু যে কখন হইতে পারে, এ কথা বুঝি তাঁহার বুদ্ধির অতীত ছিল।

তিনি দেখিতে শ্যামবর্ণ একহারা অথচ বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, নিত্য প্রাতে কুস্তি করিতেন ; কুস্তি করা তখনকার প্রথাই ছিল। সঙ্গীতবিদ্যা আর মল্লবিদ্যা না জানা অভদ্রের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইত। এ রূপ ধারণা বোধ হয়, গায়ক ও পালওয়ানদিগের দ্বারা উৎপাদিত হইয়া থাকিবে। পশ্চিমাঞ্চলের নানা প্রদেশ হইতে "কুস্তিগীর পালওয়ান" আসিয়া বল ও কৌশল দেখাইত। তদুপলক্ষে বিস্তর ধনবান একত্রিত হইতেন। তাঁহারা পালওয়ানদের মুখে শুনিতেন যে, পশ্চিমাঞ্চলের মহারাজারা কুস্তিগীরকে কোল দেন, ইংরেজ ডাকিয়া তাহাদের তসবির লন, এবং আপনারা স্বয়ং কুস্তি করিয়া সাধারণ সমক্ষে বলবন্ত বলিয়া পরিচিত হন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ভরত নামে একজন প্রসিদ্ধ পালওয়ান এ অঞ্চলে ছিল, কিন্তু সে ব্যক্তি হিন্দুস্থানী। বাঙ্গালীর মধ্যে মনোহর চক্রবর্ত্তীর প্রতিষ্ঠা তখন সর্বাপেক্ষা অধিক। কবি ভারতচন্দ্র রায়ের পৌত্র নাকি বড় কুস্তিকৌশলী ছিলেন, তাঁহার বলমাংস এরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল যে, তিনি মাথা নিম্নভাগে রাখিয়া ঊর্দ্ধভাগে পা তুলিয়া কেবল দুই হস্ত দ্বারা অনায়াসে নারিকেল গাছে উঠিতেন। যাঁহাদের বিশ্বাস যে, ইংরেজ প্রাসাদাৎ ইদানীং বাঙ্গালায় কুস্তি (Gymnastic) আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহাদের ধারণা ভুল। ইংরেজি শিক্ষায় ও শাসনে বরং আমাদের কুস্তি উঠিয়া গিয়াছে। প্রাতে বালকেরা স্কুলের পাঠাভ্যাস করে কুস্তির অবকাশ থাকে না, ইতর লোকেরা কুস্তি করিলে তাহাদের প্রতি পুলিশের দৃষ্টি পড়ে। সুতরাং কুস্তি করা রহিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ইতর লোকদিগকে কোন কার্য্যের ভার দিলে, তাহারা তাল ঠুকিয়া সম্মতি জানাইত। এখন আর সে তাল ঠোকা নাই। কারণ সাধারণ লোকের জন্যে আর সে কুস্তি নাই, সে বল নাই। অনেকের বিশ্বাস, আমরা চিরকালই এইরূপ দুর্বল। যাঁহারা ইংরেজি গ্রন্থ পড়িয়া বাঙ্গালির ইতিহাস শিখিয়াছেন, তাঁহাদের এই বিশ্বাস সম্ভব। কিন্তু যাঁহারা আকবর প্রভৃতির রুবকারী ইত্যাদি পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, মুসলমান আমলে বিস্তর বাঙ্গালী যোদ্ধা ছিল। বাঙ্গলার ফৌজ বাঙ্গালীরই হইত নবাবের পক্ষের যুদ্ধ বাঙ্গালীরাই করিত। পঞ্চ হাজারি, দশ হাজারি যে সকল সেনাপতি ছিলেন, তাঁহারা আপন আপন প্রজা লইয়া যুদ্ধে যাইতেন, সে প্রজা বাঙ্গালী ভিন্ন আর কেহই নহে। সে দিন পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালী জাঁদরেল আর বাঙ্গালী সেনা যুদ্ধ করিয়াছিল। সে যুদ্ধে ইংরেজ সেনা ও ইংরেজ জাঁদরেলের যে দুর্দশা হইয়াছিল, তাহা একজন ইংরেজ সাহস করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। যদি সেদিন মীরজাফর ইংরেজের স্বপক্ষে হইয়া হঠাৎ যুদ্ধ স্থগিত না করাইতেন, তাহা হইলে বাহাদুরির স্রোত আজ আর একদিকে বহিত।

এখন বাঙ্গালীর আর বলবীর্য্য নাই সত্য কিন্তু তাহা বাঙ্গালীর দোষ নহে ; রাজ শাসনের দোষ। সে সকল কথা এখন অনর্থক।

প্রতাপচাঁদ কুস্তি করিতে, সাঁতার দিতে, ঘোড়ায় চড়িতে বড় পরিপক্ক ছিলেন। লোকে বলে তিনি ইংরেজ ঠেঙ্গাইতে আরও মজবুদ ছিলেন। গল্প আছে, তিনি নাকি কোন একজন ইংরেজকে বড় মর্ম্মপীড়া দিয়াছিলেন, সেই অবধি অধিকাংশ সিবিল সার্বেণ্ট তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। তিনিও তাঁহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল যে, ধোপা নাপিতের ছেলেরা সিবিল সার্বেণ্ট[১১] হইয়া এদেশে আসে। এবং সেই জন্য তাহাদের দাম্ভিকতা তাঁহার সহ্য হইত না। একবার তাঁহার সহিত পথে একজন মেজেষ্টারের[১২] দেখা হইয়াছিল। মেজেষ্টার সাহেব সেই সময় তাঁহার বগি একপার্শ্বে লইয়া যান নাই, কি এইরূপ একটা সামান্য ত্রুটি করিয়াছিলেন, প্রতাপচাঁদের নিকট ইহা "বেয়াদবি" বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বগি হইতে মেজেষ্টারকে নামাইয়া আগাগোড়া বিতাইয়া দিলেন। লোকে বলে তাঁহার নামে গবর্ণমেণ্ট হইতে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইয়াছিল। প্রতাপচাঁদের রাগ কেবল সিভিল সার্বেণ্টের উপর ছিল, তাহাদেরই তিনি 'বেয়াদব' বলিতেন। অন্য ইংরেজদের সঙ্গে তাঁহার বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল, পল্টনের একজন ডাক্তার স্কট্ সাহেবকে তিনি বিশেষ ভালবাসিতেন। আরও অন্যান্য ইংরেজদের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল তাঁহারা সর্বদাই আসিতেন, আমোদ আহ্লাদ করিতেন, আর মদ খাইতেন। প্রতাপচাঁদও তাঁহাদের সঙ্গে মদ ধরিয়াছিলেন। মেদেরা মদ তাঁহার বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল। ক্রমে অভ্যাসে প্রতাপচাঁদ তাঁহাদের সহিত অনর্গল ইংরেজিতে কথা কহিতেন। তিনি কখন ইংরেজি অধ্যয়ন করেন নাই বলিলেই হয়, তাঁহার শিক্ষক গোলকচাঁদ ঘোষ নিজে ইংরেজী জানিতেন না। "থামস্ ডিস" পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্যা ছিল। তিনি আবার এদিকে বড় সামাজিক ছিলেন। দেশী বিদেশী সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতেন। এ অঞ্চলে আসিলে একবার সালিখায় যাইতেন, একবার তেলেনীপাড়ার রামধনবাবুর ভদ্রেশ্বরের বৈঠকখানায় আমোদ করিয়া আসিতেন। চুচুড়ায় রাজবাটী আছে, তথায় আসিয়া দীনামারের গবর্ণর ওবারবেক সাহেব, হাজি আবু তালিব প্রভৃতি অনেকানেক প্রধান লোকের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেন। সীঙ্গুরের নবাববাবুর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। কথিত আছে, নবাববাবু দোল উপলক্ষে তাঁহার সহিত ফাগ খেলিবার জন্য প্রতি বৎসর বর্দ্ধমান যাইতেন, একবার এত ফাগ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, যে পোনর দিবস ধরিয়া অনবরত ব্যয় করিয়াও তাহা ফুরাইল না, শেষে প্রত্যাগমন কালে বস্তা বস্তা ফাগ বাঁকার জলে ফেলিয়া আসিলেন, বাঁকার জল একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া গেল। কয়েক দিন ধরিয়া লোকে সে জল ব্যবহার করিতে পারিল না। সেই নবাববাবুর স্ত্রী ইদানীং বৃন্দাবনে ভিক্ষা করিয়া খাইতেন।

অল্প বয়সে প্রতাপচাঁদের ভারীত্ব এত দূর জন্মিয়াছিল, যে অনেক বড় বড় লোক

তাঁহার নিকট কুণ্ঠিত হইত, অথচ তাঁহার বয়সসুলভ আহ্লাদ আমোদ সর্বদাই ছিল, হাসি ভিন্ন তিনি কথা কহিতেন না।

প্রতাপচাঁদ অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন, এবং অল্প বয়সেই বিষয় কার্য্য দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। লোকে বলে পরাণবাবু তাহাতে প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। কেন হইয়াছিলেন তাহা কেহ বুঝে নাই, কিন্তু প্রতাপচাঁদ সে কথা বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য কৌশল করিয়া পিতার নিকট হইতে সমুদয় বিষয় লিখিয়া লইয়াছিলেন।

পরাণবাবু ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। কিছুকাল পরে এক নূতন চাল চালিলেন। তাঁহার এক পরমাসুন্দরী অবিবাহিতা কন্যা ছিল। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই কন্যা বৃদ্ধ তেজচন্দ্রকে সম্প্রদান করিলেন। লোকে অবাক্ হইল। কন্যার নাম বসন্তকুমারী।[১৩] তিনিই মহারাণী বসন্তকুমারী বলিয়া পরিচিতা।

লোকে এ বিবাহের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই বিবাহে সকলেই বিরক্ত হইল, অনেকে সন্দেহ করিল। মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর পরাণবাবুর ভগিনীপতি ছিলেন, একবার জামাতা হইলেন। লোকে ভাবিল, ইহা গ্রন্থির উপর গ্রন্থি। প্রতাপচাঁদ ভাবিলেন, পরাণ "মামা দড়ি পাকাচ্ছেন।"

পরাণবাবুর যখন সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হন, সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, অষ্টম গর্ভের পুত্র যদি বাঁচে, তবে অসাধারণ ব্যক্তি হইবে। শুনা যায়, এই কথায় প্রতাপচাঁদ বিমর্ষ হইয়া বলিয়াছিলেন, "অষ্টম গর্ভের সন্তান বাঁচিলে রাজা হয়, পরাণের পুত্র নিশ্চয় রাজা হবে, যদি পরাণ ততদিন জীবিত থাকে, আমার গদিতে পরাণের পুত্র বসিবে, বরং তোমরা এ কথা লিখিয়া রাখ।" এ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এবং পরাণ বাবুর ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালীর বীজ সেই অবধি রোপিত হইল।

পরাণবাবুর সহিত প্রতাপচাঁদের অকৌশল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল; কিন্তু এই বিবাহের পর আরও বাড়িয়া উঠিল। সে সকল পরিচয় এখন অপ্রয়োজনীয়।

প্রতাপচাঁদ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে দান আর সঞ্চয় সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে রাজবাটীতে কেবল মুষ্টি ভিক্ষা ছিল, তিনি তাহার পরিবর্ত্তে পূর্ণ মাত্রা বরাদ্দ করিয়া দেন। পূর্ণ মাত্রা অর্থাৎ চাল, ডাল, লবণ, তৈল প্রভৃতি যে পরিমাণ দ্রব্য প্রত্যেক ভিক্ষুকের আবশ্যক, তাহা সমুদয় দিবার নিয়ম করিয়া দেন। পূর্ব্বে ধনসঞ্চয় হইত না, তিনি আমলাদিগের চুরি অনেকটা খর্ব্ব করিয়া সঞ্চয় বৃদ্ধির পন্থা করিয়া দেন। প্রতি লাটে কর্জ্জ করিয়া খাজনা দিতে হইত, এখন কর্জ্জ করা দূরে থাকুক, প্রতি লাটে টাকা জমিতে লাগিল। শুনা যায়, প্রথমে তিনিই "হৌজে" টাকা ফেলার নিয়ম করেন।

কথিত আছে ১৮১৯ সালের ৮ আইন যাহাকে সচরাচর "অষ্টম"[১৪] আইন বলে তাহা প্রতাপচাঁদ নিজে উদ্ভাবন করেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে প্রতাপচাঁদ যেরূপ আমোদপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাতে বোধ হয় না যে, তিনি

বিষয় রক্ষার নিমিত্ত কোন উপায় চিন্তা করিবার সাবকাশ পাইতেন। কিন্তু লোকে বলে যে, তিনি এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের যেরূপ বন্দোবস্ত তাহাতে নিয়মিত দিনে সূর্য্য অস্তর মধ্যে সরকারি রাজস্ব সমুদয় না দিতে পারিলে জমিদারী নিলাম হইয়া যায়। এই নিয়মের চক্রে, বড় বড় জমিদারদিগের জমিদারী নিলাম হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান রাজার জমিদারী বিস্তর, তাহার খাজনা নিয়মিত মুহূর্ত্ত মধ্যে দেওয়া কঠিন ব্যাপার। এ অবস্থায় প্রতাপচাঁদ স্থির করিলেন গবর্ণমেণ্ট যেমন খাস তহসিলের দায় নিজে গ্রহণ করেন নাই, মধ্যবর্ত্তী জমিদারের স্কন্ধে তাহা ফেলিয়া খাজনা তহসিল করেন, আমিও সেইরূপ করিব। প্রজাদিগের নিকট খাজনা আদায় করিবার নিমিত্ত মধ্যবর্ত্তী পত্তনীদার রাখিব। জমিদার নিয়মিত মুহূর্ত্ত মধ্যে খাজনা দিতে না পারিলে, গবর্ণমেণ্ট যেমন জমিদারী নিলাম করিয়া লন, আমিও সেই মত অনাদায়ের নিমিত্ত পত্তনী নিলাম[১৫] করিয়া সেই নিলামের টাকা হইতে গবর্ণমেণ্টকে খাজনা দিব। এই বিষয়ে দরখাস্ত করিলে গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া তাহা অনুমোদন করিলেন, এবং ১৮১৯ সালের ৮ আইন দ্বারা পত্তনী নিলামের বিধি করিয়া দিলেন।

এই কৌশলে প্রতাপচাঁদ আপনার জমিদারী চিরস্থায়ী করিয়া লইলেন। এবং সেই সঙ্গে অন্য জমিদারের জমিদারী রক্ষা পাইল। নতুবা পূর্ব্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত[১৬] (Permanent Settlement) নামে মাত্র চিরস্থায়ী বলা হইত। চিরস্থায়ী দূরে থাক, কাহার জমিদারী ক্রমান্বয়ে চার বৎসর স্থায়ী হইত না। এ অস্থায়ীত্ব লইয়া কোর্ট অব ডাইরেক্টারেরা অনেক পত্র লেখালেখি করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন কিছুই করিতে পারেন নাই।

প্রতাপচাঁদের যতই প্রশংসনীয় থাক, তিনি অতিশয় মদ্যপায়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ইদানীং তাঁহাকে এই জন্য দেখিতে পারিতেন না। কেহ কেহ বলেন, না দেখিতে পারার অন্য কারণ ছিল। তাহা যাহাই হউক, শেষ অবস্থায় তেজচন্দ্র বাহাদুর পুত্রের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

যাঁহারা কুমার কৃষ্ণনাথকে[১৭] দেখিয়াছেন তাঁহারা বোধ হয়, প্রতাপচাঁদের সহিত তাঁহার কতক সাদৃশ্য অনুভব করিয়া থাকিবেন। আমরা বিলক্ষণ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, দুই জনের প্রকৃতি একই রূপ ছিল। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সে সময়ে এইরূপ ব্যক্তি আরও দুই একটি জন্মিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা কেহই দীর্ঘকাল টিকিতে পারেন নাই। তাঁহারা সময়োপযোগী বা সমাজোপযোগী ছিলেন না। চারিপার্শ্বস্থ আর সকল যেরূপ সেইরূপ হইলেই, মানুষ বল, পশু বল, যাহা বল তাহাই টেকে নতুবা লোপ পায়। এই নিয়ম। যেখানে সমাজের সকলেই অতি নীচ সেখানে নীচ ব্যক্তিরই টিকিবে নীচ ব্যক্তিরই উন্নতি হইবে উচ্চপ্রকৃতির লোক সে সমাজ প্রধানত্ব পাওয়া দূরে থাক একেবারে লোপ পাইবে। যেখানে সমাজ পবিত্র সেখানে ধার্ম্মিষ্ঠ ও পবিত্র লোকেই টিকিবে, সেখানে নীচ ও শঠ দুর্দশাপন্ন হইবে এবং

পরিশেষে লোপ পাইবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন, "যথা ধর্ম্ম তথা জয়" কিন্তু বাস্তবিক একথা সকল সময়ে সত্য নহে। তাহাই বলিতে হইয়াছে, "কলিতে অধর্ম্মেরই জয়, যে প্রবঞ্চনা করে যে শঠতা করে তাহারই উন্নতি।" মূল কথা অধিকাংশ লোক যেরূপ, ফলও সেইরূপ হয়। যেখানে কিয়দংশ লোক ধর্ম্মিষ্ঠ সেইখানেই ধর্ম্মের জয়, আর পাপের পরাজয়। কৃষ্ণনাথ ও প্রতাপচাঁদ উভয়ে লোপ পাইয়াছিলেন। উভয়েই চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকের মত ছিলেন না, কিছু ভিন্ন ছিলেন, ভাল ছিলেন কি মন্দ ছিলেন তাহা বলিতেছি না।

৫

প্রতাপচাঁদের মৃত্যু

প্রতাপচাঁদ আটাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইরূপে আহ্লাদ আমোদে অতিবাহিত করিলেন। তাহার পর, তাঁহার মানসিক অবস্থা হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি হাসিলে ঘর ভরিয়া যাইত, তাঁহার সে হাসি আর বড় শুনা যাইত না। নিত্য অপরাহ্ণে বারদ্বারির[১৮] ছাদে উঠিয়া তিনি নীলপুরের[১৯] দিকে দূরবীণ কসিতেন, তথাকার একটি গেট হইতে কখন একখানি বগি ছুটিয়া বাহির হয়, দেখিতেন। তিনি আর সে ছাদে যান না দূরবীণ স্পর্শ করেন না। হেয়ার সাহেবকে[২০] একটি দূরবীক্ষণ মেরামত করিতে দিয়াছিলেন, তাহা মেরামত হইয়া আসিল, আর তাহা স্পর্শ করিলেন না। রাজবাটীর দক্ষিণভাগে বহু ব্যয়ে এক অপূর্ব্ব স্নানাগার প্রস্তুত করাইতেছিলেন, তাহা প্রস্তুত হইল, কর্ম্মচারী আসিয়া সে সংবাদ দিল, একবার তাহা দেখিতে গেলেন না। শেষ, মোসাহেবদের সহিত আর সাক্ষাৎ করিতেন না। শ্যামচাঁদবাবু নামে একজন পারিষদ ছিলেন, কেবল তাঁহারই সঙ্গে দুই একটী কথাবার্ত্তা কহিতেন, আর চিনারি নামে একজন ইউরোপীয় চিত্রকরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন—সে ব্যক্তি তখন প্রতাপচাঁদের একখানি প্রমাণ চিত্রপট চিত্র করিতে নিযুক্ত ছিল।

একদিন প্রাতে প্রতাপচাঁদ শয্যা হইতে উঠিয়া খানসামাদের বলিলেন যে, "আজ নূতন মহলে স্নান করিব।" খানসামারা পয়ঃপ্রণালীতে জল পূরিয়া সমুদয় ফোয়ারা খুলিয়া দিল, বাটীর বাহির হইতে জলের গর্জ্জন শুনা যাইতে লাগিল। প্রতাপচাঁদ তথায় প্রবেশ করিলেন, প্রায় প্রহরেক পরে বহির্গত হইলেন। চক্ষু তখন আরক্ত হইয়াছে, সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে।

সেই দিন অপরাহ্ণে রাষ্ট্র হইল, মহারাজ প্রতাপচাঁদের পীড়া হইয়াছে। চিকিৎসকেরা যাতায়াত করিতে লাগিল। একজন মুসলমান চিকিৎসক প্রতাপচাঁদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল, তাহার নাম আসগর আলি। পীড়ার প্রথম অবস্থায় তাহারই ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। শেষে, তথাকার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার কুলটার সাহেবকে আসিতে হইল। কিন্তু তিনি কোন ব্যবস্থা করিলেন না।

সেই দিবস কি পরদিবস হইবে, প্রতাপচাঁদ বলিলেন, আমায় গঙ্গাযাত্রা কর। পীড়া

তখন সাংঘাতিক বলিয়া কাহারও বিশ্বাস ছিল না, পরে রাজবল্লভ কবিরাজ আসিয়া গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা দিলেন। সুতরাং তাঁহাকে কালনায় লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহার সঙ্গে বৃদ্ধ মহারাজা স্বয়ং গেলেন। কিন্তু স্বসম্পর্কীয় অপর কেহই গেলেন না। স্ত্রীলোক মাত্রেই নহে, তাঁহার দুই স্ত্রী[২১] ছিলেন তাঁহারা কেহই যান নাই, বোধ হয় তাঁহাদের যাইতে নিষেধ করা হইয়া থাকিবে। কালনায় পেঁাছিয়া প্রতাপচাঁদ কয়েক দিন তথাকার রাজবাটীতে থাকিলেন, কিন্তু ক্রমেই তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

মহারাজ তেজচন্দ্র[২২] বাহাদুর তখন কালনায় ছিলেন। সেখানে পুত্রের সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা হয় প্রকাশ নাই। কিন্তু ব্যবহারে বোধ হয় তেজচন্দ্র বড় কাতর হন নাই, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইদানীং তিনি প্রতাপচাঁদকে দেখিতে পারিতেন না। রাত্রে যখন পুত্রের মৃত্যু হইল, তখনই তিনি বর্দ্ধমানে চলিয়া গেলেন।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর বিবরণ এই মাত্র প্রকাশ আছে যে, রাত্রি দেড়প্রহরের সময় কানাত দ্বারা ঘাট ঘেরিয়া তাঁহাকে অন্তর্জ্জলি করা হয়। সে সময় বিস্তর লোক তথায় উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহারা সকলে কানাতের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল।

মৃত্যুর দুই চারিদিন পরেই, রাষ্ট্র হইল প্রতাপচাঁদ পলাইয়াছেন। রাজা তেজচন্দ্র তাহা শুনিলেন, কিন্তু হাঁ না কিছুই বলিলেন না। যে কারণেই হউক প্রতাপচাঁদের সমাজ মন্দির কালনায় তখন প্রস্তুত হইল না। রাজবাটীর রীতি আছে কেহ মরিলে একটী নূতন মন্দিরে তাঁহার অস্থি রক্ষিত হয়। প্রতাপচন্দ্রের সমাজ মন্দির শুনা যায় তেজচন্দ্র বাহাদুরের মৃত্যুর পর প্রস্তুত হইয়াছিল।[২৩]

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর, জমিদারী লইয়া তেজচন্দ্র বাহাদুরের সহিত প্রতাপচাঁদের দুই রাণীর মোকদ্দমা বাধিয়া গেল। প্রতাপচাঁদ দানসূত্রে বিষয় পাইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার রাণীরা বিষয়াধিকারিণী এবং সেইজন্য তাঁহারা বিষয় দাবি করিয়া ছিলেন তদনুসারে জজ আদালতে ডিক্রি পাইলেন। কিন্তু কি কারণ বলা যায় না, শেষে তেজচন্দ্রের হাতেই বিষয় থাকিল; রাণীরা মাসিক 'তঙ্কা' পাইয়া নিরস্ত হন।

কিছুদিন গেলে পোষ্যপুত্রের কথা উত্থাপিত হইল; তেজচন্দ্র পোষ্যপুত্র লইতে অসম্মত হইলেন। কেন অসম্মত তাহার কোন হেতু দর্শাইলেন না। আবার কিছুদিন পরে পোষ্যপুত্রের কথা উত্থাপিত হইল, আবার তিনি অস্বীকৃত হইলেন; এবার বলিলেন যে, আমার প্রতাপ আসিবে তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, সে অবশ্য আসিবে। পুত্রশোক হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত লোকে প্রতাপের অজ্ঞাতবাস কল্পনা করিয়াছে। এ সুখের ভ্রম নষ্ট করিতে চাহি না। করা উচিত নহে। কিন্তু যদি প্রতাপচাঁদ ফিরে না আসেন, বা আসিতে তাঁহার বিলম্ব হয়, আর ইহার মধ্যে যদি মহারাজের দেহনাশ হয়, তবে এই সমস্ত বিষয় কোম্পানী বাহাদুর লইবেন। যাহাতে না লইতে পারেন তাহার একটি উপায় করিয়া রাখা আবশ্যক।

অনেক তর্কবিতর্কের পর তেজচাঁদ বাহাদুর পোষ্যপুত্র লইতে সম্মত হইলেন।

বলা বাহুল্য যে, পরাণবাবুর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র—যেটী অষ্টম গর্ভের,—সেইটি গৃহীত হইল। তাহার নাম কুঞ্জবেহারী কি নারায়ণবেহারী[২৪] এমনি একটি ছিল—রাজপুত্র হইলে সে নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া মহাতাপচাঁদ রাখা হইল।

৬

আলোক শা।

পঞ্চদশ বৎসর পরে ১৮৩৫ সালে একজন সন্ন্যাসী বর্দ্ধমানে প্রবেশ করিল। তখন বর্দ্ধমান আর পূর্ব্বমত নাই, স্থানে স্থানে ইংরেজ পচন্দ নূতন রাস্তা হইয়াছে, তাহার ধারে বিলাতী ফুলের বন গজাইয়াছে। কৃষ্ণসায়রের[২৫] পাড় ঝর্ ঝর্ করিতেছে, সেখানে আর জঙ্গল নাই, স্থানে স্থানে মনোহর উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের নাম আরও মনোহর রাখা হইয়াছে। রাজবাটীর বহির্ভাগ পূর্ব্বমত অপরিষ্কার রহিয়াছে, কিন্তু ভিতরে অনেক নূতন মহল প্রস্তুত হইয়াছে। পায়রার পাল বিলক্ষণ বাড়িয়াছে, চিড়িয়াখানা সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু চিড়িয়াখানায় ফাক্তা, কুমরী প্রভৃতি সাবেক দল সমুদয় মরিয়া গিয়াছে এখন বিলাতী পক্ষীই অধিক।

সন্ন্যাসী রাজবাটী প্রবেশ করিল, চারিদিক্ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল, কেহ তাহাকে নিবারণ করিল না, সন্ন্যাসীও কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। শেষ সন্ন্যাসী বারদ্বারীতে গিয়া উপস্থিত হইল। বারদ্বারী বহুকাল মেরামত হয় নাই, তাহার দুই একটি দ্বার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দুই এক স্থানের চুণকাম খসিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী সেইখানে থাকিবে মনে করিল, কিন্তু রাজবাটীর জনকতক লোক, কি সন্দেহ করিয়া সন্ন্যাসীকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিল।

তাহার কিঞ্চিৎ পরে সন্ন্যাসী গোলাপবাগে[২৬] গিয়া উপস্থিত হইল। ভিতরে প্রবেশ না করিয়া গেটের নিকট বসিয়া থাকিল। সেই গেটের নিকট গোপীনাথ ময়রা নামক একজন বৃদ্ধ একখানি দোকান করিত, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল, "আমাদের ছোট মহারাজ।" সন্ন্যাসী চাহিয়া দেখিল গোপীনাথ গলায় কাপড় দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। এদিকে বিস্তর লোক আসিয়া সন্ন্যাসীকে ঘেরিল। ছোট মহারাজ আসিয়াছেন, এ কথা সহরের সর্ব্বত্র বিদ্যুৎ রোগ রাষ্ট্র হইয়া গেল। চারিদিক্ হইতে লোক ছুটিল।

রাজবাটীর অনেক পুরাতন আমলা দেখিতে আসিল। তাহাদের মধ্যে কুঞ্জবিহারী ঘোষ নামে একজন মুহুরী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া গিয়া পরাণবাবুর মধ্যম পুত্র তারাচাঁদকে বলিল, "বাবু! আর দেখিতে হইবে না, আমাদের ছোট মহারাজ সত্যই।" কুঞ্জবিহারী এই অপরাধের নিমিত্ত পদচ্যুত ও রাজবাটী হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিলেন। তাহাদের উত্তেজনায় সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে উঠিয়া কাঞ্চননগরে গিয়া থাকিলেন; তথায় তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত বিস্তর লোক যাতায়াত করিতে লাগিল। পরাণবাবু

আবার তথায় লাঠিয়াল পাঠাইলেন। এবার তারাচাঁদও সে কথা পরাণবাবুকে বলিলেন, তৎক্ষণাৎ পরাণবাবু কতকগুলি লাঠিয়াল পাঠাইলেন। লাঠিয়ালেরা সন্ন্যাসীকে দামোদর পার করিয়া দিয়া আসিল।

কিছু দিন পরে সেই সন্ন্যাসী বিষ্ণুপুরের[২৭] রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ।[২৮] তিনি সন্ন্যাসীকে মহারাজা প্রতাপচন্দ্র বলিয়া হঠাৎ চিনিলেন, এবং বহু যত্ন করিয়া তঁাহাকে রাখিলেন। দুই তিন মাস পরে রাজা ক্ষেত্রমোহন পরামর্শ দিলেন যে, সন্ন্যাসী একবার বাঁকুড়ায় যান, মেজেষ্টার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আপনার অবস্থা তাঁহাকে বলুন। মেজেষ্টার সাহেব অভয় দিলে পুলিসের সাহায্য লইয়া বর্দ্ধমানে যাওয়া সহজ হইবে, তখন পরাণবাবুর লাঠিয়াল আর কিছু করিতে পারিবে না। পরাণবাবু বিষয় ফিরিয়া না দেন, তখন আদালত আছে।

এই পরামর্শ অনুসারে সন্ন্যাসী বাঁকুড়া যাত্রা করিল। পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিল না, সঙ্গেও কোন লোক লইলেন না।

এই সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাঁকুড়ার পার্শ্ববর্ত্তী মানভূম জেলায় জঙ্গলি লোকেরা একটা এমন গোলমাল উপস্থিত করিয়াছিল[২৯] যে, তাহাদের নিরস্ত করিবার নিমিত্ত মিলিটারী ফৌজ পাঠাইতে হইয়াছিল। এখন সে সকল গোলমাল চুকিয়া গিয়াছে; তথাপি ক্যাপ্টেন উইলকিন্সন নামে একজন সাহেব পোলিটিকেল এজেণ্ট হইয়া মানভূমে আসিয়াছেন, তাঁহার অধীন আর একজন আসিষ্টাণ্ট আসিয়াছেন, নাম ক্যাপ্টেন হানিংটন। তঁাহারা উভয়ে বড় সতর্ক, মানভূমে বসিয়া চিলের ন্যায় চারিদিক্ দেখিতেছেন; কোথায় দশজন পাঁচজন লোক একত্র হইতেছে, তাঁহারা তাহা দেখিতেছেন আর নোট করিতেছেন।

পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত হওয়ায় বাঁকুড়া ও মানভূমের মেজষ্টারেরা একটু সতর্ক হইয়াছিলেন, মনে মনে সংকল্প করিয়া থাকিবেন, যে আর ঠকিব না। এবার বিদ্রোহ অঙ্কুরে বিনষ্ট করিব।

এই সময় সন্ন্যাসী বাঁকুড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল, কোথাও বাসা না করিয়া সরকারী সর্কিট হউসের নিকট একটি তেঁতুলতলায় গিয়া থাকিল, মেজেষ্টার সাহেবের বাটীতে দেখা করা বোধ হয়, তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; সন্ন্যাসীবেশে তথায় দেখা হওয়া বড় সম্ভব ছিল না। যে কারণেই হোক, সন্ন্যাসী সেই বৃক্ষমূলেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, মনে করিয়া থাকিবেন, মেজেষ্টার সাহেব এই পথে হাওয়া খাইতে আসিলেই সাক্ষাৎ হইবে।

প্রতাপচাঁদ ফিরিয়া আসিয়াছেন এ বার্ত্তা বাঁকুড়া অঞ্চলের সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছিল। রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ তাঁহাকে চিনিয়াছেন, এ কথাও লোকে শুনিয়াছিল, সুতরাং সকলে নিঃসন্দেহচিত্তে দলে দলে প্রতাপচাঁদকে দেখিতে আসিল।

মেজেষ্টার এলিয়ট সাহেব দেখিলেন, এই এক সময়। এবার আর ঠকা হইবে না।

অতএব তৎক্ষণাৎ দারোগা, জমাদার, বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিলেন, যাহারা প্রতাপচাঁদকে দেখিতে আসিয়াছিল, অনেকেই পলাইল, তথাপি তাহাদের মধ্যে প্রায় একশত জন ধরা পড়িল। সকলেই জেলখানায় প্রেরিত হইল। বলা বাহুল্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট গেল যে, একজন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হইয়াছে ; সে ব্যক্তির পাল্লায় বিস্তর লোক ছিল, কেবল তাহার মধ্যে একশত জন ধরা পড়িয়াছে। সন্ন্যাসী জেলখানায় থাকিলেন।

যাঁহারা প্রতাপচাঁদের প্রত্যাগমনবার্ত্তা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কলিকাতা হইতে একজন ইংরেজ উকীল বাঁকুড়ায় পাঠাইলেন। উকীল সাহেব গিয়া মেজেষ্টর সাহেবের নিকট গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্টের নকল চাহিলেন, মেজেষ্টর সাহেব বলিলেন, "কোন ওয়ারেণ্ট হয় নাই, আমার হুকুমই ওয়ারেণ্ট।" উকীল সাহেব তখন আপনার মক্কেলের অপরাধ কি, জানিতে চাহিলেন, দরখাস্ত দিয়া বলিলেন, চার্জের নকল দেওয়া হউক। মেজেষ্টার সাহেব হাসিয়া বলিলেন, আমরা মফঃস্বলে চার্জ লিখি না। তোমার মক্কেলের অপরাধ অবশ্য আছে, তাহা পূর্ব্বে বলা রীতি নহে। সুতরাং উকীল সাহেব কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

প্রায় আট মাস পরে সন্ন্যাসী হুগলীতে প্রেরিত হইলেন, কেন, তাহার কোন হেতু প্রকাশ নাই। হুগলীর দায়রায় তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল। কৌন্সিলি টার্টন সাহেব তাঁহার পক্ষ হইয়া হুগলীর আদালতে উপস্থিত হইলেন। জজ সাহেব তাঁহাকে কোন কথা কহিতে দিলেন না তাহাতে টার্টন সাহেব রাগত হইয়া নিজামতে দরখাস্ত করিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নিজামত আদালতে জজ সাহেবের হুকুম বাহাল থাকিল। সুতরাং সন্ন্যাসীপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কোন উকীল, কি কৌন্সিলি, কি মোক্তার কেহই থাকিতে পাইল না। জজ সাহেব এক তরফা বিচার করিয়া সন্ন্যাসীকে ছয় মাস কারাবন্ধের আজ্ঞা দিলেন এবং খালাসের পর চল্লিশ হাজার টাকার পরিমাণে এক বৎসরের নিমিত্ত ফেলজামিন দিতে হুকুম দিলেন।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিচারপতি ! আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই যে, কি অপরাধের নিমিত্ত আমি দণ্ড পাইলাম"।

বিচারপতি বলিলেন, "তোমার নাম আলোক শা ! তুমি মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বলিয়া লোক জুটাইয়াছ, রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছ।" সন্ন্যাসী নিরস্ত হইলেন।

সন্ন্যাসী যথারীতি ছয় মাস কারাবাস করিয়া চল্লিশ হাজার টাকা পরিমাণে এক বৎসরের নিমিত্ত ফেলজামিন[৩০] দিয়া, ১৮৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের যে দিবস খালাস পাইলেন সে দিবস হুগলীতে মহাসমারোহ হইল। কলিকাতা হইতে বিস্তর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে লইতে আসিয়াছিলেন। পরদিবস অর্দ্ধোদয় যোগ ছিল, সেই উপলক্ষে বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ার বিস্তর লোক হুগলী ও ত্রিবেণীতে আসিয়াছিল ; তাহারাও ঐ সমারোহে যোগ দিল। পঞ্চকোটের রাজা ও বিষ্ণুপুরের রাজা উভয়েই যোগ উপলক্ষে

আসিয়াছিলেন এবং উভয়েই জেলখানার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। এই অঞ্চলের ধনবানেরা দেশী ও ইংরেজী বাদ্য, হাতী, ঘোড়া, রেসালা ইত্যাদি লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। যখন জেলখানা হইতে জাল রাজা বহির্গত হইলেন তখন হাতীর উপর হইতে নহবত বাজিয়া উঠিল, দূরে কাড়ানাকাড়া বাজিতে লাগিল, চারিদিকে হরিবোল পড়িয়া গেল, তিন চারি দল ইংরেজি বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সকলে জাল রাজাকে মহাসম্ভ্রমে সুখাসনে বসাইলেন, বাহকেরা সুখাসন স্কন্ধে তুলিল, চারিজন বালক চামর ব্যজন করিতে লাগিল। শত শত পতাকা দুলিতে দুলিতে আগে আগে চলিতে লাগিল। নগর প্রদক্ষিণ করিয়া শেষে কলের জাহাজে উঠিয়া রাজা কলিকাতায় আসিলেন। বাবু রাধাকৃষ্ণ বসাকের[৩১] বাটীতে প্রথমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

৭

কাপ্তেন লিটিলের লড়াই।

কয়েক মাস পরে, আত্মীয় সকলের পরামর্শ অনুসারে আপাততঃ কলিকাতার সম্পত্তির নিমিত্ত সুপ্রিম কোর্টে নালিশ মোকদ্দমা আরম্ভ হইল।

বর্দ্ধমানের রাজা শ্রীলশ্রীযুক্ত মাহাতাবচাঁদ[৩২] তখন নাবালক। তাঁহার পূর্ব্ব পিতা পরাণবাবু, রাণী কমলকুমারীর পক্ষ হইয়া তাঁহার বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সুপ্রিম কোর্টের মোকদ্দমা জবাব দিবার নিমিত্ত তিনি মদনমোহন কপূরাকে[৩৩] পাঠাইয়া দিলেন।

জাল রাজা প্রকৃতপক্ষে প্রতাপচাঁদ কি না, ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত কলিকাতা অঞ্চলের অনেক প্রধান ব্যক্তির জোবানবন্দী হইল। সকলেই স্বীকার করিলেন যে, বাদী সত্যই রাজা প্রতাপচাঁদ। তারপর, বর্দ্ধমান অঞ্চলের সাক্ষ্য আবশ্যক হইল; সুতরাং উকীলেরা পরামর্শ দিলেন যে, একবার প্রতাপচাঁদ স্বয়ং সেখানে গেলে ভাল হয়, যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন, তাঁহাদের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের মোকদ্দমা প্রমাণিত হইবে।

জাল রাজা বর্দ্ধমানে যাইতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু কলিকাতা নিবাসী যাঁহারা তাঁহার জামিন ছিলেন, তাঁহারা এক বৎসর পূর্ণ না হইলে যাইতে নিষেধ করিলেন; জাল রাজা সুতরাং এক বৎসর অপেক্ষা করিলেন, তাহার পর বর্দ্ধমান যাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এই সময় উকীলদের পরামর্শ মতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত ডেপুটি গবর্ণর এলেক্জাণ্ডর রশ সাহেবের নিকট একখানি দরখাস্ত করা হইল।* কিন্তু হ্যালিডে সাহেব তখন সেক্রেটারি, তিনি দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন।†

* *Extract from petition dated 15th February 1838.*

"Your memorialist prays, therefore, that your Honour will be graciously pleased to grant to him (through the proper channel

দরখাস্ত অসঙ্গত হয় নাই, বর্দ্ধমানে গেলে পাছে কেহ অপমান করে বা অত্যাচার করে, এই ভয়ে দরখাস্ত করা হইয়াছিল ; সে দরখাস্ত নামঞ্জুর হওয়ায় অনেকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জাল রাজা সে সকল কথা কিছু মনে না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন।† কালনা দিয়া গেলে সুবিধা হয় বোধ করিয়া, তিনি সেই পথেই গেলেন। এ অঞ্চলের অনেকগুলি প্রধান ব্যক্তি সঙ্গে চলিলেন। সীঙ্গুরের শ্রীনাথবাবু[৩৪] যাঁহাকে লোকে সচরাচর নবাববাবু বলিত, তিনি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হইয়া বর্দ্ধমান গেলেন।

জাল রাজা সঙ্গে অধিক লোক লইলেন না ; যে সকল ভৃত্যবর্গ ও প্রহরীরা তাঁহার পরিচর্য্যার্থ কলিকাতায় নিযুক্ত ছিল, কেবল তাহাদেরই লইলেন। তথাপি নৌকার বহর বড় মন্দ হইল না। রাজার নিমিত্ত একখানি পিনেস, সঙ্গীদের নিমিত্ত কয়েকখানি বজরা, চাকরদের নিমিত্ত পানসী, তদ্ভিন্ন পাকের নৌকা, স্নানের নৌকা, চিঁড়িয়াখানার নৌকা, গায়কদের নৌকা, তাঞ্জামের নৌকা, এইরূপে ৪০ কি ৫০ খানা নৌকা একত্রে বাহির হইল।

রাজা প্রতাপচাঁদ বর্দ্ধমান যাইতেছেন, এ কথা পরদিন গঙ্গার উভয় কুলে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কুলবধূ অবধি গঙ্গাতীরে ছুটিয়া দেখিতে আসিল। মাস্তুরে মাস্তুরে রক্তপতাকা উড়িতেছে, নৌকার ছাদে ছাদে তখ্‌মাওয়ালা প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। কতই লোক নৌকা হইতে মুখ বাড়াইয়া কুল দেখিতেছে। কতই লোক কূল হইতে নৌকা দেখিতেছে। রাজা পিনেসের ভিতরে আছেন, তাহার খড়খড়ি খুলা রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে দেখা যাইতেছে না। তাঁহার উদ্দেশে বৃদ্ধারা বলিতে লাগিল, "যাও, বাছা ! আপনার ঘরে যাও। কতদিন পথে পথে বেড়ালে, এখন ঘরে যাও।"

নৌকা গমনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। তাঁহার কৌন্সিলি ও উকীল কেহই সঙ্গে আসিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অপেক্ষায় তিনি এখানে সেখানে নৌকা রাখিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এবং সেই উপলক্ষে আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে লাগিলেন। চুঁচুড়ার অপর পারে জাল রাজা প্রায় অষ্টাহ ছিলেন। নিকটবর্ত্তী মোগল, ফরাসিস ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক তথায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই স্থানেই কালনার পুলিস আসিয়া তাঁহার পশ্চাৎ লয়। কে কে

such means of safeguard to protect his person and life, from any eventual insult or danger, during the time he may be obliged to stay at Burdwan."

† Reply—The prayer of this petition cannot be complied with.

(Signed)

Fort William. Fred. Jas. Halliday.

March 5. 1838. *Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.*

† ইংরেজি সন ১৮৩৮ সালের মার্চ্চ মাস।

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে, কালনার জমাদ্দার তাহার এত্তেলা পাঠাইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের মেজেষ্টারকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, জাল রাজা কালনা হইয়া বর্দ্ধমানে যাইতেছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে কি একখানা গোপন মিনিট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।* মেজেষ্টার সাহেব—ওগিলবি[৩৫] তাহা পাঠ করিয়াই কিংকর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন ও দারোগার উপর পরওয়ানা পাঠাইয়াছিলেন।

শেষ ২রা বৈশাখ † তারিখে জাল রাজা কালনায় পেঁীছিলেন। পেঁীছিয়াই দুই জন মোক্তারকে বর্দ্ধমানে পাঠাইলেন। তাহারা মেজেষ্টার সাহেবের নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করিবে যে, "প্রতাপচাঁদ কালনায় পেঁীছিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা বর্দ্ধমানে আইসেন। কিন্তু হুজুরের অভয় না পাইলে আসিতে সাহস করেন না।"

একদিন মেজেষ্টার সাহেব ডাক্তার চিক সাহেবের সঙ্গে একত্রে আহারান্তে কুঠি হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমত সময়ে গেটের নিকট দেখিলেন, কালনা হইতে জাল রাজার দুই জন মোক্তার দরখাস্ত লইয়া আসিয়াছে। কি দরখাস্ত, তাহা তিনি অনুসন্ধান না করিয়া একবারে উভয়কে গ্রেপ্তার করিয়া জেলখানায় পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন মোক্তারের নাম রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল। মোক্তারদের জেলখানায় পাঠাইয়া মেজেষ্টার সাহেব কালনার দারোগাকে হুকুম দিলেন যে, "তথায় জমিয়তবস্ত হইতে দিবে না, যদি জাল রাজা হুকুম মাত্রেই আপনার সঙ্গিদের বরখাস্ত না করে, তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।"

ইতিপূর্ব্বে পরাণবাবু জাল রাজার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া পিয়ারালাল নামে একজন ক্ষত্রিয়কে কালনায় পাঠাইয়াছিলেন। সে ব্যক্তি এতদূর পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল যে, বাজারের কেহ কোন দ্রব্য জাল রাজাকে বিক্রয় করিতে সাহস করিত না। অধিক মূল্যে যে যাহা বিক্রয় করিত, তাহা অতি গোপনে।

কালনায় একজন পাদরি থাকিতেন, তাঁহার নাম এলেকজাণ্ডার, তাঁহাকে মেজেষ্টার সাহেব একখানি স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়াছিলেন যে, জাল রাজা কালনায় পেঁীছিয়া কিরূপ ব্যবহার করেন ও তাঁহার সঙ্গে কত লোক তাহা গোপনে অনুসন্ধান করিয়া জানাইবেন। এ পত্রের সন্ধান পিয়ারালালবাবু জানিতেন, অতএব পাদরি সাহেবের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য তিনি একজন খৃষ্টানকে হস্তগত করিলেন। সেই খৃষ্টান যাহা বলিত, তাহাই পাদরি সাহেব মেজেষ্টারকে লিখিতেন, স্বয়ং কোন বিষয় তদন্ত করিতেন না। এ কথা তিনি পরে জোবানবন্দিতে আপনি স্বীকার করিয়াছিলেন।

কালনার দারোগা রাজবাটীর অনুগত, তাঁহার নিমিত্ত পিয়ারালালবাবুকে কোন কষ্ট করিতে হইল না। দারোগা পুনঃ পুনঃ পিয়ারালালকে জানাইলেন যে, "আপনি

* এই মিনিটের কথা সুপরিম কোর্টে জোবানবন্দিতে প্রকাশ পায়

† ২রা বৈশাখ ১২৪৫, ইংরেজি ১৩ই এপ্রেল ১৮৩৮।

নিশ্চন্ত থাকুন, এ অধীন জীবিত থাকিতে জাল রাজা কখন কাল্‌নায় পদার্পণ করিতে পারিবে না।"

দারোগার নাম মহিবুল্লা। লেখাপড়া তিনি একবারে জানিতেন না, দারোগাগিরি কর্ম্মে লেখাপড়া জানা অনাবশ্যক বলিয়া তখনকার মেজেষ্টার সাহেব প্রায়ই মূর্খদের এ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। দারোগারা একজন করিয়া মুহুরি রাখিতেন, তাহারাই রিপোর্ট লিখিয়া দিত। দারোগারা কেবল তাহাতে মোহর ছেন্দ[৩৬] করিতেন। পিয়ারালালবাবু মহিবুল্লার মুহুরিকে হস্তগত করিলেন।

জাল রাজার মোক্তারেরা বর্দ্ধমানে পৌঁছিবা মাত্রই যে, জেলখানায় প্রেরিত হইয়াছে, এ সংবাদ জাল রাজা কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই। সুতরাং "বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি" ভাবিয়া কিছুদিন নিশ্চন্ত থাকিলেন। কিন্তু কতদিন আর চুপ করিয়া নৌকায় বসিয়া থাকিবেন? একবার কাল্‌নায় নামিতে ইচ্ছা করিলেন।

৯ই বৈশাখ তারিখের প্রাতে বেলা ৮টার সময় নৌকা হইতে নামিবার উদ্যোগ হইল। তাঁহার সঙ্গে তাঞ্জাম ও বাহক ছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ পাথুরিয়া মহল ঘাটে গিয়া নৌকা ভিড়াইল। নগরে রাষ্ট্র হইল যে, রাজা আসিতেছেন, আবালবৃদ্ধ সকলে পাথুরিয়া মহল ঘাটের[৩৭] দিকে ছুটিল। পিয়ারালাল থানার দিকে ছুটিলেন। দারোগা তখন অতি ব্যস্ত হইয়া পোষাক পরিতেছিলেন...পিয়ারালাল গিয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইল, শীঘ্র আসুন।" দারোগা পাগ্‌ড়ি জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন, "ভয় কি, এই আমি চলিলাম, কাহার সাধ্য এখানে নৌকা ভিড়ায়।" মহিবুল্লা দারোগা বাহির হইলেন, সঙ্গে জমাদ্দার, বরকন্দাজ, চৌকিদার প্রভৃতি অনেকে চলিল। তাঁহার ইচ্ছা —সদর্পে চলেন, কিন্তু তিনি অতি স্থূলকায়* একটি প্রকাণ্ড মহিষাকার বলিলেই হয়, সদর্পে বা শীঘ্র চলা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। সুতরাং মহিবুল্লা যথাকালে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। যখন জাল রাজার নৌকা ঘাটে ভিড়িতেছে, মহিবুল্লা তখন অতি ব্যস্ত হইয়া নৌকার নিকটে গেলেন, আভূমি নতশিরে জাল রাজাকে সেলাম করিয়া যোড়-করে দাঁড়াইলেন। রাজা নৌকা হইতে তাঞ্জামে উঠিলেন, একজন ভৃত্য আসিয়া রাজার দক্ষিণ দিকে একখানি তরবারি রাখিয়া গেল।** আর একজন ছাতি ধরিল, তৃতীয় একজন আড়ানি ধরিল, অপর দুই জন চামর করিতে লাগিল, পাঁচ ছয় জন আশা সোটা

* **"Mahiboollah, the worthy Darogah of Culna, the constituted authority, who can neither read nor write nor walk nor run."**
Petition to the Nizamut Audalut.

** বর্দ্ধমানের রাজারা জাতিতে ক্ষত্রিয়। জাতীয় ধর্ম্মানুরোধে হউক, অথবা রাজা বলিয়াই হউক, তরবারি তাঁহাদের পরিচ্ছদের মধ্যে গণ্য। কিন্তু জাল রাজার তাঞ্জামে তরওয়ার থাকায় "drawn sword" বলিয়া পাদরি সাহেব রিপোর্ট করিয়াছিলেন ও মেজেষ্টার সাহেব ভয় পাইয়াছিলেন।

ধরিল। সম্মুখে নকিব ফুকারিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মহিবুল্লা ফুকারিয়া উঠিলেন—"তফাৎ, তফাৎ"—আর লোক তাড়াইতে লাগিলেন। তাঞ্জামের দুই পার্শ্বে দুই জন আরদালি তাঞ্জাম ধরিয়া যাইতেছিল, মহিবুল্লা একজনকে সরাইয়া আপনি আরদালি হইয়া তাঞ্জাম ধরিয়া চলিলেন। জাল রাজাকে দেখিয়া গঞ্জের বৃদ্ধ মহাজনেরা চিনিল, তাহারা আসিয়া গলার কাপড় দিয়া দাঁড়াইল, দূর হইতে স্ত্রীলোকেরা উলু দিতে লাগিল। আনন্দের আর সীমা রহিল না। নগর প্রদক্ষিণ করিয়া রাজা নৌকারোহণ করিলেন ; সেই সময় কয়েক জন বৃদ্ধ আসিরা আপন আপন পরিচয় দিতে লাগিল। রাজা তাহাদের সঙ্গে অনেক পূর্ব্ব কথা কহিলেন। বৃদ্ধেরা আহ্লাদে চক্ষের জল মুছিয়া ঘরে ফিরিল।

এই ব্যাপারের কথা, পাদরি এলেকজাণ্ডার সাহেব আপনার খৃষ্টানের নিকট শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মেজেষ্টারকে লিখিলেন যে, একশত তরবারধারী আর দুইশত সড়কিওয়ালা লইয়া প্রতাপচাঁদ কালনা প্রদক্ষিণ করিয়া গিয়াছে। রাজবাটীর প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল। কেবল সুদক্ষ দারগার জন্য কিছু করিতে পারে নাই। ছয় হাজার কি আট হাজার লোক জমিয়াছিল। যদি প্রতাপচাঁদকে শীঘ্র দমন করা না হয়, তবে বোধ হয়, একটা দাঙ্গা উপস্থিত হইবে।*

পত্র পাইয়া মেজেষ্টার সাহেব, প্রতাপচাঁদের গ্রেপ্তারি জন্য তাঁহার চতুর নাজির আসাদ আলিকে পাঠাইয়া দিলেন। পরাণবাবুও এই সুযোগ পাইয়া রাধামোহন সরকারের সঙ্গে বিস্তর লাঠিয়াল পাঠাইলেন।

পূর্ব্বে সমুদয় বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে একজন পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। মেজেষ্টারেরা তাঁহারই আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতেন। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সেই সময় স্মিথ্ সাহেব এই পদে ছিলেন। কিন্তু তিনি জাল রাজাকে গ্রেপ্তার করিতে পরামর্শ কি হুকুম দেন নাই, তিনি কেবল লিখিয়াছিলেন যে, যদি জাল রাজা আপনার লোক বিদায় না করে, তবে তাহার নিকট হইতে ফেলজামিন লইতে পার।** মেজেষ্টার সাহেব এই পরামর্শ অনুসারে পূর্ব্বে পরওয়ানা জারি করিয়া-

* My Dear Sir,—Protap Chund has just gone on board his boat, after parading the whole length of Kalna in a *Tonjohn* with a drawn sword in his own hand, attended by upwards of a hundred swordsmen and double that number of stickmen. The concourse was altogether 6,000 or 8,000. He appeared to be intent on the Rajbarry. But your active Darogah prevented him. The aspect of things, I think, threatens an affray, if he is not checked soon.

I am &c. A. Alexander

** Extract from Superintendent's letter, No. 400, dated 28th. April, 1838.

ছিলেন। জাল রাজাও তদনুসারে লোক বিদায় করিতে চাহিয়াছিলেন, কেবল এই মাত্র ওজর করিয়াছিলেন যে, কোন্ কোন্ লোক বিদায় করিবেন, তাহা তাঁহাকে বলিয়া বা দেখাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু মেজেষ্টার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া একবারে তাঁহাকে গ্রেপ্তারের নিমিত্ত নাজিরকে পাঠাইলেন। নাজিরকে পাঠাইয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার স্মরণ হইল যে, পূর্ব্বদিন একটি পল্টন* বর্ধমান দিয়া বারাকপুর গিয়াছে। অতএব আর ইতস্ততঃ না করিয়া পত্র দ্বারা তাহার কাপ্তেনকে পথে আটক করিলেন। জজ সাহেব এই বার্ত্তা শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং মেজেষ্টার সাহেবের সঙ্গে ডাক্তার চিক সাহেব কাল্নায় যাইতেছেন শুনিয়া আপনার দুইটি পিস্তলে স্বহস্তে গুলি পুরিয়া উভয়কে সাদরে দিলেন।

কাপ্তেন সাহেব পত্র পাইয়া সিপাহী সমভিব্যাহারে বৈঁচিতে[৩৮] অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন। সেই দিন অপরাহ্নে মেজেষ্টার সাহেব স্বয়ং আর ডাক্তার সাহেব একত্রে তথায় উপস্থিত হইলেন। জাল রাজার সংবাদের নিমিত্ত মেজেষ্টারের আদেশমত ডাক্তার সাহেব তথা হইতে কাল্নার পাদরিকে এক পত্র লিখিলেন। উত্তরে পাদরি ভয় দেখাইলেন। সুতরাং মেজেষ্টার সাহেব ফৌজ লইয়া তৎক্ষণাৎ কাল্না যাত্রা করিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে পল্টন কাল্নায় পৌঁছিল। কাপ্তেনের নাম লিটিল। তিনি মেজেষ্টার সাহেবের পরামর্শ মতে প্রথমে সিপাহী লইয়া পাদরি সাহেবের কুঠিতে গেলেন, তথায় স্থির হইল যে, মেজেষ্টার একপার নদীর কূলে গিয়া

"4th. The conduct of the claimant of the Burdwan Raj, appears to me to be of such a dangerous nature, so insulting to the family in possession, that I think there is every reason to apprehend a serious affray. * *

"5th. Considering the tendency of his acts to tumult and riot, I am of opinion, that you will be fully justified in requiring to disband his array, and to behave himself like a good and quiet subject, and on his refusal to obey or evasion of your orders, I think you will be fully justified in calling on him to furnish good security to keep the peace.

"6th. It will be necessary previous to the adoption of such a measure to take evidence of his having assembled such a body of men, and of the tendency of their conduct to break the peace."

* A detachment of 3rd Regiment N. I. under the command of Captain Little.

সংবাদ হইয়া আসিবেন ; তাহার পর ইতিকর্ত্তব্য স্থির হইবে। ওগলবি সাহেব পিস্তল হস্তে লইয়া দারোগা ও নাজিরের সঙ্গে ঘাটে গেলেন। তথা হইতে কাপ্তেন লিটিলকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "বিনা যুদ্ধে জাল প্রতাপকে গ্রেপ্তার করা কঠিন। অতএব আপনি স-সৈন্য সত্বর আসুন।" পত্র পাইয়া কাপ্তেন সাহেব হুকুম দিলেন, অমনি সিপাহীরা বন্দুকে গুলি গাদিল, তাহার পর গম্ভীর পদচারণে তাহারা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল। সম্মুখে জল কলকল করিয়া ছুটিতেছে। এখানে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হবে, সিপাহীরা বুঝিতে পারিল না। গঙ্গার মধ্যস্থানে একখানি পিনিস নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে ; তৎপশ্চাতে চারি পাঁচখানি বজরা, তাহার পশ্চাৎ কতকগুলি পানসী ব্যতীত আর কিছুই নাই। মাঝিরা নৌকার ছাদে, ভদ্রলোকেরা নৌকার ভিতরে নিদ্রা যাইতেছে। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। নৌকার আলোক নিবিয়া গিয়াছে—সকল অন্ধকার, সকলে ঘুমাইতেছে, নৌকাও যেন ঘুমাইতেছে। এমন সময় কাপ্তেন সাহেব মেজেন্টারের সহিত কি পরামর্শ করিয়া ফায়ারের হুকুম দিলেন। ওগলবি সাহেব নৌকা দেখাইয়া "মার, মার" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার পিস্তল ছুড়িলেন। অমনি গুড়্গুড়্ করিয়া পল্টনের বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল। নৌকার ছাদে যাহারা নিদ্রিত ছিল, তাহাদের মধ্যে ১৮ জনের আর নিদ্রা ভাঙ্গিল না। অপর মধ্যে কাহার হাত ভাঙ্গিল, কাহার পা ভাঙ্গিল, কাহার দেহ উলটিয়া জলে পড়িল। জাল রাজা হঠাৎ উঠিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। পশ্চাতের বজরা হইতে আর একজন লাফ দিয়া গঙ্গায় পড়িলেন, তাঁহার নাম রাজা নরহরি চন্দ্র[৩৯]—নিবাস হরধাম।[৪০] উভয়ে গঙ্গাপার হইয়া শান্তিপুরের[৪১] উত্তরে একস্থানে লুকাইয়া থাকিলেন।

এ দিকে যুদ্ধ ফুরাইল, যুদ্ধের পর লুঠ। সুতরাং লুঠ আরম্ভ হইল। সিপাহীরা ঘাট হইতে নৌকা খুলিয়া লইয়া পিনাসে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে আসাদ আলি নাজির ও মহিবুল্লা দারোগা আপন আপন দলবল লইয়া উপস্থিত হইলেন। জাল রাজা, রাজা সাজিয়াছেন, কর্জ্জ করিয়া রাজার আসবাব কিনিয়াছিলেন, সোণার আসা, সোণার সোটা, সোণার ছাতি, সোণার আড়ানি, লুঠের মুখে সকলই অন্তর্হিত হইল।

লুঠ শেষ হইলে পর, গ্রেপ্তার আরম্ভ হইল। মাঝিমাল্লা, খানসামা, খেদমৎগার, যাহারা গুলিবৃষ্টিতে রক্ষা পাইয়াছিল এবং জলে ঝাঁপ দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই ধরা পড়িল ; কিন্তু তাহাদের সংখ্যায় নাজিরের মন উঠিল না। দারোগা, নাজির উভয়েই রিপোর্ট করিয়াছেন যে, রাজার সঙ্গে ৭০০ কি ৮০০ লোক। রাজা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে ৩৪২ জন লোক। এখন অল্প লোক চালান দিলে গ্রেপ্তার অসম্পন্ন হয়, সুতরাং গ্রেপ্তারীর আড়ম্বর কিছু বাড়াইতে হইল। নিকটে দুই একখানি তীর্থযাত্রীর নৌকা ছিল, নাজির সে সকল নৌকা হইতে যাত্রীদের বাহির করিয়া আনিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি স্ত্রীলোক বাহির হইল। কিন্তু স্ত্রীলোক বলিয়া ত্যাগ করার আর সময় নাই, সুতরাং তাহারা জাল রাজার সঙ্গী

বলিয়া গ্রেপ্তার হইল। ওগলবি সাহেব ২রা মে (১৮৩৮) তারিখের রোবকারীতে সেই হতভাগ্যদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দ্রবময়ী বেওয়া, স্বর্য্য, গঙ্গামণি, অন্নু, চন্দ্রমণি, তুলসী, পদ্ম গোয়ালিনী, কন্ন, পদ্ম ঠাকুরাণী, গন্না ঠাকুরাণী, দাসী ঠাকুরাণী ইত্যাদি। বৃদ্ধারা বর্দ্ধমানে চালান গিয়া প্রায় নয় মাস তথায় আবদ্ধ থাকিল। যেরূপ তখন গবর্ণমেণ্ট ছিল, যেরূপ কর্ম্মচারী ছিল, যেরূপ সমাজ ছিল, তাহাতে বিপদ্‌গ্রস্তের নিকটে আসিলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইত। মন্দ সমাজের দোষ এই। যদি আমাদের সমাজ ভাল হইত, যদি আমরা নিজে ভাল হইতাম, আসাদ আলি ভাল হইতেন, মহিবুল্লা ভাল হইতেন, তাহা হইলে মেজেষ্টার সাহেব অত্যাচার করিতে সাহস পাইতেন না। যেরূপ সমাজ, সেইরূপ গবর্ণমেণ্টে হইয়া থাকে। সমাজের দোষে গবর্ণমেণ্ট মন্দ হয়, সমাজের গুণে গবর্ণমেণ্ট ভাল হয়।

কালনাগঞ্জের যে সকল বৃদ্ধ দোকানদার জাল রাজাকে চিনিয়াছে বলিয়াছিল, তাহারাও তীর্থযাত্রীর সঙ্গে সঙ্গী হইল। তথাকার কতকগুলি স্ত্রীলোকও সেই দশাপন্ন হইল। মেজেষ্টার সাহেব তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত রোবকারীতে[৪২] লিখিয়াছেন যে, "তারা আর গুণমণি জাল রাজার লোককে বাটীতে অন্নপাক করিতে দিয়াছিল। গৌরমণি তারার বাটীতে থাকে। গোবিন্দ সরকার আর নাথু পাইক গুণমণির দোকানে চাকুরী করে। আর, তারাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন সেখানে কিশোরমণি উপস্থিত ছিল। সুতরাং এই সমস্ত লোকই গ্রেপ্তারযোগ্য।"

এইরূপে ২৯৪ জন গ্রেপ্তার হইয়া বর্দ্ধমানের জেলখানায় প্রেরিত হইল। জাল রাজা আর নরহরি চন্দ্র শান্তিপুরের নিকটে ধরা পড়িলেন। কিন্তু জাল রাজাকে বর্দ্ধমানে না পাঠাইয়া হুগলির জেলে পাঠান হইল। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহাকে বর্দ্ধমানে চালান দেওয়া হয়। তিনি ত বর্দ্ধমানেই যাইতেছিলেন, রাজার মত যাইতেন —না হয় অপরাধীর মত গেলেন। যেরূপেই যান, বর্দ্ধমানে যাইতে পারিলেই তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূরণ হইল না। সিপাহী-পরিবেষ্টিত হইয়া হুগলিতে বিচারের নিমিত্ত প্রেরিত হইলেন। নরহরি চন্দ্র প্রভৃতি আর সকলে বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু যে জেলায় অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল, সে জেলায় তাঁহার বিচারের পক্ষে কি আপত্তি ছিল, তাহা কোন কাগজপত্রে প্রকাশ নাই। কেহ কেহ অনুভব করেন, পূর্ব্বেই পরামর্শ ছিল, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হুগলির জেলখানায় পাঠাইতে হইবে।

জাল রাজা গ্রেপ্তার হইলে পর, তাঁহার উকীল ডাব্লিউ. ডি. সা (W.D.Shaw)[৪৩] গ্রেপ্তার হইলেন। তিনি পূর্ব্বে জাল রাজার সম্ভিব্যাহারে আসিতে পারেন নাই; লড়াইয়ের তিন চারি দিন পূর্ব্বে আসিয়া পেঁছিয়াছিলেন। যে রাত্রে লড়াই হয়, সে রাত্রে সা সাহেব উপস্থিত ছিলেন না—নিকটে পাইগাছি[৪৪] গ্রামে লায়েল সাহেবের নীলকুঠিতে গিয়াছিলেন; প্রাতে তথা হইতে আসিতে ছিলেন, পথে ওগলবি সাহেব তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। উকিল—British-born subject, প্রভৃতি কত কথাই

বলিলেন। মেজেষ্টার সাহেব তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। গ্রেপ্তারের সময় সা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার কি অপরাধ? মেজেষ্টার সাহেব মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "রাজবিদ্রোহিতা (Treason !)"।

মেজেষ্টারের মুখে হঠাৎ যাহা আসিয়াছিল, তাহাই যে তিনি বলিয়াছিলেন – এমত নহে। পরে পুলিস সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট সাহেব আপনার ১৮৩৯ সালের ২৪ মে তারিখের ৫২৭ নং পত্রে এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি আসামীদের এই বলিয়া উল্লেখ করেন যে, "Persons accused of being conspirators against the Government and of resistance to the constituted authorities."

সা সাহেব গ্রেপ্তার হইয়াছেন—এই জনরব শুনিয়া পাইগাছির নীলকর সাহেব তাহা সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত তাঁহার একজন সরকারকে পাঠাইয়া দিলেন। আসামীর তত্ত্ব লইতে আসিয়াছে বলিয়া সেই সরকারকে তৎক্ষণাৎ হাজতে যাইতে হইল। এবং সে ব্যক্তি যে হাতী চড়িয়া আসিয়াছিল, সে হাতীটিও সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার হইল।

প্রতাপচাঁদের পরম বন্ধু নবাববাবু সিঙ্গুর হইতে একাকী বর্দ্ধমানে গিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। সে সংবাদ মেজেষ্টার সাহেব কিরূপে পাইলেন এবং যথানিয়মে তাঁহাকে জেলে পুরিলেন।

তাহার পর, আর কাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন খুঁজিতে লাগিলেন। শেষ সন্ধান পাইলেন যে, বিলকুলির[৪৫] নবাব আনওয়ার আলি, জাল রাজার স্বপক্ষ; অতএব তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত হুগলির মেজেষ্টারকে পত্র লিখিলেন। সেই সঙ্গে জাহানাবাদের[৪৬] রামদীনু সিংহ ও বল্লালদীঘির[৪৭] হাফেজ ফতে আলিকে গ্রেপ্তার করিতে অনুরোধ করিলেন। আরও জনকয়েককে গ্রেপ্তার করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন যে, কলিকাতার মুলুকচাঁদ বাবু[৪৮] পানিহাটির[৪৯] জয়নারায়ণ বাবু[৫০] প্রভৃতি কয়েকজন জাল রাজার নৌকায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিবার কি চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা কাগজপত্রে প্রকাশ নাই।

লড়াই হইল, লুঠ হইল, গ্রেপ্তার হইল, কিন্তু একটা কাজ বাকি থাকিল। মেজেষ্টারিতে এত্তেলা গিয়াছিল যে, জালরাজার সঙ্গে, পাঁচ সাত শত অস্ত্রধারী আছে; কিন্তু তাহাদের সেই সব অস্ত্র কোথায় গেল? নৌকায় পোনরখানি তরওয়ার, ৩টি কি ৪টি বন্দুক আর একটি পিস্তল ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। দারোগা সাহেব বড়ই গোলে পড়িলেন। আসাদ আলি নির্ভীক পুরুষ—তৎক্ষণাৎ কালনার রাজবাটী হইতে এবং অন্যান্য স্থান হইতে ৮৬ খানি তরওয়ার সংগ্রহ করিলেন। তাহার পর মেজেষ্টার সাহেবকে জানাইলেন যে, "সিপাহীরা সমস্ত তরওয়ার লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি বহু যত্নে তাহাদের নিকট হইতে পঞ্চশখান মাত্র উদ্ধার করিয়াছি। এখনও তাহাদের নিকট এত তরওয়ার আছে যে, গাড়ী বোঝাই হইতে পারে।" কাপ্তেন লিটিল এই সময় হুগলিতে পৌঁছিয়াছেন অনুভব করিয়া ওগলবি সাহেব হুগলির মেজেষ্টারকে পত্র লিখিলেন যে, সিপাহীদের নিকট হইতে তরওয়ারগুলি

লইয়া পাঠাইয়া দিবেন ; কেন না সেই তরওয়ারগুলিই এই মোকদ্দমার প্রধনা প্রমাণ ।*

৮

ওগলবি সাহেব আসামী ।

কাপ্তেন লিটিল সাহেবের যুদ্ধের পর, কলিকাতার ইংরেজি কাগজে তাঁহার বিস্তর প্রশংসা প্রকাশ হইল । ৮ই মে তারিখের হরকরা লিখিলেন যে, সিপাহীদের বুঝিবার দোষে কয়জন লোক আহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু "The arrangements and proceedings of this officer (Captain Little) reflect equal credit on his judgment and humanity." শেষ কথাটি বড় ঠিক !

জাল রাজা সম্বন্ধে তাঁহারা কেহ কটু বলিলেন, কেহ রসিকতা করিলেন । কোরিয়ার (Courier) পত্রের সম্পাদক লিখিলেন, "There is a good chance of his, closing his eventful career, an *exalted character*. হরকরা তাহার টীকা করিয়া বুঝাইলেন যে, "exalted situation অর্থে বুঝিতে হইবে,—ঊর্দ্ধে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলন ।" লোকে ভাবিল, বিচার বটে ! খুন করিল কোম্পানীর সিপাহী, ফাঁসি যাইবে জাল রাজা ।

এই সময় কে একজন, সম্পাদকদের ধমক দিয়া, হরকরায় লিখিলেন যে, "আমি বিশেষ জানি, সে রাত্রে নৌকার নর্দ্দমা দিয়া রক্ত গড়াইয়া গঙ্গায় পড়িয়াছিল—ঘুমন্ত

* Extract from a letter from the Acting Magistrate of Burdwan to the Magistrate of Hooghly, dated the 6th May, 1838.

"In my recent capture of *soi distant* Rajah of Burdwan, with his armed followers, some hundreds of swords were discovered in his boats. The Sepoys, however, of Captain Little's detachment considering them their fair plunder, appropriated to themselves as many as they could carry away. Their camp-followers did the same and my Burkundazes and Chowkeedars caught the infection, so that here are only now 86 swords forthcoming ; of which upwards of 50 were received from sepoys. * * As Captain Little is today at Hoogaly, may I request you will join with him, if necessary, in making the necessary search in his camp, and do your best to get possession for me the plundered swords. It is of the greatest importance to get them, as they form such strong evidence in the case."

লোকের রক্ত। তোমরা তাহা ভুলিয়া কেবল কাপ্তেনের প্রশংসা করিতেছ, মেজেষ্টারের প্রশংসা করিতেছ। এই ঘটনা যদি আজি ইংলণ্ডে হইত, তাহা হইলে সেখানকার সম্পাদকগণ কি বলিতেন ?" এই পত্রের পর সম্পাদকদের সুর যেন একটু ফিরিল, তদারকের নিমিত্ত তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন। ক্রমে ডেপুটি গবর্ণর রস সাহেবের আসন একটু টলিল, তিনি তদারকের হুকুম দিলেন। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, তখন মেজেষ্টারদিগের উপর পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, তাঁহার নাম স্মিথ সাহেব। তদারকের ভার সুতরাং তাঁহার উপরেই পড়িল। কিন্তু তিনি অতিপ্রধান পদস্থ ব্যক্তি। যখনই কিছু তদারকের প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি এ কাল পর্য্যন্ত মেজেষ্টারকে তাহার ভার দিয়া আসিয়াছেন। এবারও তাহাই দিলেন। সুতরাং মেজেষ্টার ওগলবি আপনার অপরাধের তদারক আপনি করিতে বসিলেন।

এদিকে উকীল সা সাহেবের কেরাণী জয়নারায়ণ চন্দ্র এফিডেবিড করিয়া সা সাহেবের খালাসের নিমিত্ত সুপ্রিম কোর্টের (Writ of *Hebeas Corpus*) পরওয়ানা[৫১] বাহির করিলেন। কিন্তু সে পরওয়ানা ওগলবি সাহেব বড় গ্রাহ্য করিলেন না।

যতক্ষণ কথা হইতেছিল, বাঙ্গালির রক্ত নৌকার নৰ্দ্দমা দিয়া গড়াইয়াছে, ততক্ষণ ওগলবি সাহেবের ন্যায় মেজেষ্টার নিমিত্ত কোন ইংরেজের ভয় হয় নাই। কিন্তু যখন প্রকাশ হইল যে, সুপ্রিম কোর্টের পরওয়ানা এই মেজেষ্টার অগ্রাহ্য করিয়াছেন, আর অমনি হরকরা লিখিলেন যে, তবে আমাদের আর রক্ষা নাই। "The British inhabitants o: Bengal will now look with intense anxiety to the course which Sir Edward Ryan may adopt on this occassion. On him will depend in a great measure the degree of protection for life and property and freedom, Europeans *not in the service* may expect. If it be once ruled that a Company's servant can held a writ of *Habeas Corpus* at arm's lengths, no man is safe."

কিছুদিন পরে মেজেষ্টার সাহেব জামিন লইয়া সা সাহেবকে খালাস দিলেন। কলিকাতায় পৌঁছিয়াই সা সাহেব ওগলবির নামে বেআইনি কয়েদ রাখার জন্য পুলিসে নালিস করিলেন। এই মোকদ্দমার এজাহারে অনেক কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সুপ্রিম কোর্টের এটর্নি ও কৌন্সলিদের মধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। মফঃস্বলের অরাজকতা সম্বন্ধে সকলে একবাক্য হইলেন। সকলেই বলিলেন যে, ওগলবির নামে খুনের নালিস আনা উচিত। কিন্তু শেষ স্থির হইল যে, প্রথমে গবর্ণমেণ্ট কি করেন, তাহা দেখিয়া পরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মীমাংসা করা যাইবে। পুলিসে যে জোবানবন্দী হইয়াছিল, কৌন্সলিরা তাহার নকল গবর্ণমেণ্টে পাঠাইলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ না করায় তাঁহারা ওগলবি সাহেবের নামে খুনের নালিস উপস্থিত করাইলেন।

স্মিথ সাহেব দেখিলেন যে, গতিক বড় ভাল নহে, সুতরাং তাঁহাকে বর্দ্ধমানে যাইতে হইল। তথা হইতে তিনি কি রিপোর্ট করিলেন আমরা তাহা দেখি নাই, কিন্তু সেই রিপোর্ট পাইবার পর গবর্ণমেণ্ট কিছু দিনের নিমিত্ত ওগলবি সাহেবকে ছুটী দিলেন। এদিকে রাষ্ট্র হইল যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সস্পেণ্ড করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সুপ্রিম কোর্টে হাজির হইতে হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অবকাশ দিয়াছিলেন এবং যথানিয়মে তাঁহাকে সম্পূর্ণ বেতনও দিয়াছিলেন।

এই স্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আমাদের মধ্যে শাক্ত আর বৈষ্ণব যেরূপ দলাদলি ছিল, এদেশে ইংরেজদের মধ্যে কোম্পানীর চাকর আর অপর দলে প্রায় সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। যে সাহেবরা কোম্পানীর চিহ্নিত চাকর (covenanted servants) তাঁহাদের অহঙ্কার ছিল যে, আমরা এদেশের হর্ত্তাকর্ত্তা, আর কোন সাহেব আমাদের সমকক্ষ নহে। সুপ্রিম কোর্টের উকিল কৌন্সলিরা কোন মোকদ্দমায় মফঃস্বল আদালতে আসিলে এই হর্ত্তাকর্ত্তাদের যথেচ্ছাচারিতার কিছু ব্যাঘাত হইত, এবং বিদ্যাবুদ্ধিও ধরা পড়িত, সুতরাং তাঁহারা কৌন্সলিদের দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কোম্পানীর কোন কোন জজ, আপন আপন নির্ভীকতা অথবা যথেচ্ছ ক্ষমতা দর্শাইবার জন্য কৌন্সলিকে কখন কখন তুচ্ছ করিতেন, তাঁহার মক্কেলের সর্বনাশ করিতেন, আইনকানুন কিছু মানিতেন না, শুনিতেন না। সুতরাং কৌন্সলিরা চিহ্নিত চাকরদের প্রতি একটু অশ্রদ্ধা করিতেন। অপর সাহেবেরাও বিশেষ সম্ভ্রম পাইতেন না বলিয়া চিহ্নিত চাকরদের প্রতি একটু বিরক্ত ছিলেন।

এই দলাদলির ফল কতকটা এই সময় ফলিয়াছিল। এ দলাদলি না থাকিলে, ওগলবি সাহেব হয় ত সা সাহেবকে কয়েদ করিতেন না। কিন্তু তাহা না করিলে, হয় ত কালনার হত্যাকাণ্ড কৌন্সলিদের অন্তঃস্পর্শ করিত না। কালনার ব্যাপার সম্বন্ধে যাহা কিছু তদারক হইয়াছিল, তাহা কেবল কৌন্সলিদের উদ্যোগে। ওগলবি সাহেব যে খুনের নিমিত্ত আসামী হইয়াছিলেন, তাহাও ইঁহাদের যত্নে। নতুবা এই হত্যাকাণ্ড হয় ত গবর্ণমেণ্ট শুনিতেও পাইতেন না।

ওগলবি সাহেবকে কলিকাতার মেজেস্টার ওহনলন সাহেব জামিন লইয়া দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন। সুপ্রিম কোর্টের জজ, স্যার জে, পি গ্রাণ্ট সাহেবের নিকট ১৩ই আগষ্ট তারিখে বিচার আরম্ভ হইল। জজ, কৌন্সলি প্রভৃতি সকলেই "পরচুল" (Periwig) পরিয়া স্ব স্ব স্থানে আসিয়া বসিলেন। তখনও সাহেবদের মধ্যে পেরিউইগ পরার প্রথা ছিল। পিটার কোং (Pittar & Co.) তখন কলিকাতার মধ্যে প্রধান পেরিউইগওয়ালা। জুরি সকলেই ইংরেজ, তাঁহাদের মধ্যে প্রথমে একজন বাঙ্গালী ছিলেন, কিন্তু আসামীর কৌন্সলি আপত্তি করায় তাঁহার পরিবর্ত্তে আর একজন ইংরেজ মনোনীত হইলেন।

আসামী ওগলবি হাজির হইলেন। আর তাঁহার সে তেজ, সে দাম্ভিকতা নাই, মুখখানি শুকাইয়াছে, বড় দুর্বল। পীড়া হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাকে বসিতে একখানি

কেদারা দেওয়া হইল। তাঁহার মুখ দেখিয়া ইংরেজেরা পীড়া মনে করিয়াছিল। কিন্তু তিনি বাঙ্গালী হইলে লোকে বলিত, ভয়ে তাঁহার মুখ শুকাইয়াছে। আসল কথা, যাহারা অত্যাচারী, তাহারা বড় ভীরু। যাহারা সুবিধা পাইলেই অত্যাচার করে, তাহারা ধরা পড়িলেই পায়ে ধরে। ওগলবি সাহেব বড় ভীরু ছিলেন, তাই তিনি এত অত্যাচার করিয়াছিলেন, এবং ধরা পড়িয়া তাই তাঁহার মুখ এত শুকাইয়াছিল।

তাঁহার পক্ষে কৌন্সিলি প্রিন্সেপ। ফরিয়াদীর পক্ষে কৌন্সিলি লঙ্গবিল ক্লার্ক। ফরিয়াদীর পক্ষ সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম্ভ হইল।

একজন সাক্ষী জাল রাজা। তাঁহাকে দুই জন সার্জন আর মেজেষ্টার সাহেব স্বয়ং সঙ্গে করিয়া হুগলি হইতে আলিপুরের জেলে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। আলিপুর হইতে সার্জনের পাহারায় আদালতে আনা হইল। এবং যখন তিনি জোবানবন্দী দিবার জন্য দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই জন সার্জন তাঁহাকে ঠেসিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া অনেকে হাসিতে লাগিল, সকলেই বুঝিল যে হাকিমদের ভয়, পাছে জাল রাজা তথা হইতে অন্তর্ধান হন, তাই তাঁহাকে সার্জনরা ঠেসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জাল রাজা জোবানবন্দীতে বলিলেন ঃ—"কালনায় একদিন রাত্রে বন্দুকের শব্দে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তারাচাঁদ চক্রবর্তী চীৎকার করিয়া বলিল, 'আমায় গুলি লাগিয়াছে।' এই কথা শুনিয়াই আমি জলে ঝাঁপ দিলাম। আমি পলাইতেছি জানিতে পারিয়া সিপাহীরা জলে গুলি মারিতে লাগিল। বন্দুকের আলোক দপ করিয়া উঠে, আর আমি ডুব মারি। গুলি আমার চারিদিকে পড়িতে লাগিল। নৌকায় আমার সঙ্গে ১০ কি ১৫ খানা তরওয়ার, তিনটি কি চারটি বন্দুক, একটি পিস্তল, দুইটি কি তিনটি বর্শা ছিল। আমার স্বসম্পর্কীয়দের সঙ্গে অসম্ভাব হইয়াছিল বলিয়া আমি পলাইয়াছিলাম, কিন্তু মরি নাই, মৃত্যুর ভান করিয়াছিলাম সে সকল অনেক কথা।"

জয়নারায়ণ চন্দ্র জোবানবন্দীতে বলিলেন, "আমি সা সাহেবের কেরাণী, রাত্রে যখন সিপাহীরা গুলি করে, আমি তখন নৌকায় নিদ্রিত ছিলাম। তাহার পর সকালে কলিকাতায় পলাইয়া আসি। (বোম্বেটিয়ার ভয়ে) নৌকাযাত্রীদের সঙ্গে তরওয়ার রাখিতে হয়।

ভিকা সিংহ বলিলেন, "আমি ৩নং পল্টনের সুবাদার। গুলি করিবার পূর্বে 'মারো মারো' হুকুম শুনিয়াছি। সে হুকুম কে দিয়াছিলেন বলিতে পারি না। কিন্তু সাহেবরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখান হইতে এ হুকুম দেওয়া হয়।"

এল, এ, মেকলিন বলিলেন, "আমি ঐ পলটনের এন্সাইন্।[৫২] কাপ্তেন লিটিল সাহেব মেজেষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'প্রতাপকে যেরূপে পারি জীবিত হউক বা মৃত হউক, গ্রেপ্তার করিব কি না।' ওগলবি তাহাতে বলেন, 'হাঁ যেমন করিয়া পার, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।'"

বাবু তিওয়ারী বলিলেন, "গুলি করিবার পূর্বে মেজেষ্টার সাহেব 'মারো মারো'

বলিয়া হুকুম দিয়াছিলেন। একবার গুলি করা বন্ধ হইলে পর যখন বুঝা গেল, রাজা সাঁতার দিয়া পলাইতেছেন, তখন মেজেষ্টার বলিলেন, 'উস্কো গুলিসে মারো।' আবার গুলি আরম্ভ হইল। সকল সাহেবের হাতে বন্দুক ছিল। পাদরী সাহেবও গুলি করিয়াছেন, আমি তাহা দেখিয়াছি। মেজেষ্টার সাহেব প্রথমে গুলি করেন।"

খোদাবক্স্ হাবিলদার বলিল, "গুলি করিতে আমি পাদরীকে দেখি নাই। হয়ত তিনি গুলি করিয়া থাকিবেন, কিন্তু মেজেষ্টার যে, 'মারো মারো' হুকুম দিয়াছেন, তাহা আমার স্পষ্ট মনে আছে।"

কাপ্তেন লিটিল বলিলেন, "গুলি করিতে কেহ হুকুম দেয় নাই। সিপাহীরা ভুলে গুলি করিয়াছে। ওগলবি সাহেব গুলি করিতে হুকুম দিয়াছেন এমত আমি শুনি নাই। তিনি, কি ডাক্তার সাহেব, কি পাদরী সাহেব কেহ গুলি করেন নাই। প্রতাপের সঙ্গে তিন শত যোদ্ধা লোক (fighting men) ছিল। প্রতাপকে ধরিয়া আমার তাঁবুতে রাখিলে পর, দুই প্রহর হইতে অস্ত পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ হাজার লোক জমিয়াছিল। তাহারা রাজাকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে নাই, তবে একটু রুক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিল।"

ডাক্তার চিক বলিলেন, "বর্দ্ধমানের জজ আমাকে ও ওগলবিকে একটা করিয়া পিস্তল নিজ হাতে গুলি পুরিয়া দিয়াছিলেন। গুলি করিবার সময় মেজেষ্টার আমার নিকট হইতে দূরে ছিলেন, সুতরাং তিনি কি বলিয়াছেন, না বলিয়াছেন ; তাহা আমি শুনি নাই। পাদরী এলেক্জাণ্ডার পূর্ব্বে পল্টনের গোরা ছিলেন।"

এইরূপে অনেকে সাক্ষ্য দিলেন, সে সকল লিখিবার প্রয়োজন নাই। বাদীর সাক্ষীর জোবানবন্দী হইয়া গেলে আসামী ওগলবির জবাব আরম্ভ হইবে, কিন্তু তিনি নিজে মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না। একখানি বর্ণনা পত্র লিখিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাও তিনি স্বয়ং পাঠ করিতে সমর্থ হইলেন না। হুগলির মেজেষ্টার সামুয়েল[৫৩] সাহেব সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন, তিনিই আদালতের অনুমতি লইয়া তাহা পাঠ করিলেন।

এই জবাবে আসামী ওগলবি জানাইলেন যে, "আমি নির্দ্দোষী। কালনায় যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহা কেবল সিপাহীদের দোষে। আমি পল্টন লইয়া গিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু কেবল ভয় দেখাইবার নিমিত্ত। সকলেই জানেন, মেজেষ্টারের কার্য্য কি গুরুতর। সকলেই জানেন, পরাণবাবুর কার্য্যদোষে লোকে রাজপরিবারের উপর কতদূর বিরক্ত। এ সময় লোকে জাল রাজার পক্ষ হওয়াতে একটা গোলমাল বাঁধিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। জাল রাজা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হইতে যে হুকুম আমি পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম তাহা দাখিল করা হইয়াছে। ও পক্ষে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে যে, আমি স্বয়ং গুলি করিয়াছি এবং "মারো মারো" বলিয়াছি, তৎসম্বন্ধে ডাক্তার চিক সাহেব ও কাপ্তেন সাহেবের জোবানবন্দীর পর আমার আর কিছু বলা বাহুল্য। যাহাই হউক, যদি কেহ আমাকে, এরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, আমি নিদ্রিত লোকদের সিপাহী

দ্বারা হত্যা করাইতে পারি, তাহা হইলে যে দণ্ডবিধান হইবে, আমি তাহা শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।"*

তাহার পর আসামীর পক্ষে সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম্ভ হইল। আসাদ আলি নাজির, আর মহিবুল্লা দারোগা ভিন্ন আর যাঁহারা সাক্ষ্য দিলেন, তাঁহারা কেহই কালনায় উপস্থিত ছিলেন না। এই সকল সাক্ষীর জোবানবন্দী শেষ হইলে পর, সার জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেব জুরিদের চার্জ দিলেন।

জুরিরা বলিলেন, "ওগলবি সাহেব নির্দ্দোষী।"

জজ সাহেব ওগলবি সাহেবকে খালাস দিলেন, খালাস দিবার সময় তাঁহাকে বলিলেন যে, "You now stand quite free from all charges and imputations, and if there have been a little error of judgment, you are still most clearly proved to have had no participation whatever in the act itself, which resulted so fatally, and to have been acted throughout by no feeling or motive, other than becomes a gentleman."

সংবাদপত্রের সম্পাদকদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন যে, কাপ্তেন লিটিলকে আসামী না করা ভুল হইয়াছিল।

৯

সামুয়েল্স সাহেবের উদ্যোগ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জাল রাজা গ্রেপ্তার হইয়া হুগলি প্রেরিত হইলেন। কিন্তু সে সময় তাঁহার কি দুরবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা বলা হয় নাই, বলিতেও ইচ্ছা নাই। তবে এইমাত্র উল্লেখ করিয়া রাখি যে, জাল রাজা আর তাঁহার সঙ্গী রাজা নরহরিচন্দ্রকে দুইখানি মলিন ক্ষুদ্র বস্ত্র পরাইয়া পুলিস দ্বারা দুই চারিবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হইয়াছিল। কিন্তু কে তাহা দেখিবে? গ্রামে কেহই ছিল না। দোকান বন্ধ, হাট বন্ধ, পথে লোকজন আর চলে না, বৃদ্ধা ভিখারিণীরা পর্য্যন্ত কুঁড়ে ফেলিয়া পলাইয়াছিল। যাহারা ছিল, তাহারা কেবল পরাণবাবুর দলস্থ।

সিপাহী সঙ্গে দিয়া, সেই ক্ষুদ্র বস্ত্র পরাইয়া জাল রাজাকে পদব্রজে হুগলি পাঠান হইল। কিন্তু প্রতাপ পথে কি আহার করিবেন, বোধ হয়, ভুলক্রমে তাহার কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। সুতরাং তাঁহাকে নিরাহারে পথ চলিতে হইল। যেখানে সিপাহীরা অন্নপাক করিত, জাল রাজা সেইখানে বসিয়া আপনার হাতকড়ি নাড়িতেন, আর দেখিতেন। একদিন একটি সিপাহীর দয়া হইল, সে ব্যক্তি আপনার পয়সায় দুটি চা'ল আনিয়া দিল। জাল রাজা সে দিন অতি গুরুতর আহার করিলেন।

জাল রাজা ন-সরাই[৫৪] নামক স্থানে পেঁছিলে বিস্তর লোক যে তাঁহাকে দেখিতে আসিল। হরকরার সম্পাদক বলেন, আট হাজার লোকের ন্যূন নহে। আমরা

* উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা জবাবের অনুবাদ নহে, কেবল স্থূল মর্ম্ম মাত্র।

শুনিয়াছি, তাহাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক প্রতাপের নিমিত্ত অঞ্চলে করিয়া মিষ্টান্ন আনিয়াছিল। তখনও বাঙ্গালা দয়ায় পূর্ণ। আমাদের বহুকালে শিক্ষার ফল এই দয়া সহস্র পুরুষ ধরিয়া ভক্তি আর দয়া বাঙ্গলায় অভ্যাস হইয়াছিল। মুসলমানের সংস্পর্শে এই সহস্র পুরুষ অর্জ্জিত রত্ন লোপ পায় নাই; বরং সংসর্গপ্রাবল্যে মুসলমানদের দয়া মজ্জাগত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ সংস্পর্শে আমরা অনেক মূলধন হারাইয়াছি। আমরা এখন বলি অভ্যাস করিয়াছি—দয়া a weakness—ভক্তি a weakness—স্নেহ a weakness। সুতরাং যাহা দয়ার বিপরীত, যাহা স্নেহের বিপরীত, যাহা ভক্তির বিপরীত, তাহাই strength of mind আবার যদি কখন কারও অদৃষ্ট পোড়ে, যদি এই গরুর পা আবার হস্তান্তর হয়, তখন হয়ত বলিতে অভ্যাস করিব, সত্য বাদ "বেওকুফ"; মিথ্যাবাদ "সিয়ান্তামি"; পরদ্রব্যর "কর্ত্তব্য কার্য্য"; কেন না তাহাতে কখন কখন লাভ আছে—সে সকল দুঃখের কথা যাক। যাহারা প্রতাপের নিমিত্ত খাদ্য বা পয়সা আনিয়াছিল, তাহারা কেহই প্রতাপকে দিতে পারিল না। সিপাহীদের তাড়নায় কেহ তাঁহার নিকট আসিতেও পারিল না।

৫ই মে তারিখে জাল রাজা হুগলিতে পেঁছিলেন। তথাকার জেলখানায় একটী ক্ষুদ্র ঘরে রক্ষিত হইলেন। একখানি কম্বল পাইলেন, সেখানি নূতন কি পুরাতন, কি অন্য কয়েদীর ব্যবহৃত, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না; তবে সংবাদপত্রে কে একজন লিখিয়াছিলেন যে, সেখানি নিশ্চয়ই নূতন।

এই সময়ে হুগলিতে সামুয়েল সাহেব মেজেষ্টার। তিনি ইহার কিছু পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে মেজেষ্টারি করিয়াছিলেন। যখন জাল রাজা সন্ন্যাসিবেশে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হন, তখন তিনি সেখানে ছিলেন। সেই সময় তিনি জাল প্রতাপচাঁদ সম্বন্ধে সবিশেষ সকল কথাই পরাণবাবুর নিকট শুনিয়াছিলেন, সুতরাং সেই অবধি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, জাল রাজা একজন ভয়ানক জুয়াচোর। এক্ষণে হুগলিতে তাহাকে আপন হাতে পাইয়া আপ্যায়িত করিলেন। কোথা হইতে অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিবেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে সেইজন্য এখানে সেখানে পত্র লিখিতে লাগিলেন। কথিত আছে, তিনি এই নিমিত্ত পরাণবাবুকে এক পত্র লেখেন। সে পত্রের নকলের জন্য লেণ্টার সাহেবের নিকট জাল রাজা দরখাস্ত করেন। নকল প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু সামুয়েল সাহেব তাহা দিতে দেন নাই। তিনি দিন কতকের নিমিত্ত অনুপস্থিত ছিলেন। লেণ্টার সাহেব তাঁহার পরিবর্ত্তে কার্য্য করিতেন।

সামুয়েল সাহেব শুনিয়াছিলেন, গোয়াড়ির[৫৫] শ্যামলাল ব্রহ্মচারীর পুত্র কৃষ্ণলাল বলিয়া একজন পাকা জুয়াচোর ছিল। চার পাঁচ বৎসর অবধি সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে; এক্ষণে সেই ব্যক্তিই এই জাল রাজা সাজিয়াছে। অতএব তাহার সোনাক্তের জন্য তিনি নদীয়ার মেজেষ্টার হালকেট সাহেবকে পত্র লিখিলেন। হালকেট সাহেব কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীর কতকগুলি প্রতিবাসীকে পাঠাইয়া দিলেন। সামুয়েল সাহেব তাহাদের সঙ্গে

লইয়া জেলখানায় গেলেন। তাহারা জাল রাজাকে দেখিয়া ভাল সোনাক্ত করিতে পারিল না। সুতরাং সামুয়েল সাহেব বড় চটিয়া গেলেন। জোবানবন্দী না লইয়া তাহাদের ফেরৎ পাঠাইলেন। আবার হালকেট সাহেবকে পত্র লিখিলেন। এবার হালকেট সাহেব আপনার নাজীর, পেস্কার, সেরেস্তাদার প্রভৃতি বিস্তর আমলা পাঠাইয়া দিলেন। আপনিও একদিন নিজে আসিয়াছিলেন।

সামুয়েল সাহেব আর একখানি পত্র বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরকে[৫৬] লেখেন। তাঁহার কতদূর চেষ্টা ছিল, তাহা বুঝা যাইবে বলিয়া আমরা সেই পত্রখানি উদ্ধৃত করিলাম। রাজা বৈদ্যনাথের[৫৭] জোবানবন্দী হইয়া গেলে পর, এই পত্রখানি তাঁহাকে লেখা হয়।

"Hooghly, Sept. 24, 1838.

"My dear Dwarkanath,

I was disappointed at your non-arrival, as I think you could speak more decidedly than any of the other witnesses to the man's non-identity, but it is not of much consequence. I have no objection to make a bargain with you. I will let you off altogether, if you will procure me the names of half a dozen good respectable witnesses from Boranagore, who know him as Kristolall. I dare say you could do this through Kali Nath Roy Chowdhury, Mothooranath Mookerji or any of your own servants. Let me know what you say to this. What scoundrel that Buddinath Roy is! If I had know his character, I would rather have gone without evidence altogether than have had his.

Remember I must have the evidence from Boranagore within a week or so. Persuade Mothooranath also to come. His *hoormut* and *izzut* shall be *hureck soorut se bahal.*

Yours truly
E. A. SAMUELLS."

সামুয়েল সাহেব বিস্তর সাক্ষী জুটাইয়াছিলেন। তাহাদের জোবানবন্দী হইত, কিন্তু তিনি তাহা পড়িয়া সাক্ষীদের শুনাইতেন না। তখন সে প্রথা ছিল না। জাল রাজার উকিলেরা বলিতেন যে, "সাক্ষীরা যাহা বলিত, তাহা অবিকল লেখা হইত না।" তাঁহারা আরও বলিতেন, "কোন কোন সাক্ষীর জোবানবন্দী জাল রাজার অসাক্ষাতেও লওয়া হইত।"

হরকরা সম্পাদক হুগলিতে একজন রিপোর্টার পাঠাইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, সামুয়েল সাহেব সেই ব্যক্তির নিমিত্ত রিপোর্ট সংশোধন করিয়া হুগলি কালেজের অধ্যাপক সাদারলাণ্ড সাহেবের দ্বারা তাহা হরকরায়[৫৮] পাঠাইতেন।

জাল রাজার উকিলেরা বলিতেন, "হরকরায় যে জোবানবন্দী প্রকাশ হয়, তাহা প্রকৃত নহে, তাহা কেবল মেজেস্টার সাহেবের মন-গড়া।" ইহা লইয়া অনেক তর্ক হইয়াছিল, নিজামতে দরখাস্ত হইয়াছিল। সামুয়েল সাহেব বলেন, সাদারলাণ্ড সাহেবকে তিনি তাঁহার ইয়াদদাস্ত দিতেন মাত্র, আর কিছু নহে।*

জাল রাজার বিরুদ্ধে যাঁহাদের সাক্ষ্য দিবার সম্ভাবনা, তাঁহারাই ফরিয়াদীর সাক্ষী। সুতরাং তাঁহাদের জোবানবন্দী প্রথমে লওয়া হইতে লাগিল। তাঁহারা প্রায় অনেকেই বলিলেন, জাল রাজা প্রতাপচাঁদ নহেন। হরকরা সংবাদপত্রে এই সকল জোবানবন্দী প্রথমেই ছাপা হইতে লাগিল। হরকরা হইতে তাহা সমাচারদর্পণে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইল। সামুয়েল সাহেব সেই জোবানবন্দী সর্বত্র প্রচার করিবার নিমিত্ত সপ্তাহে সপ্তাহে কতকগুলি করিয়া সমাচারদর্পণ থানায় থানায় পাঠাইয়া দিতেন, আবার থানার দারোগারা তাহা গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু যখন দায়রায় জাল রাজার স্বাপক্ষ সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম্ভ হইল, তখন আর সমাচারদর্পণ সেরূপ থানায় থানায় পাঠান হইল না। প্রথম জোবানবন্দী পড়িয়া অনেকের ধারণা হইল যে, জাল রাজা সত্যই জাল। সুতরাং এই বিষয়ে লোকে সামুয়েল সাহেবকে দোষী করিত লাগিল। কিন্তু সামুয়েল সাহেব বলেন যে, লোকের মনে একটা অসঙ্গত ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত তিনি সমাচারদর্পণ থানায় থানায় পাঠাইয়া দিতেন। ইহা ছাড়া কোন অন্যায় অভিপ্রায়ে নহে।

* এই অপবাদের উত্তরে সামুয়েল সাহেব সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন যে, "A silly reporter was deputed by the publisher of that paper (Hurkura) to Hooghly, for the purpose of reporting the proceedings in my Court. The reports which he furnished, however, were so exceedingly incorrect that, Mr. Sutherland now Principal of the Hooghly College, who resides with me, and who had formerly been connected with the Hurkura Press, requested me to furnish him with my notes, in order that he might correct these reports before they were forwarded. To this, of course, I could have no objection, and the reports which appeared from that time, forwarded in the Hurkura, were the only reports which give a tolerable idea of the evidence, which was given in court. That there were many inacuracies even in these, is very probable, as Mr. Sutherland's leisure was not such as to enable him in most instances, to give more than a general correction. কিন্তু জাল রাজার উকিলেরা বলেন যে, "সাদারল্যাণ্ড সাহেব যে রিপোর্ট পাঠাইতেন, তাহা হরকরা আপিসে গিয়া তাহারা দেখিয়াছেন। সে রিপোর্টে যত কাটকুট বা নূতন লেখা থাকিত, তাহা সমুদয় সামুয়েল সাহেবের স্বহস্তের।"

দায়রা সোপর্দ্দ।

সামুয়েল সাহেব ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে জাল রাজার মোকদ্দমা আরম্ভ করেন। সেই দিন তিনি এজলাসে বসিয়া জাল রাজাকে বলিলেন, "তুমি আপনার নাম গোপন করিয়া অসৎ অভিপ্রায়ে মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করিয়াছ। সেই-জন্য তোমাকে আসামী করা হইয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া অনেকে অবাক্ হইলেন। হরিবোল হরি! কাল্নার জমিয়ৎবস্ত তবে কোন কাজের কথা নহে! তাহা কেবল ছল মাত্র। প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করাই তবে মূল অপরাধ। এ গুরুতর অপরাধের আবার জামিন নাই। খুনের মোকদ্দমায় ওগলবি সাহেবের জামিন লওয়া হইয়াছিল; প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করার অপরাধে জামিন লওয়া হইতে পারিল না। খুন অপেক্ষা ইহা গুরুতর অপরাধ। এ অপরাধের নিমিত্ত চারি মাস ধরিয়া হাজতে রাখা হইল।

সামুয়েল সাহেব জাল রাজার এই গুরুতর অপরাধ প্রকাশ করিলে জাল রাজার উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ফরিয়াদী?" মেজেণ্টার উত্তর করিলেন, "গবর্ণমেণ্ট ফরিয়াদী।" আবার সকলে অবাক হইল! প্রতাপের নাম ব্যবহার করায় যাহাদের ক্ষতি, তাহারা কেহ নালিস করিল না, পরাণবাবু নালিস করিলেন না, তবে গবর্ণমেণ্টের কেন এত গরজ পড়িল? কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না, সুতরাং নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল। তাহার পর সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম্ভ হইল।

চিনারি সাহেব[৫৯] দ্বারা প্রতাপচাঁদ নিজের যে প্রমাণ চিত্রপট আঁকাইয়া রাখিয়া-ছিলেন, সেখানি বর্দ্ধমানের রাজবাটী হইতে আনীত হইয়া এজলাসের পার্শ্বে এক ঘরে রাখা হইল। চিনারি সাহেব একজন প্রধান চিত্রকর ছিলেন। তিনি রাজা প্রতাপচাঁদের ছবি লিখিতেছেন, এ কথা সাহেব মহলে সকলে শুনিয়াছিলেন। অনেকে সেই ছবি দেখিতে চিনারি সাহেবের বাটী যাইতেন। ছবিখানি বাস্তবিক নির্দ্দোষ হইয়াছিল। প্রতাপচাঁদ চিনারি সাহেবকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজের দেহ যেমন লম্বা, পটের দেহ যেন ঠিক সেই পরিমাণে লম্বা হয়, দৈর্ঘের যেন কিছুমাত্র প্রভেদ না থাকে। পট ঝুলাইবার স্থানানুরোধে বা তাহার দূরতা অনুসারে চিত্রকরেরা দৈর্ঘ্যের কিছু হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া থাকে, প্রতাপ সেরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই চিত্রপট হুগলির মেজেষ্টারিতে আনীত হইলে অনেকেই বুঝিলেন, ছবিখানি এ মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী—নির্লোভী নিরপেক্ষ সাক্ষী—কথা কহে না, কাহারও মুখ চাহে না। পার্শ্বের ঘরে দাঁড়াইয়া কাহারও সহিত কথা না কহিয়া ছবি কি বলিল, জজ, মেজেষ্টার তাহা কি বুঝিলেন, সে সকল বৃত্তান্ত ক্রমে লেখা যাইতেছে।*

---

* Some curious evidence transpired concerning the "Portrait"

গবর্ণমেণ্ট আপনার চাকরদের সাক্ষী দিতে পাঠাইলেন। সেক্রেটারি প্রিন্সেপ—একজন সাক্ষী, সদর দেওয়ানীর জজ হাচিনসন—একজন সাক্ষী, বোর্ডের মেম্বর প্যাটল—একজন সাক্ষী। ঐরাবতী নামক জাহাজে করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সকল সাক্ষীদের মহাসমারোহে হুগলি পাঠাইলেন। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর আপনার জাহাজে করিয়া আর একদিন আসিলেন। এইরূপে ঘটার আর সীমা রহিল না। তিন বিষয়ের সাক্ষ্য লওয়া হইল। প্রথমতঃ জাল রাজার সোনাক্ত সম্বন্ধে; দ্বিতীয়তঃ প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে; তৃতীয়তঃ, জাল রাজা গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল কি না এই সম্বন্ধে। কেবল এই তিন বিষয়ের প্রমাণ লইয়া সামুয়েল সাহেব জাল রাজাকে দায়রা সোপর্দ্দ করিলেন। কিন্তু সোপর্দ্দের সময় একটি চার্জ বাড়াইয়া দিলেন—কালনায় জমিয়ৎবস্ত। এ বিষয়ে কোন সাক্ষীর জোবানবন্দী লওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহার চার্জ হইল।

সামুয়েল সাহেব বর্দ্ধমান হইতে প্রায় সকল আসামীকে আনাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেবল সাত জনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন।

প্রথম, জাল রাজা। দ্বিতীয়, মোক্তার রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল, (যিনি বর্দ্ধমানে মেজেষ্টারের গেটের নিকট গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন)। তৃতীয়, হাফেজ ফতে উল্লা। চতুর্থ, সাগরচন্দ্র ধর। পঞ্চম, কালীপ্রসাদ সিংহ। ষষ্ঠ, জুমন খাঁ। সপ্তম, রাজা নরহরিচন্দ্র।

১১

দায়রার কার্য্যপ্রণালী।

২০শে নবেম্বর এই মোকদ্দমার দিন ধার্য্য ছিল, এবং সাক্ষীদিগকে সেই দিনে উপস্থিত হইতে আদেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু কি গতিকে বলা যায় না, তাহার পূর্ব্বদিনে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। সাক্ষীরা আইসে নাই, কিন্তু অপর কার্য্য হইল। জজ সাহেবের নাম কার্টিস।

গবর্ণমেণ্ট, প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে, বিগনেল নামে একজনকে পাঁচ শত টাকা বেতনে ডিপুটি, লিগ্যাল রিমেম্বনসার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিগনেল সাহেব বড় বুদ্ধিমান, হ্যালিডে সাহেবের বিশেষ অনুগৃহীত। তাঁহাকে এই মোকদ্দমায় দায়রায় গবর্ণমেণ্ট পক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করা হইল। বলা বাহুল্য যে, হ্যালিডে সাহেবই

---

that novel mute witness. * * The prosecution certainly seem to have unwittingly subpeonaed, in this portrait, a rather ***hostile witness,*** * * Long odds in favour of the Rajah and no takers. Prawn Babu is quite a *dark* horse, however; and may prove a winner."—*Hurkura 5th September 1838.*

তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি এই ১৯শে তারিখে আসিয়া উপস্থিত হন। সুতরাং এই ১৯শে তারিখে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল, আর ধার্য্যদিনের নিমিত্ত অপেক্ষা করা হইল না।

কৌন্সিলি মর্টন সাহেব জাল রাজার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য সেই দিন পত্রের দ্বারা জজ সাহেবের অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। জজ সাহেব সে পত্র পাইয়া ফরিয়াদীর উকিল বিগনেল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন —অনুমতি দেওয়া যাইবে কি? বিগনেল উত্তর করিলেন যে, এ বিষয়ে কোন আপত্তি করিতে গবর্ণমেন্ট নিষেধ করিয়াছেন। জজ সাহেব তখন মর্টন সাহেবকে অনুমতি পাঠাইলেন। উত্তর পাইয়া মর্টন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আসামীর কৌন্সলি আসিয়া জজ সাহেবকে জানাইলেন যে, "আসামী শারীরিক কিছু অসুস্থ আছেন, অতএব তাঁহাকে বসিবার আসন দিতে অনুমতি করিলে ভাল হয়।" জজ সাহেব কেদারা দিতে হুকুম দিলেন। মোকদ্দমা আরম্ভ হইল।

ফৌজদারি হইতে এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত যে রোবকারী আসিয়াছিল, তাহা মনসারাম দেওয়ানজী[৬০] ১১টার সময় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দেড়টার সময় তাহা পড়া শেষ হইল। তাহার পর, সাক্ষীর জোবানবন্দী যাহা মেজেষ্টার পাঠাইয়াছেন, তাহাও দেওয়ানজী মহাশয় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। জজ সাহেব বলিলেন, "এখানে জোবানবন্দী লওয়া হইবে, সুতরাং সাবেক জোবানবন্দী আর পড়া অনাবশ্যক।" বিগনল সাহেবও জজ সাহেবের কথায় সম্মতি দিলেন। দেওয়ানজী শ্রীযুক্ত মনসারাম মিত্র মহাশয় বলিলেন, "তাহা হইতে পারে না; এ সমুদয় পাঠ করা আবশ্যক। ফৌজদারির সমুদয় কাগজপত্র না পড়িলে আসামীদের ফেরেবি[৬১] কিরূপে বুঝা যাইবে।" জজ আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না। দেওয়ানজির যাহা ইচ্ছা, তাহা সমুদয় পড়িয়া শুনাইলেন।

তাহার পর চার্জ পড়া হইল। (১) আলোক শা ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী, মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের নাম ব্যবহার করিয়াছে। (২) সেই নাম ব্যবহার করিয়া ত্রেজরির[৬২] দেওয়ান্ রাধাকৃষ্ণ বসাককে ঠকাইয়া তাহার নিকট টাকা লইয়াছে। (৩) বেআইনিরূপে কালনায় বিস্তর লোক জমিয়ৎবস্ত করিয়াছে।

আসামী নিরপরাধী বলিয়া জবাব দিল। সে দিবস আর কোন কার্য্য হইল না। এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, জাল রাজা একখানি লিখিত জবাব দিয়াছিলেন। দুই দিন পরে (২১শে নবেম্বর) সেই সম্বন্ধে কথা উঠিল। জজ সাহেব বলিলেন, "আমার বোধ হয়, জাল রাজার একটা আপত্তি সঙ্গত। এই মোকদ্দমা দেওয়ানির বিচার্য্য, ফৌজদারির নহে। অন্ততঃ জুরি কিম্বা আর একজন জজের সঙ্গে বসিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি কি করিব? আমার আপত্তি আমি গবর্ণমেণ্টে জানাইয়াছিলাম, গবর্ণমেন্ট তাহা শুনেন নাই। সুতরাং আমার উপর যেরূপ হুকুম, আমি তাহাই করিতে বাধ্য।"

আর এক কথা। ডাক্তার হ্যালিডে বর্ত্তমানে রাজবাটীর চিকিৎসক ছিলেন। তিনি অনেকবার প্রতাপচাঁদের চিকিৎসা করিয়াছিলেন—একবার তাঁহার উরুস্তম্ভ অস্ত্র করিয়াছিলেন। সুতরাং ডাক্তার হ্যালিডে আসামীর একজন প্রধান সাক্ষী। বিশেষতঃ বোর্ডের মেম্বার ট্রেয়ার সাহেব মেজেষ্টারিতে জোবানবন্দী দিয়াছেন যে, সেই ডাক্তার হ্যালিডে তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন, "আসামী সত্যই প্রতাপচাঁদ।" অতএব তাঁহাকে হাজির করিবার নিমিত্ত আসামী সপিনা জারি করাইল। ডাক্তার সাহেব তখন কাশীতে থাকেন, তাঁহার আসিতে বিস্তর ব্যয় এবং বেতন-ক্ষতি, সুতরাং তিনি লিখিলেন যে, আমার খরচ অগ্রিম পাঠাইলে আমি যাইতে প্রস্তুত আছি। জাল রাজার তখন এক পয়সার সঙ্গতি নাই, কেহ আর তাঁহাকে কর্জ্জ দেয় না। তিনি টাকা পাঠাইতে না পারিয়া জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলেন যে, "ফৌজদারী আদালতের সাক্ষী অন্য মোকদ্দমায় যেমন বিনা খরচে হাজির করা হইয়া থাকে, তেমন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সাক্ষীদের এ মোকদ্দমায় হাজির করা হইতেছে, আমার পক্ষে এই সাক্ষীকে সেইরূপে হাজির করা হউক।" ডাক্তার হ্যালিডে গবর্ণমেণ্টের চাকর, গবর্ণমেণ্ট হুকুম দিলেই তিনি আসিতে বাধ্য হইবেন। জজ সাহেব সে দরখাস্ত গবর্ণমেণ্টে পাঠাইলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে মনোযোগী হইলেন না। নিজামতে দরখাস্ত করা হইল, সেখানকার জজেরাও তাহা শুনিলেন না। জাল রাজা তখন নিরুপায় হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, "আমার নৌকায় যে সকল দ্রব্যাদি ছিল তাহা রাজকর্ম্মচারীরা কোম্পানীতে অবশ্য দাখিল করিয়া থাকিবেন। সেই সকল দ্রব্যাদির কিয়দংশ নীলাম করিয়া হ্যালিডে সাহেবকে পথ খরচ পাঠান হউক।" এ প্রার্থনাতেও কেহ উত্তর দিলেন না। শেষ কমিসন দ্বারা ডাক্তার সাহেবের জোবানবন্দী লইবার প্রার্থনা করা হইল। কিন্তু জজ সাহেব বলিলেন, "কমিসন বাঙ্গালী সাক্ষীর নিমিত্ত, ইংরেজের নিমিত্ত নহে।'

কোম্পানির পক্ষ সাক্ষীদের উপস্থিত করিবার জন্য সপিনায় লেখা থাকিত, "র্যাদ ধার্য্য দিনে কোন সাক্ষী উপস্থিত না হয়, তাহার এত টাকা দণ্ড হইবে"। কিন্তু জাল রাজার সাক্ষীদের হাজির করিবার জন্য এরূপ দণ্ডের কোন কথা থাকিত না, কেহ অনুপস্থিত হইলে তাহাকে হাজির করিবার নিমিত্ত কোন উপায় করা হইত না। যাঁহারা আপনা হইতে উপস্থিত হইতেন, বরং জজ সাহেব তাঁহাদের কটূক্তি করিতেন। বিষ্ণুপুরের রাজা সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত আপনি আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে "গাধা' বলিয়া গালি দেওয়া হইয়াছিল। তেলিনীপাড়ার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের[৬৩] নাম সাক্ষীর তালিকার ছিল। তিনি নিত্য হুগলিতে গাড়ি করিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু সাক্ষ্য দিতেন না। জাল রাজার উকিল তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন, "যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে সাক্ষ্য দিতে আমার সাহস হয় না। আমি এই জেলায় বাস করি, আমার জমীদারি, বিষয়-আশয় সমুদয় এই জেলায়, শেষে কি বিপদে পড়িব?" এইরূপ অনেকে ভয় পাইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত হইলেন না।

২০শে নবেম্বর হইতে সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম্ভ হইল। ফরিয়াদীর পক্ষে যে সকল সাক্ষীর জোবানবন্দী মেজেণ্টারীতে লওয়া হইয়াছিল, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া লিখিলাম। দায়রায় কেহ কিছু অতিরিক্ত বলিয়া থাকিলে তাহাও উল্লেখ করিলাম। আসামীর সাক্ষী যে জোবানবন্দী নিম্নে দেওয়া হইল, তাহা দায়রায় লওয়া হইয়াছিল। মেজেষ্টারীতে বিচার হয় নাই, সুতরাং আসামীর পক্ষে কোন প্রমাণ তথায় লওয়া হয় নাই।

১২

সোনাক্ত সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সাক্ষী।

ট্রাওয়ার সাহেব (C. T. Trower) বলিলেন, "আমি ১৮০৮ সাল হইতে ১৮১৭ সাল পর্য্যন্ত বৰ্দ্ধমানের কালেক্টর ছিলাম। প্রতাপকে বিলক্ষণ চিনিতাম। অপর ঘরে যে ছবি আছে, তাহা দেখিবামাত্র প্রতাপকে মনে পড়ে। কিন্তু এই আসামীকে দেখিলে প্রতাপকে মনে পড়ে না। যতদূর আমার স্মরণ হয়, তাহাতে এ ব্যক্তিকে কোন মতেই প্রতাপ বলিয়া বিশ্বাস হয় না। প্রতাপের চক্ষু কটা ছিল, এ ব্যক্তির চক্ষু কাল। ডাক্তার হ্যালিডে প্রতাপের চিকিৎসা করিতেন। একবার প্রতাপের উরুস্তম্ভ হয়, হ্যালিডে তাহা অস্ত্র করেন। কিন্তু সেই হ্যালিডে আমায় বলিয়াছিলেন যে, 'এই আসামী সত্যই প্রতাপচাঁদ'। হ্যালিডে এখন কাশীতে আছেন"। দায়রায় বলিলেন যে, "আসামী কোনক্রমেই রাজা প্রতাপচাঁদ নহে।"

প্রিন্সেপ সাহেব (H. T. Princep, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি) বলিলেন, "আমি প্রতাপকে চিনিতাম, ১৯ বৎসর কি ২০ বৎসর যাহাকে দেখি নাই, তাহার আকৃতি যেরূপ স্মরণ থাকে, প্রতাপের আকৃতিও আমার সেইরূপ স্মরণ আছে। আসামীকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া বোধ হয় না (I should say that he was not Protap Chunder)। প্রতাপ বেঁটে ছিলেন, এ লোকটা লম্বা। অপর ঘরে যে ছবি দেখিয়াছি, তাহা প্রতাপের। সে ছবির সঙ্গে এই ব্যক্তির কোন সাদৃশ্য নাই।" প্রতাপের নাক চোক কিরূপ ছিল, তাহা আমার স্মরণ নাই। দায়রায় বলেন যে, জেনারেল আলার্ড ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া আসিলে পর, আমায় একদিন বলিয়াছিলেন, লাহোরের নিকট আসামীর সঙ্গে অনেক দিন হইল, তাঁহার একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আসামী তখন ফকিরের বেশে বেড়াইতেন।"

প্যাটল সাহেব (James Pattle, বোর্ডের মেম্বর) বলিলেন, "১৮১৩ সালে আমি কলিকাতায় যাই। প্রতাপ আমার সহিত দেখা করিতে সেখানে যাইতেন, কিন্তু কয়বার গিয়াছিলেন, স্মরণ নাই। যে ছবি দেখিলাম, তাহা যদি প্রতাপের হয়, তবে প্রতাপের আকৃতি আমার আর কিছু মাত্র স্মরণ নাই। ঐ ছবির সঙ্গে আসামীর কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাইলাম না।"

হাচিনসন্ সাহেব (Mr. Hutchinson) বলিলেন, "আমি সদর দেওয়ানী

আদালতের জজ। পূর্বে বর্ধমানের এক্টীং জজ ছিলাম। আসামীকে আমি চিনি না। এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ নহে। এ ব্যক্তি অনেক লম্বা ও স্থূলকায়। ইহার সঙ্গে প্রতাপের ছবির সাদৃশ্য নাই। তবে বুক হইতে উপর দিকে কতক মেলে। প্রতাপের মৃত্যুর পূর্বে ডাক্তার কোল্টারের নিকট শুনিয়াছিলাম, প্রতাপের জ্বর হইয়াছিল। দায়রায় এই সাক্ষীর জোবানবন্দী লওয়া হয় নাই, কারণ তখন তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছিল।"

বিচর সাহেব (John Beecher) বলিলেন, "আমি একজন হাউসওয়ালা। আমি প্রতাপকে চিনিতাম। তাঁহার আকৃতি আমার কিছু স্মরণ নাই। ছবি দেখিয়াও তাঁহার আকৃতি আমার স্মরণ হইল না। তবে এই ছবির সঙ্গে আসামীর সাদৃশ্য বিলক্ষণ আছে। মাপিয়া দেখিলাম, ছবির প্রতাপ আর আসামী প্রতাপ একই রূপ লম্বা। দায়রায় এই সাক্ষীকে আর আহ্বান করা হয় নাই।"

ওবারবেক সাহেব (D. A. Overbeck) বলিলেন, "আমি এক্ষণে চুঁচুড়ায় থাকি। দিনামারের আমলে আমি চুঁচুড়ার গবর্ণর ছিলাম। আমি এই আসামীকে চিনি না।" তাহার পর, অপর ঘরে প্রতাপের ছবি দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, "এখন আমি আসামীকে চিনিলাম, ইনি আমার পূর্বপরিচিত ছোট রাজা। ছবির আকৃতি আর আসামীর আকৃতি স্পষ্ট একই রূপ।" দায়রায় এই সাক্ষী বলিলেন যে, "পূর্বে জেলখানায় ও মেজেণ্টারিতে আমি এই আসামীকে দেখিয়াছি, আমি তখন ইহাকে জুয়াচোর মনে করিয়াছিলাম, আমি প্রতাপকে বিশেষ জানিতাম। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পরে আমি শুনিয়াছিলাম যে, তিনি পলাইয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ চক্ষের বাম-ভাগে মেহগেনি রঙ্গের একটি ক্ষুদ্র দাগ ছিল, তিনি ঊর্ধ্বে চাহিলে সেটি দেখা যাইত, এই আসামীর ঠিক সেইখানে সেই দাগ আছে, তবে একটু যেন বর্ণের ঘোর কমিয়াছে। এরূপ দাগ কাহার চক্ষে আর কখন দেখি নাই। শুনিয়াছি, একবার গবর্ণর জেনারেলের একজন এজেণ্ট গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছিলেন যে, রাজা প্রতাপচাঁদ সেই রেসিডেন্সিতে বাস করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট সে বিষয় রাজা তেজচন্দ্রকে লেখায় তিনি উত্তর করেন, 'আমি প্রতাপকে মরিতে দেখি নাই।' এই চিঠির কথা প্রকৃত কি না তাহা গবর্ণমেণ্টের কাগজ খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে।"

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বলিলেন, "প্রতাপচাঁদের সঙ্গে আমার বড় বন্ধুতা ছিল, তিনি ওয়াটলুর যুদ্ধের[৬৪] পর, একবার কলিকাতায় রোসনাই দেখিতে আসিয়া আমার বাটীর নিকট কান্তবাবুর বাটীতে ছিলেন। সেই সময় আমার সঙ্গে তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। তিনি গবর্ণমেণ্ট হাউসের রোসনাই দেখিতে যান, আমি তাঁহার সঙ্গে যাই। প্রতাপ কখনো কলিকাতার তাঁতি কি বেনের বাড়ী যান নাই। তিনি কেবল আপনার সমযোগ্য লোকের বাড়ী যাইতেন—রাজা গোপীমোহন আর আমার বন্ধু রামমোহন রায়ের বাটী যাইতেন। আমি এই আসামীকে চিনি না, এ ব্যক্তি নিশ্চয় প্রতাপ নহে। ওগলবির মোকদ্দমায় যখন এ আসামী সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষী দিয়াছিল,

তখন আমি ইহাকে দেখিয়াছিলাম। ঐ সময় আমাকে এ ব্যক্তি চিনিয়াছিল, কিন্তু এ ব্যক্তি আমাকে চিনিলে কি হইবে, আমি ত উহাকে চিনি নাই। ওয়াটলু লড়াইয়ের সময় হইতে আমার চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। তাহার পূর্ব্বে যে আমায় দেখিয়াছে, সেই আমার চিনিতে পারে। মেজেষ্টার সাহেব আমায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার নকল কে চুরি করিয়া আনিয়াছে, আমি সে চোর ধরিতে চেষ্টা করিতেছি।" চিঠি সম্বন্ধে কথাগুলি সাক্ষী বিনা সওয়ালে বলিলেন। দায়রায় আসিয়া বলিলেন, "প্রতাপের যে ছবি এই আদালতে দেখিলাম, তাহার সঙ্গে এই আসামীর বিলক্ষণ মিল আছে। আমি ঠিক বলিতে পারি না যে, এ আসামী প্রতাপচাঁদ কি না, তবে আমার বোধ হয় ইনি প্রতাপচাঁদ নহেন।"

রাজা বৈদ্যনাথ রায় বলিলেন, "প্রতাপের সঙ্গে আমার দুইবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল— একবার গবর্ণর জেনারেলের দরবারে—আর একবার একটা বিবাহ বাটীতে।[৬৫] সেখানে প্রতাপ ছদ্মবেশে গিয়াছিলেন। এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ নহে। আমি কাহারও নিকট বলি নাই যে, ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ। রাজা বৈদ্যনাথ আদালতের বাহিরে আসিলে লোকে তাঁহার গাত্রে ধূলা দিয়াছিল। এ সাক্ষীকে আর দায়রায় তলব হয় নাই, বরং তাঁহাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার নিমিত্ত দণ্ড দিবার পরামর্শ হইয়াছিল।

হারক্লটস সাহেব (Gregory Herclots) বলিলেন, "আমি হুগলীর সদর আমিন ছিলাম। দুই তিনবার প্রতাপকে দেখিয়াছি, এখন দেখিলে বোধ হয়, তাঁহাকে চিনিতে পারি। এই আসামী প্রতাপ নহে। কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া তাহা বলিতে পারি না।" দায়রায় বলিলেন, "এই আসামীকে মৃত প্রতাপচাঁদ অপেক্ষা এক ইঞ্চি লম্বা দেখায়।"

রাধাকৃষ্ণ বসাক বলিলেন, আমি এই আসামীকে অনেক টাকা কর্জ্জ দিয়াছি। কত তাহা হিসাবনিকাশ না করিয়া বলিতে পারি না। ষোল হাজার হইবে। ইহাকে সত্যই প্রতাপচাঁদ মনে করিয়া আমি টাকা দিয়াছি। ইহাকে আমি নিজে চিনিতাম না; কেবল লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া টাকা দিয়াছি। রাজা গোপীমোহন দেব বলিয়াছেন, 'ইনি নিশ্চয় প্রতাপচাঁদ।' গোপীমোহন এখন মরিয়াছেন। গোপীমোহন তাঁহার লোকের দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলেন যে, 'এ ব্যক্তি সত্যই প্রতাপচাঁদ।' ডাক্তার হ্যালিডে আমার নিকট বলিয়াছেন, 'এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ।' তদ্ভিন্ন জেনারেল এলার্ড* আমায় বলিয়াছেন, তাঁহার কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তাঁহার সঙ্গে এলাহাবাদে এই আসামীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি একা ইহাকে টাকা কর্জ্জ দিই নাই আরও অনেকে দিয়াছেন, দুই একজন ইংরেজও দিয়াছেন।" দায়রায় উপস্থিত হইয়া এই সাক্ষী বলিলেন, যে "রাজা বৈদ্যনাথের সঙ্গে এই আসামীকে হুগলীর জেলে দেখিতে আসিয়াছিলাম। আমি ছয় মাস ইহাকে কলিকাতায় আমার আপনার বাটীতে রাখিয়াছিলাম। সেখানে ডাক্তার হ্যালিডে একদিন আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, যে "ইনি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ, তাহার কোন সন্দেহ নাই।"

---

* জেনারেল এলার্ড মহারাজা রঞ্জিত সিংহের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন।

রাধামোহন সরকার (যাঁহার সঙ্গে পরাণবাবু এক দল লাঠিয়াল কালনায় পাঠাইয়াছিলেন), গঙ্গাজল হাতে করিয়া বলিলেন যে "প্রতাপচাঁদের সঙ্গে এই আসামীর বিস্তর প্রভেদ। প্রতাপচাঁদ দেখিতে বিক্রমাদিত্যের মত ছিলেন, আর এ লোকটা দেখিতে যেন ভিকে হাড়ি। এ লোকটার হাত পা বড়, শরীর লম্বা, বর্ণ কাল, ছবির সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। আমি এখন রাজবাটীর দেবোত্তর মহলের মোক্তার। আগা আব্বাস নামে কোন মোগল কস্মিন্‌কালে প্রতাপচাঁদের চাকর ছিল না।"

বসন্তলালবাবু বলিলেন, "আসামীকে আমি চিনি না। ইহাকে একবার বাঁকুড়ার মেজেষ্টারিতে দেখিয়াছিলাম, তখন ইহার দাড়ি ছিল। অনেকে বলেন যে, যখন জাল রাজার দাড়ি ছিল তখন তাঁহার সহিত চিত্রপটের সাদৃশ্য হঠাৎ অনুভব হইত না, তাহাই রাজবাটী হইতে চিত্রপট আনীত হইয়াছিল। ধূর্ত্ত জাল রাজা তখন সময়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন। চিত্রপটখানি আদালতে আনীত হইল পর, তিনি দাড়ি ফেলিলেন। তখন সকলেই দেখিল চিত্রপটের সহিত তাঁহার মুখের সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট।

এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ নহে। আমি এক্ষণে রাজবাটীর খাস দপ্তরে কর্ম্ম করি। পরাণবাবুর পুত্র তারাচাঁদ আমার নাতিনীকে বিবাহ করিয়াছেন।" দায়রায় বলিলেন, "আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ অপেক্ষা লম্বা, বয়স অল্প। বাঙ্গালা ১১৯৭ সালের কার্ত্তিক মাসে প্রতাপ জন্মগ্রহণ করেন।"

মোহনলালবাবু বলিলেন, আমি রাজবাটীর হাতীশালার দারোগা। এই আসামী প্রতাপচাঁদ নহে।" দায়রায় বলিলেন, "রাজা প্রতাপের সঙ্গে আসামীর বয়সে, বর্ণে, দৈর্ঘ্যে, আকৃতিতে, গঠনে, কি কোন বিষয়ে সাদৃশ্য নাই।"

ভৈরবনাথবাবু বলিলেন, "আমি প্রতাপচাঁদকে দুই তিনবার দেখিয়াছি, এ আসামী প্রতাপচাঁদ নহে। আমি রাজবাটী হইতে তঙ্কা পাই।" দায়রায় বলিলেন, "আমি পরাণবাবুর ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছি, পরাণবাবুও আমার ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছেন।"

নন্দলালবাবু বলিলেন, "আসামী প্রতাপচাঁদ নহে। আমি রাজসরকারে কর্ম্ম করি।" দায়রায় বলিলেন, "পরাণবাবু আমার কুটুম্ব।"

এইরূপে আর কয়েকজন জোবানবন্দী দিলেন, তাঁহারা রাজবাটীর সাক্ষী, পরাণবাবুর চাকর।

১৩

সোনাক্ত সম্বন্ধে আসামীর সাক্ষী

ডাক্তার স্কট সাহেব [*Robert Scott, 37th Madras Native Infantry*] বলিলেন, "আমি ১৮১৫ সাল হইতে ১৮১৭ সাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলাম, আমি রাজা

প্রতাপচাঁদকে ভাল চিনিতাম, তাঁহার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। এই আসামী সেই প্রতাপচাঁদ। জেলখানায় গিয়া ইহার সর্বাঙ্গের চিহ্ন বিলক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, সকল চিহ্ন মিলিয়াছে। ১৮১৭ সালে ইহার গালের ভিতর একখানি ঘা হইয়া শোষ হয়, আমি তাহা ভাল করি। সে ঘায়ের দাগ অদ্যাবধি রহিয়াছে। অন্য লোকে মুখে ঘায়ের দাগ করিতে পারে সত্য, কিন্তু ঠিক সেই স্থানে সেইরূপ দাগ করিতে কেহই পারে না। প্রতাপচাঁদ শীতকালেও ঘামিতেন, আসামীও সেইরূপ ঘামে। আর প্রতাপের মত ইহার হাসি, কথা কহিবার পূর্বে প্রতাপের মত কণ্ঠ পরিষ্কার করা ইহার অভ্যাস। প্রতাপের মত ইহার বসিবার ভঙ্গি। প্রতাপ আমার সঙ্গে ইংরাজিতে কথা কহিতেন, কিন্তু আসামী তেমন কহিতে পারিল না দেখিয়া আমি হেতু জিজ্ঞাসা করায় বলিল, আর অভ্যাস নাই। তাহা হইতে পারে। আমি পূর্বে বিলক্ষণ হিন্দী বলিতে পারিতাম, কিন্তু দুই বৎসর বিলাতে থাকিয়া আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কেবল শুনিয়া কোন ভাষা শিখিলে এরূপ হয়। পূর্বের কথা দুই একটা আসামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু তখনকার জজ মার্টিন সাহেবের নাম ব্যতীত আর কোন সাহেবের নাম বলিতে পারিল না। আমি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমি কি করিয়া বেড়াইতাম? আসামী বলিল একটী পিস্তল লইয়া পথে পথে কুক্কুর মারিয়া বেড়াইতে। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সময় দেওয়ানী জেলে কি একটা গোলমাল হইয়াছিল? আসামী উত্তর করিল, বুলার সাহেব রঘুবাবুকে জেলে পাঠাইয়াছিলেন। রঘুবাবু বিষ খাইয়া মরিয়াছিলেন। তুমি তাহার দেহ চিরে বিষের কথা বলিয়াছিলে। এ সকল কথাই সত্য। প্রতাপ মেদেরা মদ খাইতেন। আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করায় আসামী বলিলেন আমি আর মদ খাই না, তবে ব্রাণ্ডি এখনও ভালবাসি। আমি যখন বর্দ্ধমানে ছিলাম, তখন সেখানে ট্রাওয়ার (Trower) সাহেব থাকিতেন, আমি তাঁহার পুত্রদের চিকিৎসা করিতাম। সে দিন আমি তাঁহার আপিসে গিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না; তাঁহার স্মরণশক্তি অতি সামান্য।

রিডলি (John Ridley) বলিলেন, আমি প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম। আমি ১৮১৫ সাল হইতে ১৮১৭ সাল পর্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলাম। এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদের মত। আমি ইহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইনি সে সকল কথার যথার্থ উত্তর দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনার নিকট কখন কিছু আমি বিক্রয় করিয়াছিলাম কি না? আসামী বলিলেন যে, একবার একটি সোণার ঘড়ি বিক্রয় করিয়াছিলে। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রাজবাটীর সিপাহীদের সঙ্গে প্রোবিনসাল্ সিপাহীদের যে বিবাদ হয়, তাহা কিরূপে মিটিয়াছিল? তাহাতে আসামী বলেন, রেবিনিউ বোর্ড হুকুম দেন যে, রাজবাটীর সিপাহীরা সবুজ পোষাক পরিবে, তাহাতেই সে বিবাদ ভঞ্জন হয়। এ সকল প্রকৃত কথা।

বিবি হেরিয়াট কিটিং বলিলেন, "আমি প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম, আসামী সেই প্রতাপচাঁদ। নিশ্চয়ই আমার বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন আমি ইহাকে অনেকবার আমার পিতার বাটীতে ও অন্যত্র দেখিয়াছি।"

বিবি সফিয়া ক্রেন বলিলেন, "আমি প্রতাপচাঁদকে ভালরূপে জানিতাম, আসামী নিশ্চয় প্রতাপচাঁদ।"

জন মার্শাল বলিলেন, "আমি ৭১নং সিপাহী পল্টনের ব্রিগেডিয়ার মেজর। আসামী প্রতাপচাঁদ কি না, তাহা আমি জানি না। তবে ২০ বৎসর, কি ততোধিক হইল, ইহার সঙ্গে ওবারবেক সাহেবের বাটীতে ও অন্যত্র আমার সর্ব্বদা সাক্ষাৎ ছিল। ইহাকে আমরা ছোট রাজা বলিতাম। ইহার অন্য কোন নাম যদি তখন শুনিয়া থাকি, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। কতবার ইহাকে দেখিয়াছি, তাহা আমার মনে নাই। বোধ হয় ১৮২০ সালের পর, আর আমি ইহাকে দেখি নাই। তাহার পর ওগলবির মোকদ্দমার সময় সুপ্রিম কোর্টে ইহাকে সাক্ষী দিতে দেখিয়াই আমার তখন স্মরণ হইল যে, এ ব্যক্তি আমার আলাপী, কোথায় যেন ইহাকে দেখিয়াছি। স্মরণ করিবার নিমিত্ত ইহার মুখের ছবি আমি আমার প্যানটুলেনে আঁকিয়া লইলাম। সেই ছবি ইংলিসম্যান কাগজে প্রকাশ হয়। তখন আমার বোধ হইয়াছিল, এ ব্যক্তি জুয়াচোর। ইহাকে আমি পশ্চিমে কোথায় দেখিয়া থাকিব। তাহার পর গতকল্য ওবারবেক সাহেবের বাটীতে আহার করিতে করিতে এই ব্যক্তির কথা উপস্থিত হয়। তিনি ছোট রাজার সংক্রান্ত দুই একটি ঘটনা বলিলেন আমার তখন সকল স্মরণ হইল—ছোট রাজাকে মনে পড়িল। আসামী বর্দ্ধমানের রাজা বলিয়া পরিচয় দিতেছে, আমি তাহা জানিতাম, কিন্তু চুঁচুড়ায় যাঁহাকে আমরা ছোট রাজা বলিতাম, তিনিই যে বর্দ্ধমানের রাজা তাহা আমি জানিতাম না।"

ফ্রানস্থ্য়া সুলিমান, (সাং চন্দননগর, জাতি ফরাসিস্) বলিলেন, "আমি প্রতাপচাঁদকে চিনি, আমি সর্ব্বদাই চুঁচুড়ায় যাইতাম, সেখানে প্রতাপচাঁদকে দেখিয়াছি। একবার নীলকুঠি ক্রয় করিবার নিমিত্ত। তাঁহার নিকট আট দশ বার যাতায়াত করিয়াছিলাম। এই আসামী সেই প্রতাপচাঁদ। অদ্য আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমাকে ইনি চিনিতে পারিলেন এবং নীলকুঠি বিক্রয় সম্বন্ধে কথা বলিলেন।"

হাজি আবু তালেব, চুঁচুড়ার একজন মোগল, সওয়াল মতে বলিলেন, আমি প্রতাপ-চাঁদকে ভালরূপে চিনিতাম। আসগর আলি নামে একজন হাকিম তাঁহার বাটীতে থাকিত, আমি রাজবাটীতে গিয়া সেই আসগর আলির নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র শিখিতাম। সুতরাং প্রতাপচাঁদকে বিলক্ষণ চিনিতাম। কিছুকাল পরে আমি লক্ষ্মৌ গিয়াছিলাম, তথা হইতে আসিয়া শুনিলাম, রাজা মরিয়াছেন, কিন্তু আসগর আলি এবং অন্যান্য লোক আমায় বলেন যে, রাজা মরেন নাই, পলাইয়াছেন। এই আসামী সেই রাজা। আমি পূর্ব্বে রাজার চক্ষে যে দাগ দেখিয়াছিলাম, আসামীর চক্ষে সেই দাগ দেখিয়াছি।"

ডাক্তার জুলিয়ান নইটার্ড, সাং ফরাসডাঙ্গা,[৬৬] ফরাসি ভাষায় জোবানবন্দী

দিলেন ঃ—"আমার বয়স ৭৯ বৎসর। আমি এখনও ভাল দেখিতে পাই। এই আসামীকে চিনি, ইনি বর্দ্ধমানের রাজা, ইহার নাম স্মরণ নাই, ইঁহাকে আমরা ছোট রাজা বলিতাম। আমি সেদিন জেলখানায় ইঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম আসামী আমাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিলেন।"

ফ্রেডারিক থিয়ার্শ বলিলেন, আমি ফরাসডাঙ্গার মেজেস্টার, আমি নিজে আসামীকে চিনি না। সেদিন আমি ডাক্তার নইটার্ড সাহেবের সঙ্গে জেলখানায় গিয়াছিলাম। ডাক্তারকে আসামী দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল। আমি জেনারেল এলার্ডকে চিনি, তিনি এখন লাহোরে আছেন। তিনি একদিন জেলখানায় আসামীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। জেলখানা হইতে ফিরিয়া গেলে তাঁহার সহিত এই আসামী সংক্রান্ত আমার কথাবার্তা হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছেন যে, এই আসামীকে তিনি লাহোরে অনেকবার দেখিয়াছিলেন। জেনারেল এলার্ড বোধ হয়, ১৮৩৫ সালে বিলাত যান, ১৮৩৭ সালে প্রত্যাগমন করেন। তাহার পর আমার সহিত কথা হয়। এই জোবানবন্দীর পর অথচ মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্ব্বে জেনারেল এলার্ডের মৃত্যু হয়।

গোলকচন্দ্র ঘোষ, সাং সালিখা,[৬৭] বলিলেন, "আমি কিছু দিনের নিমিত্ত ছোট রাজাকে ইংরাজী পড়াইয়াছিলাম। তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি, তাঁহাকে আমি চিনি, এই আসামী ছোট মহারাজা। ছোট রাজা মরিয়াছেন এ কথা শুনিয়াছিলাম। আবার একমাস পরে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি পলাইয়াছেন।"

গোপীমোহন পরামাণিক বলিল, "আমি জাতিতে ময়রা, আমার বয়স ৮৬ বৎসর, গোলাপবাগের গেটের কাছে আমার দোকান আছে। এই আসামীদের মধ্যে আমি কেবল মহারাজা প্রতাপচাঁদ বাহাদুরকে চিনি। যখন ইনি বর্দ্ধমানে প্রথম ফিরিয়া আসিলেন, তখন আমি ইহাকে গোলাপবাগে দেখিয়াছিলাম। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, ছোট মহারাজা মরেন নাই, মৃত্যুর ভান করিয়া পলাইয়াছিলেন, তীর্থযাত্রায় গিয়াছিলেন।

রামধন বাগ্দী বলিল, "আমি পলতার ঘাটমাঝি। এই আসামী মহারাজাকে চিনি ষোল সতর বৎসর ধরিয়া আমি তেলিনীপাড়ার রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাউলের মাঝি ছিলাম। ভদ্রেশ্বরে রামধন বাবুর একখানি বাগান ও বৈঠকখানা ছিল। সেইখানে মহারাজা মধ্যে মধ্যে যাইতেন, একরাত কি একদিন সেখানে থাকিতেন ইহা আমি দেখিয়াছি।"

আমীরউদ্দিন আমেদ বলিলেন," আমার নিবাস চুঁচুড়া। আমি প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম : আমি চুঁচুড়ার রাজবাটীতে মুন্সি কালাম উদ্দিনের নিকট প্রায় দশ বৎসর অধ্যয়ন করি। তাহার পর ইসাবেল[৬৮] নামে মৃত বুড়া রাজার ফরাসিস বিবি আপন পুত্রদের শিক্ষার নিমিত্ত আমাকে রাজবাটীতে রাখেন। প্রতাপচাঁদ চুঁচুড়ায় আসিলেই আমি দেখিতে পাইতাম। এই আসামী সেই প্রতাপচাঁদ।"

আগা আব্বাস, যে ব্যক্তি প্রতাপের ছায়ারূপ সঙ্গে থাকিত, সেই ব্যক্তি বলিল, "এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ। সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।"

ডেবিড হেয়ার সাহেব (*David Hare*) বলিলেন, "আমি রাজা প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম। তিনি যখন কলিকাতায় ছিলেন, ১৮১৭ কি ১৮১৮ সালে ছয় সাতবার আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে এই আসামীর সাদৃশ্য বিলক্ষণ আছে। পার্শ্বের ঘরে যে ছবি আছে, তাহা আমি দেখিয়াছি। সেই ছবির পার্শ্বে আসামীকে একবার এদিকে একবার ওদিকে দাঁড় করাইয়া দেখিয়াছি, তাহার সঙ্গে আসামীর নাক, চোখ, অবয়ব বিলক্ষণ মিলে। বিশেষত ছবির বাম দিকে আসামীকে দাঁড় করাইলে আরো মিলে, আসামীর চিবুক ও নিম্ন ঠোঁটের নীচে যে গর্ত্তের মত আছে তাহাও মিলে। আমি যখন আসামীকে প্রথম দেখিলাম, তখন তাঁহাকে প্রতাপ অপেক্ষা লম্বা বোধ হইয়াছিল। তাহার পর আমি তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে আমার ভ্রম হইয়াছিল, আসামী ঠিক প্রতাপের মত উচ্চ। অদ্য প্রাতে জেলখানায় আসামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই সময় দুই এক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, রামমোহন রায়কে স্মরণ আছে কি ? প্রথমে আমি রামমোহন রায়ের সঙ্গে প্রতাপচাঁদের সহিত আলাপ করিতে যাই, তাহা প্রথমে আসামীর স্মরণ হইল না, তাহার পর স্মরণ হইল। তখন তিনি আমাকে বলিলেন যে, "তুমি সেই দিন একটা বন্দুকের মত বাক্স করিয়া একটা দূরবীন লইয়া গিয়াছিলে আর একটা খাঁচায় দুইটা পাখী লইয়া গিয়াছিলে। আমরা একত্রে ছাদে গিয়া কথা কহি" এ সকল কথা প্রকৃত। দূরবীন প্রায় ৪০ ইঞ্চ লম্বা ছিল, তাহাও আসামীর স্মরণ আছে। আমার বিশ্বাস যে, এই আসামী প্রতাপচাঁদ বটে। আমি আর একটিবার পানিহাটি গ্রামে একটা নাচের নিমন্ত্রণে আসামীকে দেখিয়াছিলাম, ইহার মুখের উপরভাগ দেখিয়াই বোধ হইয়াছিল, এ ব্যক্তিকে আমি চিনি। কিন্তু তখন ইহার দাড়ি ছিল বলিয়া ভাল চিনিতে পারি নাই, তাহার পর ওগলবির মোকদ্দমায় ইহাকে আমি সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষী দিতে দেখি, দেখিয়াই ইহাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। সেইখানেই এই কথা আমি কৌন্সলি লিত সাহেবকে বলি। আমি অনেক দিন জনরব শুনিয়াছিলাম যে, প্রতাপের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে।"

রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ বলিলেন, "আমার পিতার নাম মহারাজা চৈতন সিংহ, নিবাস বিষ্ণুপুর। তেজচাঁদ বাহাদুরের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। আমি বর্দ্ধমানে সর্ব্বদা যাইতাম, এক একবার গিয়া দুই মাস করিয়া থাকিতাম। আসামী নিশ্চয়ই তেজচন্দ্র বাহাদুরের পুত্র প্রতাপচাঁদ। পূর্ব্বে আমি প্রতাপের পলায়ন বার্ত্তা শুনিয়াছিলাম। সাত আট বৎসর হইল, লাহোর নিবাসী আমার একজন পাঠান দ্বারবান স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমাকে বলিয়াছিল, 'আমি পূর্ব্বে রঞ্জিত সিংহের পুত্র খড়ক সিংহের সহিত প্রতাপচাঁদকে এক হাতীতে চড়িয়া যাইতে স্বচক্ষে

দেখিয়াছি।' আসামী তিন বৎসর হইল, একবার আমার বাটীতে গিয়াছিল। আমি যত্নপূর্ব্বক ইহাকে তথায় তিন মাস রাখি। সেই জন্য বাঁকুড়ার মেজেন্টার আমাকে দেড় বৎসর আটক রাখেন, আর বিস্তর অপমান করেন।

জামকুড়ি নিবাসী রাজা জয়সিংহ বলিলেন, "আমি বিষ্ণুপুরের রাজগোষ্ঠী, আমি আসামীকে চিনি, ইনি প্রতাপচাঁদ।"

হাকিম আলি উল্লা বলিলেন "আমি আসামীকে চিনি, ইনি প্রতাপচাঁদ। পূর্ব্বে ইহার চিকিৎসা আমি করিয়াছি। আসগার আলি ইহার বেতনভোগী হাকিম ছিলেন। তাঁহার মুখে বিশেষ করিয়া শুনিয়াছিলাম যে, প্রতাপচাঁদ মরেন নাই, পলাইয়াছেন।"

কুঞ্জবিহারী ঘোষ বলিলেন, "আসামী আমার সাবেক মুনিব প্রতাপচাঁদ, ইনি যখন প্রথম গোলাপবাগে আসেন, আমি উঁহাকে চিনিয়াছিলাম এবং পরাণবাবুর পুত্র তারাচাঁদকে বলিয়াছিলাম। সেই জন্য আমার রাজবাটীর চাকুরি যায়।" পিটার এমার সাহেব, ফ্রেজার সাহেব, নাজির গোলাম হোসেন, আগা ইস্পাহানী ও স্বরূপচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি আরও অনেকে আসামীর পক্ষে জোবানবন্দী দিলেন।

আসামীর পক্ষে এইরূপ আরও কয়েকজন সাক্ষীর জোবানবন্দী হইয়া গেল। প্রতাপচাঁদের পিসি তোতাকুমারী,[৯] আর তাঁহার দুই স্ত্রী সপিনা[10] পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাক্ষী দিতে অস্বীকার করেন।

উভয় পক্ষের প্রমাণাদি ও বক্তৃতা আলোচনা করিয়া জজ সাহেব আসামীর বিরুদ্ধে আর কাজী সাহেব আসামীর সাপক্ষে রায় দিলেন। সে কথা পরে সবিশেষ বলা যাইবে।

জোবানবন্দী প্রায় শেষ হইয়া আসিলে একদিন রাজা প্রতাপচাঁদের মাতুল হঠাৎ আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জাল রাজা তাঁহাকে দেখিবামাত্র আহ্লাদে জজ সাহেবকে বলিয়া উঠিলেন, "ঐ আমার মাতুল আসিয়াছেন। ইঁহার জোবানবন্দী লওয়া হউক।" কিন্তু তাঁহার উকিল তাহাতে আপত্তি করিলেন। বলিলেন "সেনাক্ত সম্বন্ধে যে প্রমাণ আমরা দিয়াছি, এ মোকদ্দমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট, আর প্রমাণ দিব না।" জাল রাজা তাহাতে কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিলে, উকিল সাহেব তঁাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "উপস্থিত ফৌজদারি মোকদ্দমায় দেওয়ানির প্রমাণ অনাবশ্যক। যে প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে তাহাই অতিরিক্ত হইয়াছে। আমি যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আর পাঁচ হাজার সাক্ষী আপনাকে সেনাক্ত করিলেও জজ সাহেবের মত ফিরিবে না। আপনি প্রতাপচাঁদ কিনা, এ কথার বিচার দেওয়ানি আদালতে ভিন্ন এখানে হইবে না। এখানে সে বিচার হইলেও কোন ফল দর্শিবে না, এখানকার বিচারে আপনি রাজত্ব পাইবেন না, আপনাকে আবার দেওয়ানিতে নালিস করিতে হইবে। তবে এখন সকল প্রমাণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি?"

সা সাহেব এখানে ভুলিলেন। তিনি জানিতেন যে, গুটীকতক প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী একত্র হইয়া পূর্ব্বাহ্নে পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, জাল রাজাকে আসামী

ভিন্ন কখন কোন মোকদ্দমায় ফরিয়াদি হইতে দেওয়া হইবে না ; এবং সেই পরামর্শ অনুসারে জাল রাজাকে ফৌজদারিতে আসামী করা হইয়াছিল। এ কথা সা সাহেব নিজে লিখিয়া গিয়াছেন। তথাপি তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, অন্য লোকে দেওয়ানি আদালতে যেরূপে নালিস করে, জাল রাজাও সেইরূপ নালিস করিতে পাইবেন। তাঁহার এ প্রত্যাশা অসঙ্গত! জাল রাজার পক্ষে দেওয়ানির দ্বার অভাবনীয় ঘটনায় রোধ হইয়াছিল। সে কথা পরে বলা যাইবে।

১৪

প্রতাপচাঁদের মৃত্যু প্রকৃত কি না

প্রতাপচাঁদের মৃত্যু প্রমাণ করিবার নিমিত্ত রাজবাটীর সাক্ষী রাধামোহন সরকার, বসন্তলালবাবু, নন্দবাবু, ভৈরববাবু প্রভৃতি পোনরজন জোবানবন্দী দিলেন। তাঁহাদের পরিচয় পূর্বে দেওয়া গিয়াছে। তাঁহারা সকলেই রাজবাটীর বেতনভোগী এবং পরাণবাবুর আত্মীয় কুটুম্ব। তাঁহারা কে কি বলিলেন, আনুপূর্বিক সে পরিচয় দেওয়া অনর্থক। মোট কথা, তাঁহারা সকলেই এইরূপ বলিলেন যে, ১২২৭ সালের ২১শে পৌষ রাত্র দেড় প্রহরের সময় কালনার রাজবাটী হইতে প্রতাপচাঁদকে পাল্কী করিয়া গঙ্গাযাত্রা করা হয়। রাত্র তখন বড় অন্ধকার। পৌষ মাসের রাত্রে বড় শীত। গঙ্গাতীরে সেই শীতে প্রতাপচাঁদকে রাখায় তাঁহার কম্প আসিল, কাজেই তাঁহাকে তাঁবুর ভিতর লইয়া যাইতে হইল। তাঁবু সেই স্থানে জলের ধারেই পূর্বে খাটান হইয়াছিল। তাহার পর তথায় গীতাপাঠ আরম্ভ হইল! এদিকে প্রতাপচাঁদ পালঙ্কে শুইয়া হাতী ঘোড়া ধন ধান্য দান করিতে লাগিলেন। দান করা হইলে পর তাঁহাকে অন্তর্জলি করা গেল। তাঁহার পা মোহনবাবু জলে ডুবাইয়া ধরেন। প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হইলে ঘাসিরাম তাঁহার মুখাগ্নি করেন। বাবলা ও চন্দনকাষ্ঠে প্রতাপের শবদাহ হয়। সেই সময়ে ঘাটে দশ বারোটা মসাল জ্বালা ছিল।

এই সকল বৃত্তান্ত সাক্ষীরা আনুপূর্বিক বলিলেন। কিন্তু তেজচাঁদ বাহাদুরের মৃত্যু কোন্ তারিখে বা কোন্ সময়ে হয়, তাহা সাক্ষীরা অনেকেই বলিতে পারিলেন না। অথচ প্রতাপের মৃত্যুর প্রায় ১২ বৎসর পরে তেজচাঁদের মৃত্যু হয়।[৭১] কেহ বলিলেন, "তাহা স্মরণ নাই।" কেহ বলিলেন, "বধূরাণীদের মোকদ্দমায় এই সকল বিষয়ে আমি সাক্ষী দিয়াছিলাম, তাহাতেই প্রতাপচাঁদের মৃত্যু বৃত্তান্ত আমার স্মরণ আছে। তেজচাঁদের মৃত্যু স্মরণ রাখিবার সেরূপ কোন কারণ ঘটে নাই।" সাক্ষীরা এইরূপ নানা হেতু দর্শাইলেন।

কিন্তু এই সকল জোবানবন্দীতে জজ সাহেবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল। তিনি আপনার রায়ে লিখিলেন ঃ—"The proof here is of the strongest description of the testimony of the fact; viz. the deposition of the witness (fifteen in number) named in the margin, who have sworn positively

to the death and cremation, and who are consistent in their narrative of the attendant particulars, their testimony would appear to be conclusive."

বিশ বৎসরের ঘটনা পোনের জন সাক্ষীতে বর্ণনা করিল, অথচ কেহ কাহার সহিত কোন অংশে অনৈক্য হইল না। কি কাষ্ঠ দ্বারা শবদাহ করা হইয়াছিল, তাহা পর্য্যন্ত সাক্ষীরা একই রূপে বলিয়াছিল, কোন অংশে অনৈক্য হয় নাই। সুতরাং তাহাদের জোবানবন্দীর প্রতি জজ সাহেবের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল।

জাল রাজা জজকে বলিলেন, "পরাণের আত্মীয় কুটুম্বের কথায় নির্ভর করিয়া কেন আমার মাথা খাও! প্রতাপের মরণের সময় পরাণের কুটুম্ব ব্যতীত কি আর কেহ ছিল না? প্রতাপেরও ত কুটুম্ব, আমলা, চাকর সকলেই ছিল, কই তাহাদের একজনকেও ত ডাকা হয় নাই।" জজ সাহেব এ সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

জাল রাজা স্বীকার করেন যে, তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বলেন যে, তাহা তাঁহার নিজের ইচ্ছামতে হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে, "যে কোন পীড়া আমি অনুকরণ করিতে পারি। মৃত্যুও অনুকরণ করিতে পারি। কবিরাজেরা সে অনুকরণ ছন্দাংশে বুঝিতে পারিবে না।"

পীড়ার ভান সম্বন্ধে জাল রাজার কথা কতদূর গ্রাহ্য তাহা বলা যায় না। তবে বড় বড় ডাক্তার ও বিজ্ঞানবিদের মধ্যে দুই একজন বলেন যে, মৃত্যু অনুকরণ তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ডাক্তার চেনি সাহেব বলেন যে, একসময় কর্ণেল টাউনসেন্ড বড় পীড়িত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ কর্ণেল সাহেবকে দুইবার করিয়া দেখিতে যাইতেন। একদিন কর্ণেল সাহেব তাঁহাকে বলিলেন যে, "কতদিন হইতে আমার কেমন একটা হইয়াছে, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না, আমায় বুঝাইয়া দাও। আমি দেখিতেছি যে, আমি মনে করিলে মরিতে পারি, আবার চেষ্টা করিলে বাঁচিতে পারি।" সেস্থানে আর একজন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নাম বেনার্ড এবং একজন এপথিকারি ছিলেন তাঁহার নাম স্ক্রাইন। এই কয়জনে কর্ণেল সাহেবের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, কতকটা অবিশ্বাসও করিলেন। কিন্তু কর্ণেল সাহেব এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইবার নিমিত্ত জেদ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিবার পূর্ব্বে ডাক্তার সাহেবেরা একে একে কর্ণেল সাহেবের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। নাড়ী বেশ পরিষ্কার তবে একটু ক্ষীণ। তাঁহারা পরস্পর বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, তাহাও সহজমত টিপ্ টিপ্ করিতেছে। তাহার পর কর্ণেল সাহেব চিৎ হইয়া স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিলেন। ডাক্তার চেনি সাহেব তাঁহার দক্ষিণ হস্তের নাড়ী টিপিয়া ধরিলেন, ডাক্তার বেনার্ড বুকে হাত দিয়া থাকিলেন। আর স্ক্রাইন সাহেব একখানি পরিষ্কার দর্পণ নাসার নিকট ধরিয়া রহিলেন। ক্রমে নাড়ী যাইতে লাগিল, শেষ একেবারে পাওয়া গেল না। হৃদিচালনা স্থগিত হইল, নিশ্বাস প্রশ্বাসও স্থির হইয়া গেল। যে দর্পণ নাসাগ্রে ধরা হইয়াছিল, তাহাতে আর নিশ্বাসের ঘাম লাগিল না। তাহার পর ডাক্তারেরা একে একে

সকলেই নাড়ী দেখিলেন, সকলেই বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, সকলেই দর্পণ ধরিয়া দেখিলেন, জীবিতের চিহ্ন কেহই কিছু পাইলেন না। তখন তিন জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্কাতর্কি করিলেন, এ সময়ের মধ্যে কর্ণেল সাহেবের আর চেতন হইল না। শেষ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কর্ণেল সাহেব নিশ্চয়ই মরিয়াছেন। এইরূপে অনেকক্ষণ গেল। তাহার পর তাঁহারা চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমত সময়ে কর্ণেল সাহেবের শরীর একটু নড়িল। ডাক্তারেরা নারী দেখিলেন—নাড়ী হইয়াছে। বুক দেখিলেন, হৃৎপিণ্ডের গতি আরম্ভ হইয়াছে। নাসায় হাত দিলেন, নিশ্বাস বহিতেছে। শেষ কর্ণেল সাহেব ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিলেন। ডাক্তারেরা অবাক্ হইয়া থাকিলেন। কেহ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, অথচ মৃত্যু যে নিশ্চয়ই হইয়াছিল সে বিষয় তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ থাকিল না।*

* ডাক্তার চেনি এইরূপ লিখিয়াছেন—

"Colonel Townsend told us, he had sent for us to give him some account of an odd sensation he had for some time observed and felt in himself : which was that composing himself, he could *die* or expire when he pleased and yet by an effort or somehow, he could came to life again. Which it seems he had sometimes tried before he had sent for us. We heard this with surprise, but as it was not to be accounted for from now common principles, we could hardly believe the fact as he related it much less give any account of it, unless he should please to make the experiment before us, which we were unwilling he should do, lest, in his weak condition, he might carry it too far. He continued to talk very distinctly and sensible above a quarter of an hour about this (to him) suprising sensation and insisted so much on our seeing the trial made, that we were at last forced to comply. We all three felt his pulse first : it was distinct, tho' small and *threedy* : and his heart had its usual beating. He composed himself on his back. and lay in a still posture some time ; while I held his right hand, Dr. Baynard laid his hand on his heart, and Mr. Skrine held a clean looking glass to his mouth. I found his pulse sink gradually till at last I could not feel any by the most exact and nice touch. Dr. Baynard could not feel the least motion in his heart, nor, Mr. Skrine the least soil of breath on the bright mirror he held to his mouth ; then each of

এরূপ আরও দুই চারিটি ঘটনার কথা শুনা যায়। ডাক্তার টানার সাহেব লিখিয়াছেন যে, দেহের উপর মনের একাধিপত্য অতি অসাধারণ, এ সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনার প্রমাণ আছে। যথা সেল্‌সাস সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে, একজন পাদরি যখনই ইচ্ছা করিতেন তখনই আপনার সংজ্ঞাকে স্বতন্ত্র করিয়া আপনি জ্ঞানশূন্য ও প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারিতেন।*

শুনা যায় দেহ হইতে জীবাত্মাকে ইচ্ছামত স্বতন্ত্র করিবার পদ্ধতি আমাদের যোগশাস্ত্রে বিশেষ করিয়া লিখিত আছে। অনেকে বলেন যোগীদের মধ্যে সে পদ্ধতির চর্চা অদ্যাপিও বিলক্ষণ প্রচলিত। এ কথা কতদূর সত্য আমরা তাহা জানি না; সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারি না।

---

us by turns examined his arm, heart and breath, but could not by the nicest scrutiny discover the least symptom of life in him. We reasoned a long time about this odd appeapance as well as we could, and all of us judging it inexglicable and unaccountable, and finding he still continued in that condition, we began to conclude that he had indeed carried the experiment too far, and at last were satisfied he was actually dead, and were just ready to leave him. This continued about half an hour. By nine o'clock in the morning in autumn, as we were going away, we observed some motion about the body, and upon examination found his pulse and the motion of his heart gradually returning; he began to the breathe gently and speak softly, we were all astonished to the last degree at this unexpected change, and after some further conversation with him, and among ourselves, went away fully satisfied as to all the particulars of this fact, but confounded and puzzled and not able to form any rational scheme that might account for it"—*Quoted by T.H. Tanner in his Practice of Medicine*, 6th Edition, Vol. 1.

* This influence of the will over even the involuntary muscles is sometimes extraordinary, as many remarkable cases attest. Thus Celsus speaks of a priest who could separate himself from his senses when he chose, and lie like a man void of life and sense. Carden used to boast of being able to do the same. But the most surprising example of this kind is the well known case of Colonel Townsend related by Dr. George Cheyne. *T. H. Tanner's Practice of Medicine 6th Edi. Vol. I, Page 500.*

শুনা যায় দেহ হইতে জীবাত্মাকে ইচ্ছামত স্বতন্ত্র করিবার পদ্ধতি আমাদের যোগশাস্ত্রে বিশেষ করিয়া লিখিত আছে। অনেকে বলেন, যোগিদের মধ্যে সে পদ্ধতির চর্চ্চা অদ্যাপিও বিলক্ষণ প্রচলিত। ভুকৈলাসের[১২] যোগী ও রঞ্জিত সিংহের[১৩] যোগী এ কথার প্রমাণস্থল। লোকে বলে, তাঁহারা উভয়েই এরূপ সংজ্ঞাহীন হইতে পারিতেন যে, ডাক্তারেরা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়াও জীবনের লক্ষণ কিছুই পাইতেন না। ডাক্তার ম্যাগ্রেগর সাহেব নিজে রঞ্জিতের যোগীকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সেই যোগিকে এক সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া মৃত্তিকায় পুঁতিয়া চল্লিশ দিন রাখা হইয়াছিল। চল্লিশ দিনের পর মৃত্তিকা খনন করিয়া সিন্দুক বাহির করা হইলে দেখা গেল, তাহার ভিতর যোগী সমাধি অবস্থায় আছেন—তাঁহার সংজ্ঞা নাই। ডাক্তার Mcgregor সাহেব নাড়ী দেখিলেন—নাড়ী নাই। কিন্তু তাহার পর তাঁহার চেতনা হইল। ডাক্তার সাহেব "History of the Sikh War" গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"A Faqueer, who arrived at Lahore, engaged to bury himself for any length of time shut up in a box, and without either food or drink. Runjeet naturally disbeileved the man's assertions, and was determined to put them to the test. For this purpose the Faqueer was shut up in a wooden box, which was placed in a small apartment below the middle of the ground ; there was a folding door to his box, which was secured by a lock and a key. Surrounding this apartment there was the garden-house, the door of which was likewise locked ; and outside the whole a high wall, having its doorway build up with bricks and mud. In order to prevent any one from approaching the place, a line of sentries was placed, and relieved at regular intervals. The strictest watch was kept up for the space of forty days and forty nights, at the expiration of which period the Maharajah, attended by his grandson and several of his Sirdars, as well as General Ventura, Captain Wade, and myself, proceeded to disinter the Eaqueer. The bricks and mud were removed from the outer door-way ; the door of the garden-house was next unlocked, and lastly that of the wooden box containing the Faqueer. The latter was found covered with a white sheet, on removing which, the figure of the man presented itself in a sitting posture. His hands and arms were pressed to his sides, and his legs and thighs crossed. The first step of the

operation of resuscitation consisted in pouring over his head a quantity of warm water. After this, a hot cake of atta was placed on the crown of his head ; a plug of wax was next removed from one of his nostrils, and on this being done, the man breathed strongly through it. The mouth was now opened, and the tongue, which had been closely applied to the roof of the mouth brought forward, and both it and the lips anoninted with ghee. During this part of the proceeding, I could not feel the pulsation of the wrist, though the temperature of the body was much above the natural standard of healh. The legs and arms being extended and the eyelids raised, the former were well rubbed and a little ghee applied to the latter. The eyelids presented a dimmed suffused appearance, like those of a corpse. The man now evinced signs of returning animation ; the pulse became perceptible at the wrist, whilst the unnatural temperature of the body rapidly diminished. He made several ineffectual efforts to speak and at length uttered a few words in a tone so low and feeble as to render them inaudible. When the Faqueer was able to converse, the completion of the feat was announced by the discharge of guns and other demonstration of joy."

হটযোগ অভ্যাস করিলে এ সকল ভেল্‌কী অনায়াসে দেখান যাইতে পারে। জাল রাজার তাহা অভ্যাস ছিল, এ কথা তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু জজ, উকিল প্রভৃতি কেহ তাহা বুঝিলেন না, সুতরাং বিশ্বাসও করিলেন না। খেচরী মুদ্রা দ্বারা শ্বাস রোধ করিয়া মৃত্যু অনুকরণ করা যাইতে পারে, এ কথা ইংরেজী বুদ্ধির অতীত—আমাদের বুদ্ধিরও অতীত। আমরা ইংরেজী গ্রন্থে সে সকল কথা দেখি না, সুতরাং সে সকল কথা বিশ্বাস করি না।

জাল রাজার পীড়ার ভান সম্বন্ধে উকিল সা সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার এ বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। তিনি বলেন যে, প্রথমে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে, এ প্রতাপচাঁদ সত্যই জাল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে সে সংস্কার যায়, ক্রমে নানা বিষয় দেখিতে দেখিতে বুঝিলাম যে, ইনি প্রতাপচাঁদ নিশ্চয়ই। কিন্তু মৃত্যুর ভান সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিল। পরে একদিন সে সন্দেহের কথা হুগলীর জেলখানায় বসিয়া গল্প করিতে করিতে জাল রাজাকে বলিলে, জাল রাজা হাসিয়া উত্তর করিলেন যে "এ পরীক্ষা অতি সহজ। তুমি ডাক্তার সাহেবকে এখনই আসিতে লেখ, আমি এখনই একটা পীড়ার ভান করিয়া পড়িয়া থাকি।" তখন ডাক্তার ওয়াইজ (Dr. Wise) সাহেব হুগলীর সিবিল

সার্জ্জন ছিলেন। তাঁহাকে পত্র লেখায় তিনি তৎক্ষণাৎ জেলখানায় আসিলেন এবং জাল রাজাকে দেখিয়া রিপোর্ট করিলেন, যে "জাল রাজার বড় জ্বর হইয়াছে এবং পা ফুলিয়াছে, বোধ হয় তাঁহার গোদ হইবে। আপাততঃ তিনি কিছু দিন আদালতে যাইতে পারিবেন না।" এ কথা প্রকৃত হইলে পীড়ার ভান করিবার ক্ষমতা জাল রাজার ছিল বলিয়া বোধ হইলে হইতে পারে।

সে কথা সত্য মিথ্যা যাই হউক, ডাক্তার সাহেবের এই রিপোর্ট উপলক্ষ করিয়া সা সাহেব জজ সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যে জামিন লইয়া জাল রাজাকে খালাস দেওয়া হয়, এবং আপাততঃ তাঁহাকে একখানি চারপাই আর একখানি গাত্রবস্ত্র দেওয়া হয়। জজ সাহেব কিছু বলিবার পূর্ব্বে বিগনেল সাহেব বলিলেন যে "জেলের আসামীর জন্য এ সকল সরঞ্জাম দিবার কোন বিধি আইনে নাই। তবে যদি একান্ত তাহা আবশ্যক হয় তাহা হইলে ডাক্তার সাহেব আসামীকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার হুকুম দিতে পারেন।" জজ কার্টিস সাহেব বিগনেল সাহেবের অমতে কোন হুকুম দিতে সাহস করিতেন না, তথাপি তিনি বলিলেন, যে "এ বিষয়ের দরখাস্ত করিলে বিবেচনা করা যাইবে।" আর জামিন লইয়া খালাস দেওয়া সম্বন্ধে নিজামতে দরখাস্ত করিতে আদেশ করিলেন। সা সাহেব সেই মত দুই আদালতে দুই দরখাস্ত করিলেন। কার্টিস সাহেব চার পাই দিলেন এবং কিছু দিন পর নিজামত আদালত হুকুম দিলেন যে, "জামিন লইয়া আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়ার আপত্তি নাই।" কিন্তু জজ কার্টিস সাহেব নিজামতের সে হুকুম তামিল করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, যে, "এ অঞ্চলের লোকেরা জাল রাজার জন্য যেরূপ মাতিয়া উঠিয়াছিল এখন আর তত নাই। এ সময়ে তাহারা জাল রাজাকে পাইলে আবার সেইরূপ মাতিয়া উঠিবে। সুতরাং জাল রাজাকে ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে।" নিজামত আদালত নিরুত্তর হইলেন।

রাজা প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট পক্ষের প্রমাণ দেওয়া হইলে জাল রাজা তাহা খণ্ডন করিবার কোন বিশেষ চেষ্টা না করিয়া কেবল এইমাত্র দেখাইলেন যে, এই সময় রটনা হইয়াছিল যে, প্রতাপচাঁদ মরেন নাই, অজ্ঞাতবাস গিয়াছেন। জাল রাজার উকিলেরা জজ সাহেবকে বলেন যে, যে স্থলে বড় বড় লোকে বলিতেছে আসামী সত্যই প্রতাপচাঁদ, সে স্থলে মৃত্যুর প্রমাণ অন্যথা করিবার আর প্রয়োজন কি?" কিন্তু সে কথার বিপরীত জজ সাহেব বলিলেন, যে "যখন প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হওয়া স্পষ্ট প্রমাণ হইরাছে, তখন তাঁহাকে কেহ সেনাক্ত করিলে আর কি হইবে?"

জাল রাজা আপনার মৃত্যু রটনার হেতু এইরূপ বলেন ঃ—

"বিমাতা মহারাণী কমলকুমারী আমার পরম শত্রু ছিলেন। আমার বয়স যখন ষোল কি সতর, তখন তিনি দুইবার আহারের সঙ্গে আমায় বিষ দেন। একবার আমি তাহা ফেলিয়া দিই, আর একবার তাহা একটা ইঁন্দুরকে খাইতে দিই; ইন্দুর তাহা খাইয়া তৎক্ষণাৎ মরে। সেই অবধি আমার অন্ন আমি স্বতন্ত্র পাক করাইতাম। পরাণ আর বসন্তলালবাবু আমার সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত সহস্র ফাঁদ পাতিতেন, আমি

তাহা হইতে কৌশলে উদ্ধার হইতাম। কিন্তু শেষ তাঁহারা আমার পিতার মন ভার করিয়া দিলেন যে, তাহার আর কোন উপায় করিতে পারিলাম না।"

"আমি সেই অবধি অধঃপাতে গেলাম। ক্রমেই মদ অধিক খাইতে লাগিলাম। শেষে অদৃষ্টদোষে গুরুতর পাপগ্রস্ত হইলাম। তখন কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট স্বকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ব্যবস্থা দিলেন। 'এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল; তাহা আসক্তে চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস। সেই সঙ্গে বলিয়া দিলেন যে, এরূপভাবে অজ্ঞাতবাস করিবে, যেন সকলেই জানে—তুমি মরিয়াছ।' এই অজ্ঞাতবাস কিরূপে আরম্ভ করিব, প্রথমে ঠিক অনুভব করিতে পারি নাই; সুতরাং প্রথমে কাহাকেও না বলিয়া পলাইলাম। সেবার আমার পিতা আমাকে রাজমহল হইতে ধরিয়া আনেন। মুন্সি আমীরউদ্দিন তাঁহাকে আমার সন্ধান বলিয়া দেয়। আমি ফিরিয়া আসিলে, পিতামহাশয় পরাণের অত্যাচার ও পীড়নের কথা জানিতে পারিলেন, এবং সেই অবধি পরাণের উপর তিনি হাড়ে চটিয়া গেলেন। আমাকেও অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু আমার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। এবার ভাবিলাম, কেবল পলাইলে হইবে না, যেরূপ ব্যবস্থাপত্র সেইরূপ করা কর্ত্তব্য। আমি মরিয়াছি—সকলে জানা আবশ্যক। অতএব পীড়ার ভান করিয়া কালনায় গেলাম, কালনার ঘাটে কালীপ্রসাদ একখানি ভাউলিয়া আনিয়া রাখিবেন কথা ছিল; আর তাঁহাকে বলা ছিল, ভাউলিয়া পৌঁছিলে তিনি শঙ্খধ্বনি করিবেন। আমি শয্যায় শুইয়া সেই সঙ্কেত শুনিলাম। তাহার পর ক্রমে বিকারের রোগীর ন্যায় ভ্রমবাক্য বলিতে লাগিলাম। সকলে আমায় পাল্কী করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেল। শেষ অন্তর্জ্জলি করিল। অন্তর্জ্জলির পর যখন রাজবাটীর লোকেরা শীতে কাতর হইয়া তাঁবুর ভিতর গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, সেই সময় আমি জলে সরিয়া পড়ি। নিঃশব্দে সাঁতার দিয়া বজরায় উঠি। রাত্রিশেষে সেই বজরায় মুরশিদাবাদ যাত্রা করি।"

এদিকে রটনাও হইয়াছিল—রাজবাটীর ঘাটে শব না পাইয়া গঙ্গায় জাল ফেলিয়া অনুসন্ধান করে। সুতরাং লোকের বিশ্বাস হইয়া পড়ে যে প্রতাপ পলাইয়াছেন—মরেন নাই।

১৫

জাল রাজা গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী কি না?

এই মোকদ্দমার প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যশোর জেলা নিবাসী শ্যামলাল তেওয়ারি নামে একজন ব্রাহ্মণ গোয়াড়িতে আসিয়া একখানি কালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে সেই প্রতিমা উপলক্ষ করিয়া তাঁহার দিন যাপন হইতে থাকে। লোকে তাঁহাকে ব্রহ্মচারী বলিত। তাঁহার তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণলাল, মধ্যম রূপলাল, সর্ব্বকনিষ্ঠ গৌরলাল। ইহাদের মধ্যে পৈতৃক ব্যবসায়ে কৃষ্ণলালের একেবারে অনুরাগ

ছিল না ; তিনি চাকুরী করিবেন, এই তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা জুটে নাই, তিনি কেবল উমেদারি করিয়া বেড়াইতেন। তথাকার পাদরী ডিয়ার সাহেব তাহার প্রতি সদয় ছিলেন, কৃষ্ণলাল তাঁহার বাটীতে প্রত্যহ একবার করিয়া গিয়া সেলাম করিয়া আসিতেন। কিছুদিন পরে পাদরি সাহেব একখানি সুপারিস চিঠি তথাকার মেজেষ্টার সাহেবকে দেন। সেই সময় শান্তিপুরের দারোগাগিরি খালি ছিল। চিঠি পাইবামাত্র মেজেষ্টার সাহেব কৃষ্ণলালকে সেই দারোগাগিরি দিলেন। কিন্তু একদিন পরে আবার পরওয়ানা ফিরাইয়া লইলেন এবং সেই সঙ্গে পাদরী সাহেবকে লিখিলেন, যে কৃষ্ণলালের চরিত্র অতি মন্দ ; আর তাহার একজন খুড়া ডাকাইত। সুতরাং উহাকে আমি চাকুরি দিতে পারিলাম না। পাদরী সাহেব পত্র পাইয়া কৃষ্ণলালকে বলিলেন যে, তুমি আর কখনও আমার কুঠিতে আসিও না। সেই অবধি কৃষ্ণলালের উমেদারি করা ফুরাইল।

সাক্ষীরা বলেন, কৃষ্ণলাল তাহার পর ব্রহ্মচারী সাজিয়া এখানে ওখানে বুজরুকি দেখাইয়া দিনপাত করিতেন।"

পরাণবাবু মনে করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণলাল, এই জাল রাজা সাজিয়াছে। যখন জাল রাজা বাঁকুড়ায় গ্রেপ্তার হন, তখন পরাণবাবু তাঁহাকে কৃষ্ণলাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি পাদরি ডিয়ার সাহেবের নিকটেও লোক পাঠাইয়াছিলেন, এবং অন্যান্য সাক্ষী জুটাইয়াছিলেন ; কিন্তু সে সকল প্রমাণ তখন আদালতে বড় গ্রাহ্য হয় নাই। সেবার জাল রাজা আলক শা বলিয়া প্রতিপন্ন হন। এবার খোদ মেজেষ্টার সামুয়েল সাহেব এ বিষয়ে উদ্যোগী, সুতরাং সাক্ষী অনেক জুটিয়াছিল। সেই সকল সাক্ষী দ্বারা জানা গেল যে, কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল, তাহার এক পায়ে ছয়টি আঙ্গুল ছিল, আর বয়সে কৃষ্ণলাল রাজা প্রতাপচাঁদ অপেক্ষা দশ বার বৎসরের ছোট ছিল।

এই মোকদ্দমার চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণলাল নিরুদ্দেশ হন। কেহ বলে তাঁহার মৃত্যু হয়, কেহ বলে তিনি ২৪ পরগণায় কয়েদ হন। তাঁহার দুই সহোদরের অগ্রপশ্চাৎ লোকান্তর হয়। এই সময় শ্যামলালেরও মৃত্যু হয়, সুতরাং শ্যামলালের ত্যক্ত সম্পত্তি বেওয়ারিস বলিয়া আদালতে জব্দ থাকে। গোয়াড়ির সাক্ষীরা জাল রাজাকে কৃষ্ণলাল বলিয়া কিরূপে সেনাক্ত করিল তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লেখা গেল ঃ

(১) ফকিরচাঁদ তেওয়ারি, নিবাস যশোহর। বলিল, "আসামী আমার ভাগিনা কৃষ্ণলাল। আমি ইহাকে ৮ বৎসর দেখি নাই।"

(২) ঈশ্বরচন্দ্র তেওয়ারি বলিল, "আসামী কৃষ্ণলাল আমার পিসিপুত্র। যখন ইহার ১৫।১৬ বৎসর বয়স তখন ইহাকে দেখিয়াছিলাম, তাহার পর আর দেখি নাই।"

(৩) গঙ্গাপ্রসাদ তেওয়ারি বলিল, "এই আসামী আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ইহার নাম কৃষ্ণলাল। ইহার বয়স এখন ৩৭ বৎসর হইবে। আমার ভগিনীপতি বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে চাকুরী করিতেন, সম্প্রতি তিনি মরিয়াছেন। ইদানীং আমি কালনায়

থাকি, উমেদারী করি। কৃষ্ণলালের পায়ের আঙ্গুল পাঁচটা কি ছয়টা তাহা আমি বলিতে পারি না।"

(৪) রামচন্দ্র বিশ্বাস, আবকারীর খুচরা দোকানদার বলিল, আমি আসামীকে চিনি ইহার নাম কৃষ্ণলাল। আমরা এক পাঠশালায় লিখিয়াছি।" (রাজা প্রতাপ-চাঁদের পৃষ্ঠে ঘোড়ার কামড়ের যে দাগ ছিল, সেইরূপ আসামীর পৃষ্ঠে একটা দাগ থাকায় সাক্ষীকে মেজেস্টারীতে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কৃষ্ণলালের পৃষ্ঠে কোন দাগ ছিল কি না। সাক্ষী তাহাতে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল যে, "হাঁ, বিলক্ষণ দাগ ছিল।" কিন্তু পৃষ্ঠের কোন্ অংশে সে দাগ ছিল তাহা জিজ্ঞাসা করায় সাক্ষী ইতস্তত করিতেছে, এমত সময়ে সেরেস্তাদার মোনসারাম আপনার পৃষ্ঠে হাত দিয়া সাক্ষীকে ইঙ্গিত করিলেন। জাল রাজার উকিল তাহা মেজেস্টারকে দেখাইয়া দিলেন। সুতরাং মেজেস্টার সাহেব মোনসারামের দশ টাকা জরিমানা করিতে বাধ্য হইলেন।)

(৫) পাল খ্রীষ্টান বলিল, "এই আসামী কৃষ্ণলাল বটে, আমি ইহাকে গোয়াড়িতে ১৮৩৪ সালে দেখিয়াছি। ইহার সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক করিয়াছি। ইহার পিতার নাম শ্যামলাল। হুগলীর জেলখানায় আসামীকে সেনাক্ত করিবার নিমিত্ত আমাকে পাঠান হয়; তখন আমি যদিও ইহাকে চিনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা প্রকাশ করি নাই। সেনাক্তর নিমিত্ত দশ দিন সময় লইয়াছিলাম। জেরায় বলিল, গত রাত্রে মাণিক সিংহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে সেরেস্তাদার মনসারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল সত্য, আমি তাঁহার নিকট পথখরচা চাহিয়াছিলাম, তিনি জজ সাহেবের নিকট চাহিতে বলিয়াছিলেন।"

(৬) মহেশ পণ্ডিত নামে একজন খ্রীষ্টান জোবানবন্দীতে বলিলেন, "এই আসামীকে আমি গোয়াড়িতে ও বর্দ্ধমানে দেখিয়াছি, ইহার নাম কৃষ্ণলাল।" জেরায় বলেন, "আমি যখন মেজেস্টার ও ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে জেলখানায় গিয়া এই আসামীকে দেখি, তখন আমি বলিয়াছিলাম যে, এই ব্যক্তি কৃষ্ণলাল কি না তাহা আমি দশ দিন পরে বলিব। আমি বর্দ্ধমানে থাকি, আমার নিবাস ঐ জেলার অন্তর্গত রায়না গ্রামে।"

(৭) গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি নিশ্চয় বলিতেছি এই আসামী কৃষ্ণলাল। ইহার সঙ্গে এক পাঠশালায় লিখিয়াছি। ইহাকে গত ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে কেবল দুই তিন বার দেখিয়াছিলাম। কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল কি না বলিতে পারি না।"

(৮) রামচাঁদ মিত্র বলিলেন, "আমি বর্দ্ধমানের কালেক্টরীর মুহুরি। এই আসামী কৃষ্ণলাল, ইহাকে আমি চিনি। এ ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে আমার তৈলমাড়ুয়ের[৭৯] বাসায় গিয়া থাকিত। যখন ঐ ব্যক্তি বর্দ্ধমানে শেষে গিয়া প্রচার করে যে, আমি ছোট রাজা, তখন আমি কাহাকেও ইহার প্রকৃত পরিচয় দিই নাই, কেবল ইহাকে গোপনে তিরস্কার করিয়াছিলাম। কিন্তু সে তিরস্কার এ ব্যক্তি শুনে নাই।"

(৯) ব্রজমোহন মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি নদীয়া জেলার ফৌজদারী পেস্কার। এই আসামীকে চিনি, ইনি কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী।"

(১০) রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (খ্রীষ্টান) বলিলেন, "এই আসামী কৃষ্ণলাল। ইনি ইতিপূর্ব্বে মহাপুরুষ সাজিয়াছিলেন, আমি ইঁহার চেলা হইয়াছিলাম। ইঁহার সঙ্গে শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, মশাগ্রাম, বর্দ্ধমান, বরানগর প্রভৃতি নানা স্থানে বেড়াইয়াছি। আমি ইঁহার পাদকজল পর্য্যন্ত খাইয়াছি। আমি তখন ইঁহাকে দেবতা মনে করিতাম। যখন ইনি বর্দ্ধমানের রাজা হইবার কল্পনা করেন, তখন আমি মশাগ্রামে ছিলাম। আপনাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া রাষ্ট্র করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণলাল তথা হইতে বর্দ্ধমান গেলেন। আমি ও ইহার ভ্রাতা গৌরলাল উভয়ে মশাগ্রামে থাকিলাম। আসামী বর্দ্ধমান হইতে পলাইয়া বিষ্ণুপুরে যান। আমরা সে সংবাদ পাইয়া তথায় যাই। তাহার পর আমরা একসঙ্গে বাঁকুড়ায় যাইতেছিলাম, এলিয়ট সাহেব আমাদের বলগমা[৭৫] ঘাঁটিতে গ্রেপ্তার করেন।* গৌরলাল পলাইয়াছিল, আমি ধরা পড়িয়াছিলাম। তিন মাস জেল খাটি। জেলখানায় কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলে খালাসে অন্য উপায় না দেখিয়া মনে করিলাম মেজেষ্টারের নিকট কৃষ্ণলালের প্রকৃত পরিচয় বলিয়া দিলে, তিনি আমার খালাস দিবেন। তিনি এজেহার লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে খালাস দেন নাই। তখন আমার নাম 'কৃপানন্দ' ছিল। আমি কৃষ্ণলালের চেলা হইয়া ঐ নাম গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রকৃত নাম রামকৃষ্ণ। আমি খালাস হইলে পর পাদরি হিল সাহেব আমায় খ্রীষ্টান করিয়াছেন। আমি সেই অবধি আর মিথ্যা কথা বলি না। আমার পূর্ব্ব চরিত্রের পরিচয় পাদরি সাহেবকে লিখিয়া দিয়াছি, তিনি তাহা বিলাতে ছাপাইতে পাঠাইয়াছেন। কৃষ্ণলালের পায়ে কয়টি অঙ্গুলি তাহা বলিতে পারি না। বাঁকুড়ার মোকর্দ্দমায় এই ব্যক্তি কয়েদ হইয়াছিল কি না তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (অথচ এই সাক্ষী বলিয়াছিল, আমি জাল রাজার পাদোদক খাইতাম)।

(১১) প্রেমচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, আমি নদীয়া জেলার ফৌজদারী নাজির। এই আসামী গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে, এই ব্যক্তি কৃষ্ণলাল। কেন না, ইনি রাজা প্রতাপচাঁদ বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন। কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল। (এই সাক্ষীর চরিত্র সম্বন্ধে নানা গল্প অদ্যাপি গোয়াড়ীতে প্রচলিত আছে।)

---

* এলিয়ট সাহেব কমিশনর হইয়া যখন বাঁকুড়ায় যান, তখন একদিন তথাকার সার্কিট হাউসের সম্মুখে দাড়াইয়া বলিয়াছিলেন, যে এই তেঁতুলতলায় জাল রাজাকে আমি গ্রেপ্তার করি। যখন তিনি এই কথা বলেন, তখন লেখক নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই সাক্ষী যাহা বলিলেন সুতরাং তাহার সহিত এলিয়ট সাহেবের কথা মিলে না। কিন্তু অন্যান্য অনেকের নিকট শুনিয়াছি, জাল রাজার বাঁকুড়া জেলায় বলগমা ঘাঁটিতে গ্রেপ্তার হন। এ জনরব কিরূপে জন্মিল তাহা বলিতে পারি না। বোধহয়, এই সাক্ষীর জোবানবন্দী দ্বারা এই রটনা হইয়া থাকিবে।

(১২) নীলকমল ঘোষ বলিলেন, "আমি নদীয়া জেলার ফৌজদারী সেরেস্তাদার। এই আসামী কৃষ্ণলালের মত, কিন্তু আমি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।"

(১৩) প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি নদীয়া জেলার জজ আদালতের সেরেস্তাদার। এই আসামীকে কৃষ্ণলাল বলিয়া আমার বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না। কৃষ্ণলালের পিতা শ্যামলাল গত বৎসর মরিয়াছে। কেহ তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি দাবি করে নাই। কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল কি না তাহা বলিতে পারি না।"

(১৪) হরচন্দ্র হাজরা বলিলেন, "আমি নদীয়া জজ আদালতের উকিল, এই আসামী গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল, ইহাকে আমি চিনি, তবে ইহাকে আট বৎসর দেখি নাই।"

(১৫) ব্রজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "কৃষ্ণলালকে আমি বিলক্ষণ চিনি, সে আমার নিকট অনেক দিন ধরিয়া উমেদার ছিল। এই আসামীর সহিত সে কৃষ্ণলালের বিস্তর প্রভেদ।"

(১৬) মুন্সি মকিম বলিলেন, "কৃষ্ণলালকে আমার ভাল স্মরণ নাই। এই আসামী সে কৃষ্ণলাল নহে। আমি শুনিয়াছি কৃষ্ণলাল মরিয়াছে।"

(১৭) পাদরি ডিয়ার সাহেব (Revd. W. J. Deere) বলিলেন, "আমি এখন কৃষ্ণনগরে থাকি, পূর্বে কিছুদিন বর্ধমানে ছিলাম। আমি কৃষ্ণলালকে ভাল চিনি। তাহার পিতা শ্যামলাল, কৃষ্ণলালের চাকুরির নিমিত্ত আমায় অনুরোধ করে। কৃষ্ণলাল প্রত্যহ আমার বাটীতে আসিত। ব্যাটি সাহেবকে কৃষ্ণলালের নিমিত্ত আমি একখানি পত্র দিই। ব্যাটি সাহেব তাহাকে চাকুরি দেন নাই। ১৮৩৬ সালে অর্থাৎ বাঁকুড়ার মোকদ্দমার সময় বর্ধমানের পরাণবাবু আমার নিকট দুইজন লোক পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা আমায় বলে যে, একবার হুগলী গিয়া জাল রাজাকে সেনাক্ত করিতে হইবে। তাহারা আমায় পথ খরচ বলিয়া টাকা দিতে চাহিয়াছিল, আমি তাহা লই নাই। আমি তাহাদের বলিলাম, "যদি তোমরা কৃষ্ণলালের সন্ধান চাও তাহা হইলে আমি এখনই সন্ধান দিতে পারি।' এই বলিয়া গোয়াড়িতে কৃষ্ণলালের নিকট একজন লোক পাঠাইয়া দিলাম। লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, শ্যামলাল ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'কৃষ্ণলালকে টাকার নিমিত্ত শিষ্যবাটীতে পাঠাইয়াছেন, দশ বার দিনের মধ্যে সে আসিবে, আসিলে তাহাকে পাঠাইয়া দিব। তাহার পর সে না আসায়, প্রায় পোনর দিবস পরে আবার শ্যামলালের নিকট লোক পাঠাইলাম। সেবার শ্যামলাল বলিয়া পাঠাইলেন 'কৃষ্ণলালকে যদি পাদরি সাহেবের এতই দরকার থাকে তবে যেন তিনি নিজে তাহাকে তল্লাস করিয়া লন। এই আসামী কৃষ্ণলাল নহে।' আমি কৃষ্ণলালকে ছয় বৎসর দেখি নাই। এই ব্যক্তি যদি কৃষ্ণলাল হয়, তবে ছয় বৎসরে ইহার অতিরিক্ত পরিবর্তন হইয়াছে। কৃষ্ণলালের নাসাগ্র ঊর্ধ্বমুখী ছিল, আসামীর নাসাগ্র নিম্নমুখী। ১৮২১ সালে আমি শুনিয়াছিলাম, যে রাজা প্রতাপচাঁদ এদেশে বিদ্রোহ উদ্ভাবন করিবার নিমিত্ত রঞ্জিত সিংহের নিকট গিয়াছেন।"

(১৮) গৌরমোহন ভট্টাচার্য বলিলেন, "আমি কৃষ্ণলালকে বিলক্ষণ চিনিতাম, সে ব্যক্তি যখন উমেদারী করিত, তখন ডিক্ সাহেবের কাছারীতে তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতাম। তাহার পিতা শ্যামলালকে চিনিতাম। কৃষ্ণলালের আকৃতি এই আসামীর মত ছিল না।"

(১৯) কৃষ্ণমোহন সরকার (এই সাক্ষী জোবানবন্দী দিবার সময় জজ সাহেব বলিলেন, আমি এই সাক্ষীকে চিনি, ইনি ভাল লোক, ভদ্র এবং সত্যবাদী) সওয়াল মতে বলিলেন, "আমি গোয়াড়িতে ওকালতি করি, আমি কৃষ্ণলালকে চিনিতাম, এই আসামীকে কৃষ্ণলালের মত বোধ হয় না।"

(২০) রামধন খ্রীষ্টান বলিলেন, আমি এই আসামীকে চিনি না, ইহাকে কখন দেখি নাই। আমি কৃষ্ণলালকে চিনিতাম, তাহার সহিত ইহার কিছু আদল আইসে বটে কিন্তু এ ব্যক্তি সে নহে। কৃষ্ণলাল ইহার অপেক্ষা লম্বা ও গৌরবর্ণ। কৃষ্ণলালের নাসাগ্র উন্নত ছিল, এ ব্যক্তির তাহা নহে আর তাহার চক্ষু ছোট ছিল।

(২১) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি এখন উত্তরপাড়ায় থাকি। পূর্ব্বে টোল দারগা ছিলাম। কৃষ্ণলাল আমার নিকট মধ্যে মধ্যে আসিত। এই আসামী কৃষ্ণলাল নহে, তাহার মুখ লম্বা ছিল, আর তাহার মুখে দাগ ছিল।

গোয়াড়ির অন্য অন্য যে সকল লোকেরা মেজেষ্টরিতে বলিয়াছিল, যে এই আসামী কৃষ্ণলাল নহে," দায়রায় তাহাদের জোবানবন্দী লওয়া হয় নাই; সুতরাং আমরাও তাহাদের কথা আর উল্লেখ করিলাম না।

উভয় পক্ষের প্রমাণাদি দেখিয়া কাজি সাহেব রায় দিলেন যে, আসামী কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী নহে। কৃষ্ণলালের আত্মীয় উল্লেখে যাহারা জোবানবন্দী দিয়াছে তাহাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রাণকৃষ্ণ খ্রীষ্টানের কথাও সেইরূপ। সে বলে, যে সে তিন চারি বৎসর ধরিয়া কৃষ্ণলালের চেলা ছিল, অথচ সে জানে না যে কৃষ্ণলালের পায়ে কয়টী অঙ্গুলি ছিল।*

জজ সাহেবও কতকটা বুঝিয়াছিলেন যে, জাল রাজা যে কৃষ্ণলাল এই কথা ভাল প্রমাণ হয় নাই, তথাপি তিনি রায়ে লিখিলেন যে, জাল রাজা যে কৃষ্ণলাল এ কথা একপ্রকার প্রমাণ হইয়াছে। আরও বলিলেন যে এ সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই। "প্রতাপচাঁদের মৃত্যু ও তাঁহার শবদাহ যখন বিশেষরূপে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, তখন এই আসামী কৃষ্ণলাল প্রমাণ না হইলেও কিছু ক্ষতি নাই।"†

---

* প্রাণকৃষ্ণ জোবানবন্দীতে বলিয়াছিল যে, কৃষ্ণলালের পাদকজল সে খাইত।

† Combining all their testimonies I cannot avoid the conclusion that the prisoner's identity is sufficiently established by a preponderance of evidence above whatever has been adduced to impeach it. Evidence in such a matter cannot be expected to amount to absolute demonstration. Some dimness, and it may be

কালনায় জমিয়তবস্ত হইয়াছিল কি না?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ মেজেষ্টারীতে লওয়া হয় নাই। দায়রায়ও এ বিষয়ে প্রথমতঃ বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। স্বয়ং জজ সাহেব বলিয়াছিলেন যে, কালনার জমিয়তবস্ত অতি সামান্য ব্যাপার। তথাপি কয়েকজন সাক্ষীর জোবানবন্দী লওয়া হইল। নাজির আসাদ আলি আর দারোগা মহিবুল্লা প্রধান সাক্ষী। তাঁহারা অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু কালনার চৌকিদারেরা সামান্য চাকর, কি বলা আবশ্যক, কি বলা অনাবশ্যক, তাহা কিছুই বুঝিল না; সুতরাং তাহারা অনেকেই অম্লান বদনে বলিল, কালনায় কোন জমিয়তবস্ত হয় নাই।

জজ সাহেব রায়ে লিখিলেন, যে কালনার জমিয়তবস্ত প্রমাণ হইয়াছে।

'This charge, I view, is substantiated by the evidence of Mahaboollah Darogah and other Police Officers, and by that of Assad Ali, the Burdwan Foujdari Nazir; but there is, I conceive, no proof of an affray or actual breach of the peace. I should say the only facts proved are, *first*, that the prisoner No.1, the *sol-*

---

doubt, will abscure the recital now of details which occured at a remote date. But circumstances considered, I look upon the proofs as being on the whole satisfactory. It is true that in the main point the Law-Officer reject the evidence on the grounds that there are several descrepancies, which I admit, in the averments made by the witnesses who swears to the prisoner's identity with Kristo Lal.** For the reasons which I have stated above, it appears to me, the indentity is established by tolerably good, or I may say, sufficient evidence, although it may not be so satisfactory and decisive as the testimony to the Rajah's death. But I have a remark to make on this subject. After the prosecutor had proved the death and cremation of Rajah Protab Chunder, it was, I think, in no way incumbent on him to show who the prisoner really is. So long as the death, cremation, and non-identity remain, as I regard them firmly established, it would have been a matter of no moment to the case had he failed to prove that the prisoner is Kristo Lal."
Extract from No. 3 of the Calender for Sept. 1838.

disant Rajah, did not disperse his armed followers on receiving orders from the Police Officer to that effect, after the Darogah had explained to him the nature of the purwanah or orders issued from the Burdwan Magistrate, requiring him to disperse his armed followers. *Secondly*, that are the prisoner No.1 persisted in landing with a drawn sword in his hand, and visiting the shrine of Lalji Thakur at Culna; in the progress to which place, attended by a part of his followers, he ordered some of his people to disarm the two sepoys on guard at the burying ground of the Burdwan Rajah, but, on the remonstrance of the Darogah, he, at last, desisted from this foolish freak; after which, the *soi disant* Rajah and his people returned to the boats."

জজ সাহেব যাহাই বলুন, আপিলে এ কথা রক্ষা হয় নাই। সে পরিচয় পরে দেওয়া যাইবে।

১৭

জাল রাজার নিজ কথা

আসামীর পক্ষ সকল সাক্ষী হাজির হইলেন না। প্রতাপচাঁদের রাণীরা জোবানবন্দী দিয়াছিলেন, এবং জাল রাজাকে তাঁহারা সেনাক্ত করিয়াছিলেন এইরূপ এ অঞ্চলের সর্বত্র রটনা আছে। কিন্তু বাস্তবিক সে রটনা সত্য নহে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, জাল রাজা তাঁহাদিগকে সাক্ষী মানিয়াছিলেন, কিন্তু আদালতে আসিয়া সাক্ষ্য দিতে তাঁহারা অস্বীকার করেন। জজ সাহেব তাহাতে বলেন যে, তাঁহারা চুঁচুড়ার রাজবাটীতে আসিলে, কমিসন্[১৬] দ্বারা তাঁহাদের জোবানবন্দী লওয়া যাইবে। তাহাতেও রাণীরা সম্মত হইলেন না। সুতরাং জাল রাজা আর কোন চেষ্টা করিলেন না। তাহার কিছুদিন পরে রাণীরা হঠাৎ দরখাস্ত করিয়া পাঠাইলেন যে, আমরা সাক্ষী দিতে প্রস্তুত আছি। এবার জাল রাজা তাহাতে আপত্তি করিলেন। বলিলেন, "আমি রাণীদের সাক্ষ্য চাহি না।" ইহার হেতু কেহ বুঝিতে পারিল না। লোকে উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল, "এ সকল বুঝি কৃষ্ণ রাধার মানকেলি।" যখন জাল রাজা উপযাজক হইয়াছিলেন, তখন রাণীরা মাথা নাড়িলেন; আবার যেই জাল রাজা মান করিলেন, আর তাঁহারা থাকিতে পারিলেন না, আপনারা সাধিয়া সাক্ষ্য দিতে চাহিলেন।

লোকে যে যাহাই বলুক, আমরা শুনিয়াছি, যে রাণীরা সপিনা পাইয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, "আসামীকে যদি বাস্তবিক আমরা ছোট মহারাজ বলিয়া চিনিতে পারি, তথাপি সে কথা আমরা মুখে আনিতে পারিব না; আসামীকে স্বামী বলিয়া

স্বীকার করিলে পোড়া লোকে বলিবে যে, বৈধব্য ঘুচাইবার নিমিত্ত রাণীরা মিথ্যা বলিয়াছে। এবং হয় ত সেই কারণে জজ সাহেবও আমাদের কথা গ্রাহ্য করিবেন না। সুতরাং আমরা স্বামী পাইব না। তবে কেন কলঙ্কের পসরা মাথায় লইব ?" এইজন্য তাঁহারা সাক্ষ্য দিতে প্রথমে অস্বীকার করেন।

তাহার পর যখন জাল রাজা শুনিলেন যে, রাণীরা জোবানবন্দী দিবার নিমিত্ত উপযাচক হইয়া দরখাস্ত করিয়াছেন, তখন তাঁহার সন্দেহ হইল। তিনি সা সাহেবকে বলিলেন যে, "কাহার দ্বারা এ দরখাস্ত আসিয়াছে, এবং সে ব্যক্তি কোথায় বাসা করিয়াছে এই সকল তদন্ত করা আবশ্যক।" সা সাহেব তদন্ত করিয়া জানিলেন যে পরাণবাবুর লোক এই দরখাস্ত আনিয়াছে, এবং পরাণবাবুর মোক্তারের বাসায় সে ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে। জাল রাজা উকীলকে বলিলেন যে, "এবার পরাণের অনুরোধে রাণীরা সাক্ষী দিতে সম্মত হইয়াছেন।" সে অনুরোধের অর্থ যে, তাঁহারা আমাকে সেনাক্ত না করেন। কিন্তু কি জানি ? স্ত্রীজাতি ! আমায় দেখিয়া যদি তাঁহারা সে অনুরোধ ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাদের পথে দাঁড়াইতে হইবে। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়া গিয়াছে, আবার তাঁহাদের কপাল কেন ভাঙ্গি ? তাঁহারা এখন সুখে আছেন, সুখে থাকুন। আমি তাঁহাদের সাক্ষ্য চাহি না। জাল রাজার কথামত রাণীদের এব্রা[৭৭] করা হইল। কিন্তু জজ সাহেব বিপরীত ভাবিলেন ; তিনি বিবেচনা করিলেন যে, "আসামী নিশ্চয়ই জাল, তাহাই সে ভয় পাইয়াছি। রাণীরা কখনই মিথ্যা বলিবে না, এ কথা আসামী এখন বুঝিয়াছে।"

পূর্ব্বে ফৌজদারী মোকদ্দমা মুসলমানের সরা মতে[৭৮] হইত, সুতরাং সরার ব্যবস্থার নিমিত্ত একজন করিয়া কাজি বিচারাসনে বসিতেন। হুগলীর কাজি জাল রাজাকে বলিলেন, "তুমি মৃত্যুর ভাণ করিয়া পলাইয়াছিলে বলিতেছ, এখন আমি শুনিতে চাই, যে এই চতুর্দ্দশ বৎসর তুমি কোন্ কোন্ স্থানে ছিলে, এবং কি করিতে ?" জাল রাজা সে পরিচয় দিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার উকিল তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, প্রমাণ ব্যতীত সে পরিচয় কোনমতে গ্রাহ্য হইবে না এবং প্রমাণেরও আর সময় নাই। জাল রাজা তাহা শুনিলেন না, তিনি জজ সাহেবকে বলিলেন যে "আগামী কল্য আমি এ বিষয়ের একখানি লিখিত ফর্দ্দ দিব।"

মোকদ্দমার শেষে তিনি একদিন সেই ফর্দ্দ আর তাহার সঙ্গে একখানি বাঙ্গালা দরখাস্ত নিজে লিখিয়া দাখিল করিলেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল।

"কালনা হইতে পলাইয়া কালীপ্রসাদ আর আমি মুরশিদাবাদ ও ঢাকা হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদে গিয়া তীর্থস্নান করি। তাহার পর চন্দ্রশেখরে যাই। সেখান হইতে আদিনাথ দর্শন করিতে যাই। তথায় এক বৎসর থাকি। তাহার পর যৈন্তেশ্বরী ও ত্রিপুরেশ্বরী দর্শন করিয়া বানেশনাথ মহাদেবের নিকট এক বৎসর থাকি। সেখান হইতে পশ্চিমাঞ্চলে যাই। কাশী, প্রয়াগ, চিত্রকুট, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, প্রভাস, বদ্রিকাশ্রম, হরিদ্বার, হিঙ্গুলাজ, জ্বলামুখী প্রভৃতি নানা

তীর্থস্থান পর্যটন করি। পাঞ্জাবে গিয়া লাহোর, অমৃতশ্বর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করি, শেষ কাশ্মীরে যাই।[৭৯] সেইখানে জেনারেল এলার্ডের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। কাশ্মীরে আমি ছয় বৎসর থাকি। তাহার পর আবার হিন্দুস্থানে আসি। দিল্লীতে বিবি রামজে আমাকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলেন। আমি ইতস্ততঃ যাইতাম, তাহাতে অনেকে আমায় চিনিয়াছিল, যেখানে আমার কথা লইয়া আন্দোলন হইত, আমি সেই স্থান তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিতাম। প্রায়ই আমি যোগীদের সঙ্গে বেড়াইতাম। যখন যাঁহাদের সাক্ষাৎ পাইতাম, তখন তাঁহাদের সঙ্গ লইতাম, তাঁহারা একস্থানে স্থায়ী হইতেন না, সুতরাং আমি দীর্ঘকাল কাহার সঙ্গে থাকিতে পাই নাই। আমার একখানি ইয়াদাস্ত[৮০] বহি ছিল। যেদিন যেখানে গিয়াছিলাম, যেখানে যাহা আশ্চর্য্য দেখিয়াছি, তাহা সকলই ইয়াদাস্তে লিখিয়া রাখিয়াছি।* এলিয়ট সাহেব বাঁকুড়ায় যখন আমায় গ্রেপ্তার করেন, তখন সেই ইয়াদাস্তখানি হারায়। আমি সেখানির নিমিত্ত মেজেষ্টার সাহেবের নিকট বিস্তর মিনতি করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আর ফিরিয়া পাইলাম না; মেজেষ্টার তাহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত কোন হুকুম দিলেন না। আমি বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমে কালীঘাটে যাই, তাহার পর বর্দ্ধমানে উপস্থিত হই; সেখানে গোলাপবাগে আমাকে অনেকে চিনিয়া মহাআনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

যদি আমি বাস্তবিক মরিতাম, তাহা হইলে কি আমার ত্যক্ত সম্পত্তির কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতাম না? সামান্য লোকে সামান্য সম্পত্তির নিমিত্তে পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি দিয়া যায়, অথবা দানপত্র লিখিয়া যায়। কিন্তু আমার এত ধন, এত সম্পত্তি, আমি কি কোন একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারিতাম না? আমি পীড়িত হইয়া ত অনেক দিন ছিলাম, আমার বাক্‌রোধ হয় নাই। গঙ্গাযাত্রা করিলেও ত আমি অনেক দিন কালনায় ছিলাম; যদি সত্যই আমি মরিব এরূপ হইত, তাহা হইলে আমি কি পোষ্যপুত্রের অনুমতি দিয়া যাইতাম না? অথবা একখানা দানপত্র কি উইল করিয়া যাইতাম না? এ সকল করিবার সময় ত যথেষ্ট ছিল?

আর এক কথা। আমি যাইবার সময় একখানি প্রমাণ ছবি রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখানে আনা হইয়াছে। লোকে বয়সে স্থূল হয়, ক্লেশে কেহ শুষ্ক হয়, কেহ কাল হয়, কিন্তু মাথায় কেহ ছোটও হয় না, কেহ বড়ও হয় না। সেই ছবির সঙ্গে আমায় মাপিয়া দেখা হইয়াছে, চুল পরিমাণে ছবির মূর্ত্তি আমার সহিত প্রভেদ হয় নাই।

---

* রাজা প্রতাপচাঁদেরও এইরূপ ইয়াদাস্ত বহি রাখা অভ্যাস ছিল। তিনি যে সময়ে যাহা করিতেন, তাহা নিত্য লিখিয়া রাখিতেন। অনেকে বলেন, যে তাঁহার সেই ইয়াদাস্ত বহি জাল রাজা কোনরূপে হস্তগত করিয়াছিলেন, সেইজন্য প্রতাপচাঁদের সমুদায় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ঘটনা তিনি বলিতে পারিতেন। কেহ বলে, সে ইয়াদাস্ত বহি রাজবাটীতেই ছিল, মোকর্দ্দমার সময় তাহা আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল।

এখন বিচারকর্ত্তা পরমেশ্বর, আর তাঁহার প্রতিনিধি আপনারা, অধিক বলা বাহুল্য।"

১৮

দায়রার হুকুম

অন্য সকল সাক্ষীদের জোবানবন্দী হইয়া গেলে উভয় পক্ষের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। কিন্তু বক্তৃতা মুখে হইল না, লিখিত দাখিল হইল। তাহার পর কাজী সাহেব ফতওয়া[৮১] দিলেন। তিনি বলিলেন যে, সেনাক্ত[৮২] সম্বন্ধে সরকারের পক্ষে যে সকল প্রমাণ দাখিল হইয়াছে, তাহা আসামীর প্রমাণ অপেক্ষা গুরুতর নহে। আসামী বাস্তবিক কে, তাহা ফরিয়াদীর পক্ষ হইতে প্রমাণ হয় নাই। যতক্ষণ তাহাকে অপর ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন না করা হয়, ততক্ষণ প্রতাপচাঁদের নামধারণ অপরাধে তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না! কিন্তু জজ সাহেব অন্য প্রকার বিবেচনা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, "আসামী কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী, সুতরাং প্রতাপের নামধারণ জন্য তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে।" এইরূপে উভয়ের মত অনৈক্য হইল। উভয়ের রায় "মওয়াফেক্"[৮৩] না হইলে তখনকার আইন অনুসারে জজ সাহেব নিজে দণ্ড দিতে পারিতেন না, তাঁহাকে নিজামতে রিপোর্ট করিতে হইত। সেইজন্য জজ সাহেব নিজামতকে জানাইলেন, এবং সেই সংগে লিখিলেন যে, আসামীর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, একটি ব্যতীত তাহা সমুদয় প্রমাণ হইয়াছে। অতএব তাহাকে পাঁচ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দেওয়া হয়, ন্যূনকল্পে তিন বৎসর। এ সম্বন্ধে নিজামত আদালত যে হুকুম দিলেন তাহা পরে বলা যাইবে।

১৯

অন্য আসামীদের প্রতি দায়রার হুকুম

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আসামীশ্রেণীতে কালনায় ২৯৪ জন গ্রেপ্তার হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে আরও অনেকগুলি তাহাদের সামিল করা হয়। সেই সকল লোকের মধ্যে কেবল ৩১০ জনকে হুগলীতে পাঠান হইয়াছিল। হুগলীর মেজেষ্টার সামুয়েল সাহেব তাহাদের সাতজনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছিলেন, বাকি ৩০৩ জনের সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পান নাই, অথচ তাহাদের খালাসও দেন নাই। তাহাদিগকে তিনি জেলখানায় রাখিয়াছিলেন। গ্রীষ্মকাল গেল, তাহার পর শীত পড়িল; তাহাদের গাত্রবস্ত্র নাই। তিনশত লোককে শীতবস্ত্র দেওয়া সহজ কথা নহে; সুতরাং সে দিকে আর কেহ দৃষ্টিপাত করিল না। আসামীরা একে একে মরিতে আরম্ভ করিল। জাল রাজা আপনার উকীলদের বিস্তর অনুরোধ করিলেন যে, "এই হতভাগাদের রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিছু চেষ্টা কর।" সা সাহেব মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, "এই তিন শত লোকের জন্য গাত্রবস্ত্র কে দিবে?" জাল রাজা বলিলেন, "আমি আর দেখিতে

পারি না, তোমরা না কর, আমি নিজে দরখাস্ত করিব।" শেষ সা সাহেব দরখাস্ত লিখিতে সম্মত হইলেন। জাল রাজা লিখাইলেন, "হতভাগাদের এইমাত্র অপরাধ যে, তাহারা আমাকে রাজা প্রতাপচাঁদ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে। যদি আমি সত্যই জাল হই, তবে আমিই তাহাদের ঠকাইয়াছি, আমিই দণ্ডের যোগ্য। তাহারা ঠকিয়াছে, তাহাদের অপরাধ নাই। তাহাদের খালাস দেওয়া হউক, অন্ততঃ গাত্রবস্ত্র দেওয়া হউক।"*

দরখাস্তের ফল কতক ফলিল। ১৪০ জন খালাস পাইল, কিন্তু সাত মাসের পর খালাস পাইল। তাহাদের বিপক্ষে একজন সাক্ষীরও সাক্ষ্য লওয়া হয় নাই, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ ছিল না; অথচ তাহারা সাত মাস কারাবন্ধ ছিল। তাহাদের আর কোন বিচার হইল না। বাকি ১৬৩ জন জেলে থাকিল, তাহার মধ্যে কতক লোক সেইখানেই মরিয়া গেল।

বে-আইনি কয়েদ রাখার নিমিত্ত সা সাহেব যে ওগলবি সাহেবের নামে নালিশ উপস্থিত করেন, তাহার বিচার সুপ্রিম কোর্টে ৯ই জানুয়ারী তারিখে আরম্ভ হয়। সেই মোকদ্দমায় হুগলির মেজেষ্টার সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহাকে এই সকল আসামীদের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "৩১০ জনের মধ্যে আমি ছয় মাসের পর ১৪০ জনকে খালাস দিয়াছি; আর বাকি ১৫০ কি ১৬০ জন বিচারের নিমিত্ত জেলখানায় অদ্যাপি আবদ্ধ আছে। যে ১৪০ জনের কথা বলিলাম, আমি তাহাদের বিচার করিয়াছিলাম, অর্থাৎ ওগলবি সাহেব বর্দ্ধমানে তাহাদের এজাহার লইয়া আমার নিকট দণ্ডের নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাহাদের ছয় মাস পরে ছাড়িয়া দিয়াছি। আদালতে তাহাদের আনি নাই। আমার আদালত ঘর বড় ক্ষুদ্র, এত লোক সেখানে ধরিতে পারে না বলিয়া আদালতে তাহাদের হাজির হইতে দিই নাই। সা সাহেব

* "Their whole crime consisted in believing me to be Raja protab Chand. If I am an impostor, as alleged, I am guilty of having deceived them, and I may therefore be liable to punishment. Of these persons only six have been thought criminal to be sent for trial before you, and the others have been in custody for a period of nearly seven months without knowing the crime which they are alleged to have commited, without being confronted with any of the witnesses for the prosecution, and without having been brought to trial. Of the remainder, thirteen are dead,—two more I understand are at the point of death, and twenty two are in the hospital. I am also informed that several of these in hospital have not sufficient clothes to cover their bodies." *Extract from petition dated 30th November 1838.*"

তাহাদের মোক্তার ছিলেন বলিয়া তাহাদের উপস্থিত হইবার আবশ্যকও হয় নাই। সা সাহেব তাহাদের পক্ষ হইতে কোন মোক্তারনামা দাখিল করেন নাই, আমিও দাখিল করিতে দিই নাই। সা সাহেব নিজে আসামী, সুতরাং তিনি মোক্তার হইবার অধিকারী নহেন।"

এ বিচারপদ্ধতি শুনিয়া সুপ্রিম কোর্টের অনেকে হাসিলেন। বোধ হয় সামুয়েল সাহেব তাহা দেখিয়া ভাবিলেন, ইহারা তবে বিচার কাহাকে বলে? তিনি তখন বলিলেন "What do you mean by a trial ? There certainly has been no regular trial of those prisoners whom I released, nor of those who, I have said, are now awaiting their sentence ; those whom I released I considered less criminal than the others, and I thought the punishment they had already undergone was sufficient—they had been in prison six months—Yes ! certainly without having any regular trial or sentence passed on them. By Regulation I can not try after six mouths' imprisonment."

আরও হাসি পড়িয়া গেল। যাহারা ছয় মাসের অধিক কাল জেলে থাকে, তাহাদের বিচার করিতে আইনে নিষেধ! সেইজন্য মেজেণ্টার বাহাদুর তাহাদের বিচার করেন নাই, জেলে রাখিয়াছিলেন! যাহাদের বিচার নিষেধ, তাহাদের জেলে রাখিতে আইনে নিষেধ নাই! ছয় মাস ছেড়ে নয় মাস তাহারা জেলে আছে, আরও থাকিবে, তাহাতে আইনের আপত্তি নাই। আইনের আপত্তি কেবল বিচার সম্বন্ধে। ছয় মাসের পর খবরদার যেন আর বিচার না হয়, ছয় মাসের পর যত দিন ইচ্ছা জেলে রাখ, কিন্তু বিচার করিও না। ইহা কোম্পানীর আইন।

যে সকল আসামীদের কথা বলা হইতেছিল, তাহারা কতদিন পরে খালাস পাইল তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। বোধ হয়, জাল রাজার মোকদ্দমার পর মেজেণ্টার সাহেবের অবকাশ হইলে তাহাদের খালাস দেওয়া হইয়া থাকিবে। সামান্য লোকদের জেলে রাখা তখন সামান্য ব্যাপার বলিয়া মেজেণ্টারদের বোধ ছিল; গরিব দুঃখীরা কে খালাস পাইল কি না পাইল, তাহা লইয়া আন্দোলন করিতে কাহার সাহস হইত না। "চাচা আপন বাঁচা" এই তখনকার প্রচলিত বুলি ছিল। তদ্ব্যতীত সকল দিকে দৃষ্টি করিবার অবকাশ মেজেণ্টারদের একেবারে ছিল না। তখন ডিপুটি মেজেষ্টার ছিল না, সবডিবিসন ছিল না, সকল কার্য্যই মেজেণ্টারকে নিজে করিতে হইত; সুতরাং কোন কার্য্যই হইয়া উঠিত না, অনেকটা আমলাদের উপর নির্ভর করিতে হইত। তাহাই দেওয়ান মনসারাম মিত্রের অসম্ভব প্রভুত্ব হইয়াছিল। তিনি মনে করিলে এই আসামীদের খালাস দিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার এ সামান্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবার কোন হেতু উপস্থিত হয় নাই।

দায়রায় সাতজন আসামী সোপর্দ্দ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে জাল রাজার পক্ষে

জজ সাহেব যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অপর ছয়জন সম্বন্ধে কোন প্রমাণ ছিল না, মেজেস্টার সাহেবও কোন প্রমাণ নিজে লন নাই, দায়রায়ও কোন প্রমাণ পাঠান নাই ; সুতরাং জজ সাহেব তাহাদের খালাস দিলেন।[৮৪]

এই ছয়জনকে কেন দায়রা সোপর্দ করা হইয়াছিল, ইহার হেতু ঠিক বুঝা যায় না। ইহারা জাল রাজার সঙ্গে ছিল সত্য, কিন্তু আরও অনেকে ত সেই সঙ্গে ছিল, তাহাদের সকলকে সোপর্দ কেন করা হইল না, কেবল এই ছয়জনকে কেন সোপর্দ করা হইল, তাহা লইয়া কেহ কেহ তর্ক করিয়াছিলেন। জাল রাজার উকিল সা সাহেব উপহাস করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, "সাত সংখ্যা শুভপ্রদ, তাহাই সাতজনকে দায়রায় সোপর্দ করা হইয়াছিল।"

২০

ওগিলবি সাহেব আবার আসামী

একবার ওগিলবি সাহেব খুনের মোকদ্দমায় আসামী হইয়াছিলেন। আবার তিনি আর এক মোকদ্দমায় আসামী হইলেন। এবার তাহাতে জাল রাজার কিছু উপকার হইয়াছিল ; এইজন্য সেই মোকদ্দমার সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি। পূর্বে বলা হইয়াছে কালনার হত্যাকাণ্ডের পরদিবস জাল রাজার উকিল সা সাহেব পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় বর্ধমানের মেজেস্টার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কয়েদ রাখেন। সেই বেআইন কয়েদের বিচার এতদিনের পর ৯ই জানুয়ারি তারিখে আরম্ভ হইল। এবার চীফ্ জাস্টিস্ সার এডওয়ার্ড রায়ান সাহেব স্বয়ং বিচার করিতে বসিলেন। ওগিলবি সাহেবের কপাল ভাঙ্গিল। জজ রায়ান উভয় পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করিয়া জুরিদের চার্জ দিলেন। জুরিরা ওগিলবি সাহেবকে অপরাধী করিলেন। চীফ্ জস্টিস্ তাঁহার দুই হাজার টাকা জরিমানা করিলেন। সেই সময় জজ সাহেব ধীরে ধীরে যাহা বলিলেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

'James Balfour Ogilvy—it is my painful duty to pass the sentence of this Court upon you. You have been found guilty of false imprisonment of the prosecutor Mr. Shaw. (The learned judge then recapitulated the facts of the case). The Darogah, a most important witness, as to the acts of Shaw and the necessity for his restraint, was not called by either party,—why, I cannot understand, as he certainly could have given the best evidence as to what took place, and whether Mr. Shaw was party to any disturbance or breach of the peace. But I must say that there is not a title of evidnce to show that Mr. Shaw was guilty of sedition, or any other offence whatever. It is in evidence, that he knew only

of one perwanah being served on Pertaup* at Culna, and, I must say, that his conduct on that occasion appears to me to have been judicious, regular and proper. He made his client write a letter offering submission to the order of the authorities, and it was delivered to the Nazir that night. Mr. Shaw so far from committing any improper acts, gave the best advice as to how to get rid of the assembly, by telling the Nazir to point out who of the followers should be sent away. The treatment of Mr. Shaw after his arrest was certainly exceedingly harsh, and is without justification either in law or in fact, and he was made to undergo by you most unwarrantable and most unjustifiable imprisonment. The Court will not however cause you to suffer imprisonment, because, we must suppose, that you have been actuated by motives arising from erroneous information and a mistaken zeal. but ardently wish to preserve peace and good order in your district (the letters from Mr. Alexander the missionary and Captain Harrington were then read). It is probable that these letters excited considerable alarm in your mind, and after the unfortunate affray in the morning you may have imagined it necessary to arrest Mr. Shaw, but those letters should have led you to enquire into matters before you proceeded to act as you have acted. It appears that there was no disturbance whatever when the affray took place, nor had there been any for a considerable time before the event took place. But the Court believing, that you acted upon erroneous information, although rashly and unjustifiably, will give you in your sentence the benefit of that consideration, which they on that account extend towards you. Such conduct cannot however be lightly passed over. Liberty

* চীফ্ জষ্টিস স্যার্ এডওয়ার্ড রায়ান সাহেব অম্লানবদনে "প্রতাপচাঁদের মোকদ্দমা" "প্রতাপচাঁদের গ্রেপ্তার" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোম্পানীর জজ মেজেষ্টারগণ প্রতাপচাঁদ নাম উচ্চারণ করিতে সাহস করেন নাই। জোবানবন্দীতে হউক, রায়ে হউক, যেখানে প্রতাপচাঁদের নাম উল্লেখ করিতে হইয়াছে, সেখানে তাঁহারা soi disant Rajah প্রভৃতি শব্দ বলিয়া গিয়াছেন। আমরাও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কেবল "জাল রাজা" বলিয়া আসিতেছি।

is dear to all ; you have deprived the prosecutor of his with very unnecessary and very considerable harshness. It will also serve as a warning to others who may at any future time to be placed in situations similar in nature to yours. The Sentence of the Court therefore is, that you pay a fine to the Queen of two thousand Rupees, upon payment of which, you be discharged.

জরিমানার হুকুম দিবার সময় আসামীকে রায়ান সাহেব বলিলেন, তোমায় কয়েদ দিলাম না, কারণ তুমি ভ্রমে পড়িয়া মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিয়া এই অকার্য্য করিয়াছ।

কয়েদের কথা উল্লেখ করাতেই যথেষ্ট হইয়াছিল। কোম্পানীর মেজেষ্টার অত্যাচার করিলে কেহ যে দণ্ড দিবার আছে, ইহা লোকে জানিত না। মহারাণীর আদালতে আর কোম্পানীর আদালতে যে কি প্রভেদ তাহা লোকে এখন বুঝিতে পারিল। তাহাদের কতক ভরসা হইল। কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে বড় গোলযোগ বাঁধিয়া গেল। সে সকল পরিচয় দেওয়া এক্ষণে অপ্রয়োজন। তবে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে কোম্পানী বাহাদুরের চক্ষে ওগিলবি সাহেব দাগি হইলেন না। তিনি ফৌজদারীতে দণ্ড পাইয়াছেন বলিয়া মেজেষ্টারির আসনে বসিবার অযোগ্য হইলেন না, একটীন[৮৫] মেজেষ্টার ছিলেন, শীঘ্র পাকা মেজেষ্টার হইলেন।

২১

জাল রাজা সম্বন্ধে নিজামত আদালতের হুকুম

এই সময় হুগলীর জজ সাহেব জাল রাজা সম্বন্ধে যে এস্তেমেজাজ[৮৬] করিয়াছিলেন, তাহা নিজামত আদালতে পেশ হইল। জজেরা বড় গোলে পড়িলেন, ভাবিতে লাগিলেন আসামীকে কি বলিয়া দণ্ড দেওয়া যায়। কালনায় জমিয়তবস্ত হওয়ার অপরাধে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এতদিন কয়েদ রাখা হইয়াছে, অথচ সেখানে কোন গোলযোগ হয় নাই। সুপ্রিম কোর্টের বিচারে প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে যে, কালনায় কোন গোল-যোগ হয় নাই। এ বিচারের পর কালনার জমিতবস্ত বলিয়া দণ্ড দেওয়া ভাল দেখায় না। অন্য অপরাধে দণ্ড দিতে গেলে রাজা প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করা ব্যতীত আর কোন অপরাধ নাই। অন্যের নাম গ্রহণ করাই বা কি এমন গুরুতর অপরাধ। বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তির নাম ধরায় কাহার কোন ক্ষতি হয় নাই। কেহ সেজন্য নালিশ উপস্থিত করে নাই। তবে এখন কি করা কর্ত্তব্য! এই সময় নিজামতের কাজী সাহেব তাহাদের উদ্ধার করিলেন। তিনি ফতওয়া দিলেন যে, আত্ম উপকারের নিমিত্ত যদি কেহ অন্যের নাম ব্যবহার করে, তাহা হইলে মহম্মদীয় ব্যবস্থানুসারে সে ব্যক্তি অপরাধী। জজেরা তখন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া হুকুম দিলেন যে, "মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করার নিমিত্ত আসামী আলক শা ওরফে প্রতাপচাঁদ ওরফে

কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী এক হাজার টাকা জরিমানা করা যায় ; অনাদায়ে তাহার ছয় মাস কারাবাস। আর প্রকাশ থাকে যে অন্যান্য চার্জ হইতে তাহাকে মুক্তি দেওয়া গেল।"

অন্যান্য অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়া জাল রাজা দরখাস্ত করিলেন যে "নানা অপরাধ আমার শিরে আরোপ করিয়া মেজেষ্টারেরা আমাকে এমনই গোলে ফেলিয়াছিলেন যে, তাহা অপ্রমাণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ সেই সময় তাঁহারা জেলে পুরিয়া আমায় নিশ্চেষ্ট করিয়াছিলেন। আমি কোথাও যাইতে পারি নাই, কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই, কোন অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। জেলে বদ্ধ থাকিয়া আমি কিরূপে এত বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করিব। এক্ষণে যে সকল অভিযোগ হইতে হুজুর আদালত আমায় মুক্তি দিয়াছেন, বাকি যে অপরাধটি আমার স্কন্ধে রাখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আর একটু প্রমাণ গ্রহণ করুন, তাহা হইলেই দেখিবেন আমি নিরপরাধী, আমি অন্যের নাম ব্যবহার করি নাই। আমি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ ; নিম্ন আদালতে আমি এ বিষয়ে সকল প্রমাণ দিই নাই। দিবার প্রয়োজন আছে এমতও বিবেচনা করি নাই। আমি প্রতাপচাঁদ হইলেও হইতে পারি এই সন্দেহ মাত্র ফৌজদারী হাকিমের মনে উদ্ভাবন করিয়া দিতে পারিলেই অব্যাহতি পাইব এই মনে করিয়া আমি প্রমাণ দিয়াছিলাম। ফৌজদারী হইতে অব্যাহতি পাওয়াই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আমি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ অন্য কেহ নহি, এরূপ প্রমাণ দেওয়ানী আদালতে প্রয়োজন বলিয়া আমার তখন বিশ্বাস ছিল। বিশেষতঃ আমার উকিলেরা আমায় বুঝাইয়াছিলেন যে মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা কোম্পানীর আইনানুসারে অথবা হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে কোন অপরাধই নহে। এই জন্য এই সম্বন্ধে একপ্রকার আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। এখন আমার ত্রুটী হইয়াছে বুঝিতেছি, তাহা মার্জ্জনা করুন, আমার বাকি প্রমাণ গ্রহণ করুন, তাহার পর আমার প্রতি যে আজ্ঞা দিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য হইবে।"

কিন্তু নিজামত আদালত এই দরখাস্ত[৮৭] নামঞ্জুর করিলেন। জজেরা বলিলেন, যে দরখাস্তকারী যখন নিম্ন আদালতে আপনিই ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ প্রমাণ দেয় নাই, তখন আর এখানে সে বিষয়ের কোন ওজর শুনা যাইতে পারে না, বিশেষতঃ রাজা প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে অতি সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং আর পুনর্ব্বিচারের কোন হেতু দেখা যায় না।

এই হুকুমের পর জাল রাজার পক্ষ হইতে আর এক দরখাস্ত দাখিল হইল। দরখাস্তখানি বোধ হয় বড় রাগ করিয়া লেখা হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম এই—"দরখাস্তকারীর এক্ষণে জানিবার প্রার্থনা যে কোন্ আইন অনুসারে তাহার হাজার টাকা জরিমানা করা হইয়াছে ? কোন্ আইন বা বিধি অনুসারে হুগলীর জজ এ মোকদ্দমা হুজুর আদালতে সোপর্দ্দ করিয়াছেন ? এবং হুজুর আদালতের কাজি যে ফতওয়া দিয়াছেন, যে আত্ম উপকারার্থ মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা দণ্ডার্হ, তাহা তিনি

কোথা পাইয়াছেন, কোন্ মুসলমানি গ্রন্থে দেখিয়াছেন। দরখাস্তকারী এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান মৌলবিদের দ্বারা বিশেষরূপে তদন্ত করাইয়াছে কিন্তু তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা অপরাধ বলিয়া কোন গ্রন্থে তাঁহারা পান নাই।"

নিজামত আদালত তাহাতে হুকুম দিলেন যে, এ সম্বন্ধে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে এক্ষণে আর কোন কথা শুনা যাইতে পারে না। ভবিষ্যতে দরখাস্তকারী প্রতাপচাঁদ বলিয়া কোন দরখাস্ত করিলে তাহা আর গ্রহণ করা যাইবে না। কেন না বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে যে দরখাস্তকারী প্রতাপচাঁদ নহে।* এই হুকুম সর্ব্ব-নাশের মূল হইল।

২২

জাল রাজার সর্ব্বনাশ

এই হুকুমটী শুনিতে সামান্য, কিন্তু পরিণামে অতি গুরুতর হইয়া পড়িল। ওগিলবি—সামুয়েল যাহা করিতে না পারিয়াছিলেন, নিজামতের এই হুকুমটী তাহা করিয়াছিল। "বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে যে, জাল রাজা প্রতাপচাঁদ নহে, সুতরাং প্রতাপচাঁদ বলিয়া তিনি কোন দরখাস্ত করিলে আর তাহা গ্রহণ করা যাইবে না"—এই কথায় জাল রাজার পক্ষে সকল দ্বার পারতঃ রোধ হইল। তিনি দেওয়ানীতে প্রতাপচাঁদ বলিয়া সম্পত্তি দাবি করিলে তাঁহার আর্জি আর দাখিল হইবে না, এবং প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করার নিমিত্ত আবার তিনি দণ্ড পাইবেন। সুতরাং আর কোন আদালতে তিনি বিচারপ্রার্থী হইতে পাইলেন না; আপিল পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। প্রতাপচাঁদ বলিয়া যে ব্যক্তি আপনার বিষয় কোন আদালতে দাবি করিতে আসিয়াছে, সে ব্যক্তি আর্জিতে আলক শা বা কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী বলিয়া দরখাস্ত করিতে পারে না। করিলে সেইখানেই তাহার দাবী শেষ হইবে। আবার প্রতাপচাঁদ বলিয়া দরখাস্ত করিলে সে দরখাস্ত দাখিল হইবে না, দরখাস্ত করিলে হয়ত দণ্ড পাইতে হইবে সুতরাং এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সকলের ধারণা হইল যে, "জাল রাজার পক্ষে দেওয়ানী আদালতের দ্বার রোধ করিবার জন্য জজেরা এই কৌশল অবলম্বন

---

* নিজমতের এই সকল হুকুম জজ (W. Braddon) ব্রাডন সাহেব এবং (C. Tucker) টকর সাহেব একত্রে দিয়াছিলেন। টকর সাহেব একবার ফৌজদারী আদালতে নিজে সাক্ষি হন। আমরা সেই সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম। এই জজদিগের শেষ হুকুমটি এইরূপ লিখিত হয়—

The Court further remark, that as they have judicially pronounced the petitioner not to be the Moharajah Protaub Chand, they cannot in future, receive any petitions or applications from him under that name and title.—*Extract from order dated 19th July 1839.*

করিয়াছেন।" কেহ কেহ বলেন, "গবর্ণমেণ্টের কোন চতুর সেক্রেটারি এই কৌশল তাঁহাদের শিখাইয়া দিয়াছেন।"

এই কৌশলের পর জাল রাজা কপাল ঠুকিয়া আর এক দরখাস্ত নিজামতে দাখিল করিলেন। দরখাস্তে নাম দিলেন না, নামের পরিবর্ত্তে লিখিলেন, "The humble petition of one who hath been sued at the instance of Government by the name of Aluck Shah, alias Rajah Protap Chand, alias Kistolall Brohmocharee."

দরখাস্তখানি অতি দীর্ঘ, রাগে ভরা, এবং ঠাট্টা বিদ্রূপে পরিপূর্ণ। তাহার কিছু পরিচয় দিবার নিমিত্ত কোন কোন অংশের মর্ম্ম উদ্ধৃত করা গেল।'—

১। "দরখাস্তকারীকে কখন আলক্ শা বলিয়া কখন কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী বলিয়া দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু দেখা যাইতেছে এখনও স্থির হয় নাই যে, ভবিষ্যতে আদালত হইতে তাহার কি নাম কায়েমি রাখা হইবে। সুতরাং যে অবধি তাহা না রাখা হয়, সে অবধি দরখাস্তকারী কোম্পানী আদালত ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্র তাহার পূর্ব্ব পরিচিত নামে পরিচয় দিবে। বেআদবির ভয়ে সে নাম এখানে উল্লেখ করিতে পারিল না। কিন্তু এখনও দরখাস্তকারী জানিতে পারে নাই যে কেহ সে নাম উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত করিলে হুজুর আদালতের কি ক্ষতি হইবে।"

২। "হুজুর আদালত হইতে যে নূতন অপরাধ আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা (is a crime unknown to the English Law, as well as to the codes of Law to civilized Europe, and was, till the gloss put upon it by your Court and its Mohammedan Officer, unknown to Mohammedan Law, as it is still unknown to Regulation Law—wide and sweeping as it is) কি বিলাতে কি এদেশে কেহ জানিত না—অন্যের নাম ব্যবহার করাকে গুরুতর অপরাধ করিয়া তোলা হইয়াছে, কেননা মিথ্যা কথা ব্যবহার করা গুরুতর অপরাধ। কিন্তু এ পর্য্যন্ত হলপ করিয়া মিথ্যা কথা বলা ভিন্ন অন্য মিথ্যা কথার দণ্ড কখন হয় নাই।"

৩। "এখন দরখাস্তকারী বুঝিয়াছে যে, প্রতাপচাঁদ নাম উল্লেখ করিয়া বর্দ্ধমান কি অন্য কোন মফস্বল আদালতে নালিশ করিলে আবার তাহাকে এই মিথ্যা কথার অপরাধে ফেলিয়া দণ্ড দেওয়া হইবে। সুতরাং তাহার পক্ষে দেওয়ানীর দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছে।"

৪। "এখন তাহার মানস যে একবার ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট এ বিষয়ের আপিল করে, অতএব হুজুর আদালতের অনুমতি প্রার্থনা।"

এই প্রার্থিত অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল কি না তাহা আমরা কোন কাগজপত্রে পাইলাম না। বোধ হয় দেওয়া হয় নাই, যে কারণেই হউক বিলাতেও আপিল হয় নাই।

এখানেও দেওয়ানী আদালতে আর কোন নালিশ করা হয় নাই। তাহা করিবার পক্ষে যে ব্যাঘাত নিজামতের জজেরা দিয়াছিলেন তাহা ব্যতীত আরও এক ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। যাহারা জাল রাজাকে মোকদ্দমা চালাইতে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল, তাহারা সকলেই বুঝিল যে, "গবর্ণমেণ্ট যে কোন কৌশলে হউক এ ব্যক্তিকে বর্দ্ধমানের সম্পত্তি অধিকার করিতে দিবেন না।" সুতরাং তাহারা হাত গুটাইল। জাল রাজার আশা ভরসা সকল ফুরাইল। তিনি যে সন্ন্যাসী ছিলেন, আবার সেই সন্ন্যাসী হইলেন।

২৩

সাধারণের বিচার

জজ সাহেবেরা যে যাহা বিচার করুন, বাঙ্গালিরা অনেকেই আপন আপন ঘরে বসিয়া জাল রাজা সম্বন্ধে একপ্রকার মীমাংসা করিয়া লইল। যে যাহা জানিত না, এই মোকদ্দমা উপলক্ষে তাহা সকলেই জানিয়াছিল। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিল যে "জাল রাজা সত্যই প্রতাপচাঁদ এ বিষয়ে আর কণামাত্র সন্দেহ নাই।" কেহ বলিল, "যদি এই ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ না হইবে, তবে পরাণবাবুর এত ভয় হইবে কেন? তিনি সামান্য জুয়াচোরের নিমিত্ত রাজবাটীর পূর্ব্ব সঞ্চিত সমুদয় ধন ব্যয় করিবেন কেন?*" কেহ বলিল, "যদি এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ না হইবে, তবে গবর্ণমেণ্ট ইহার

* যে সময় প্রতাপচাঁদের মোকদ্দমা চলিতেছিল সে সময় পরাণবাবু বর্দ্ধমানের রাজসংক্রান্ত অধিকাংশ জমিদারীর খাজনা নিয়মিত সময় মধ্যে দিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট সে সকল জমিদারী বিক্রয় না করিয়া তাহা কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন আনিবার জন্য দুইজন সুদক্ষ ইংরেজ কর্ম্মচারীকে কমিসনর নিযুক্ত করিয়া বর্দ্ধমানে পাঠান। লোকে বুঝিল যে, পরাণবাবু এই মোকদ্দমা উপলক্ষে রাজবাটির সমুদয় আয় ও সঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি জমিদারীর খাজনা দিতে পারেন নাই, এবং বোধ হয় সেইজন্য বিস্তর ঘুসের কথা রাষ্ট্র হইয়াছিল। এমন কি, ওগিলবি সাহেব খুনি মোকদ্দমা সময় বঙ্গে নগরে আপনার সহোদরকে পত্র লিখিয়াছিলেন, "লোকে বলে আমি তিন লক্ষ টাকা ঘুস লইয়াছি।" পত্রখানি বঙ্গের সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, সম্প্রতি আমরা তাহা দেখিতে পাইয়াছি; ইচ্ছা ছিল, পত্রখানি সমুদয় উদ্ধৃত করিয়া দিই, কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত কেবল কতকাংশ নিম্নে দেওয়া গেল—

"The lawyers of Calcutta are the natural and inveterate enemies of our service, the whole of the profession was up in arms against me. They knew not of course the right of the story, for that was an official secret. (এই কথাটি বাঙ্গালিরা অনেকেই বুঝিয়াছিলেন) * * * Besides this, all those Zemindars who were to join the pretender, and all who have lent him money (and he had contrived to raise enormous sums) have also deeply vowed to be revenged upon me,

নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়া আপন ব্যয়ে পরাণবাবুর মোকদ্দমা চালাইবেন কেন? মেজেষ্টারদের গোপনে পত্র লিখিবেন কেন? এবং এ সম্বন্ধে নানা অন্যায় কৌশল কেন? অবশ্য এ ব্যক্তির জন্য গবর্ণমেণ্টের ভয় হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে জানিতেন যে, 'প্রতাপচাঁদ মরেন নাই, রঞ্জিত সিংহের সঙ্গে মিলিয়াছেন।' রঞ্জিত স্বাপক্ষ ব্যক্তি এখন বাঙ্গালার মধ্যে বসিয়া অতুল ধন সম্পত্তি অধিকার করিলে, ভবিষ্যতে

for all their schemes and hopes of all plunder have been defeated; and these are the party who pay the expense of the proceedings against me whilst the lawyers conduct them, some of them positively acting without a fee, contrary to all professional rule and precedent, the only reward they seek is to crush me if possible. It was by no means sufficient with them to villify me in the papers as man was never before abused, but they would hang me if they could; and accordingly are trying to prove me guilty of murder. * * The public have been taught to believe that I fired upon unresisting sleeping innocents. * * * The papers have it that I am suspended but that is not the case I am required to attend in Calcutta pending this business, but I continue to draw my salary; and the Deputy Governor tells me that Govt. express no opinion one way or the other, I understand that but for a blunder the case would have been dropped long ago. To show you the spirit that is working against me I must tell you that I had notices of actions for damages in fourteen civil actions with which I was threatened; one case of false imprisonment, one of contempt of Court, and one of murder. They tried also to get up a case of bribery and corruption, swearing I had taken a consideration of three lacs of Rupees; and I was also accused of subornation of perjury. Finding they could make out no case, they have given up all but two—contempt of the Supreme Court and murder; and these they only persevere in to keep up the odium against me and the agitation while the trial of Mr. Shaw and the pretender is pending. My being in difficulty gives great weight to them as it cows all the witnesses who have to give evidence for the prosecution. * * এই শেষ কথা ওগিলবি মেজেষ্টার হইয়া আপনার সম্বন্ধে বলিয়াছেন। জাল রাজার সম্বন্ধে এ কথা আরও কত বলবৎ।

কোম্পানীর বিপদ ঘটিতে পারে। তাহাই গবর্ণমেণ্ট একপ্রকার চাতুরী করিয়া প্রতাপচাঁদকে বঞ্চিত করিলেন।" এ সকল সন্দেহ যে অমূলক তাহা বলাই বাহুল্য।

এইরূপে যে ব্যক্তি, যে কারণেই জাল রাজাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া স্থির করুন, তাঁহারা এই ঘটনা আপন আপন ধর্ম্ম বুদ্ধির সহিত মিলাইয়া একপ্রকার তৃপ্তি লাভ করিলেন। যাঁহারা ধর্ম্মভীত, তাঁহারা ভাবিলেন, "ধর্ম্ম আছেন, প্রতাপচাঁদ মহাপাপ করিয়াছিল যে, যদি আবার রাজত্ব পাইত, তাহা হইলে বলিতাম, ধর্ম্ম মিথ্যা।" আর একদল ভাবিলেন, "ধর্ম্ম মিথ্যা, কেননা, যথাশাস্ত্র চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া অজ্ঞাতবাস করিয়াও প্রতাপচাঁদ যখন রাজ্য পাইল না, তখন ধর্ম্ম মিথ্যা।"

কেহ বলিল, অদৃষ্টই মূল। সকলই অদৃষ্ট দোষে ঘটে। প্রতাপচাঁদ যে মহাপাপ করিয়াছিলেন, তাহাও অদৃষ্ট হেতু। তিনি যে আর রাজ্য পাইলেন না তাহাও অদৃষ্ট দোষে। যাহা অদৃষ্টে থাকে, তাহা কে খণ্ডাইতে পারে? যদি কোম্পানী বাহাদুর মনে করিতেন তবুও প্রতাপচাঁদকে রাজ্য দেওয়াইতে পারিতেন না। প্রতাপের অদৃষ্টে না থাকিলে কোম্পানীর মনে এ কথা আসিবেই বা কেন?"

যাঁহারা কর্ম্মফলবাদী, অর্থাৎ যাঁহারা খাঁটি হিন্দু তাঁহারা ভাবিলেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল। ইহজম্মে হউক, পূর্ব্বজম্মে হউক, প্রতাপচাঁদ অবশ্য কাহাকে বঞ্চিত করিয়া থাকিবেন, তাহাই আপনি বঞ্চিত হইলেন।"

এইরূপে সকলে এক একটা স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। যাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্মের বড় পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা বুঝিলেন "কেনা সাহেবেরা" পরাণবাবুর অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়াছেন। তৎকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজদের প্রত্যেককে ক্রয় করা যায়, প্রত্যেকে ক্রীত হইয়া থাকেন। কোন কোন নূতন সাহেবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিলে, অগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন, "ইনি কাহার সাহেব?" অর্থাৎ কাহার ক্রীত। যাঁহার "কেনা সাহেব" থাকিত, তাঁহার সম্মান বঙ্গসমাজে অতুল হইত! তিনি মনে করিলে শত্রুর প্রতি যথেচ্ছা অত্যাচার করিতে পারিতেন, "কেনা সাহেব" তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিত। সাহেব ক্রয় করার পদ্ধতির মধ্যে এইমাত্র একটু বিশেষত্ব ছিল যে, সাহেব ক্রয় করিতে বাজারে যাইতে হইত না, যে সাহেবেরা বিক্রীত হইবেন, তাঁহারা আপনার বাটীতে আসিয়া শৃংখল গলায় পরিয়া যাইতেন। তখন সাহেবদের সংসারে বিস্তর ব্যয় ছিল, একে তাঁহাদের বিলাতি দ্রব্যাদি এদেশে অতি দুর্ম্মূল্য ছিল, তাহাতে আবার তাঁহারা এক একটি ক্ষুদ্র নবাবের মত ধুমধামে থাকিতেন। তাঁহারা কোম্পানীর নিকট যে বেতন পাইতেন, তাহাতে সকল দিক কুলাইতে পারিতেন না। এইজন্য তাঁহারা কেহ কেহ বাটী হইতে টাকা আনাইতেন, কেহ কেহ বা এদেশে কর্জ্জ করিতেন। কিন্তু কর্জ্জ দুই চারিশত পরিমাণ নহে, একেবারে পঞ্চাশ হাজার, আশী হাজার, লক্ষ এইরূপ পরিমাণে লওয়া হইত। যাঁহার আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়, তাঁহার কর্জ্জ আদান প্রদান হইত। যিনি কর্জ্জ লইতেন, তিনি জানিতেন উপকার করিয়া ঋণ পরিশোধ করিব। যিনি কর্জ্জ দিতেন, তিনি জানিতেন আমি সময়ে সময়ে বিপদ

হইতে উদ্ধার হইব। তখন লোকের বিপদ পদে পদে ঘটিত। বাঙ্গালির মধ্যে আত্মীয়তা শত্রুতা উভয়ই তখন গুরুতর ছিল। এখন আর সে আত্মীয়তা নাই, সে শত্রুতাও নাই, বাঙ্গালি সমাজের স্রোত কিছু মন্দা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে একজন "কেনা সাহেব" সহায় থাকিলে বড় উপকার হইত। তাহাই ধনবানেরা বহু অর্থ কর্জ্জ দিয়া অর্থাৎ বহু অর্থ ক্ষতি করিয়া সাহেব ক্রয় করিতেন। অন্য উপায়ে কেহ কোন গুরুতর বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেও লোকে ভাবিত, এ ব্যক্তি "কেনা সাহেব" দ্বারা উদ্ধার হইয়াছে! এক্ষণকার ইংরেজ কর্ম্মচারীদের অপেক্ষা তখনকার সাহেবদের ক্ষমতা অনেক অংশে অধিক ছিল, তাঁহারা স্বপক্ষে হউক, বিপক্ষে হউক, যখনই যাহা মনে করিতেন, তখনই তাহা করিতে পারিতেন। তাহা আইনি হউক, বেআইনি হউক, সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, তাঁহারা অনায়াসে সকল কার্য্যই করিতেন। এখনকার ইংরেজ কর্ম্মচারীদের সেরূপ প্রবৃত্তি থাকিলেও ধরাধরির ভয়ে তাহা পারেন না; এখন ধরাধরির ভয়; প্রকাশের ভয়, নালিশের ভয় কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বুঝি দেশী সংবাদপত্র ইহার মূল হেতু!

"কেনা" সাহেবের কৌশলে জাল রাজার দণ্ড হইয়াছে, এ কথা যাঁহারা না বলিলেন, তাঁহারা সকল দোষ গবর্ণমেণ্টের শিরে সমর্পণ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট যে চাতুরী করিয়াছেন, অকার্য্য করিয়াছেন, অবিচার করিয়াছেন, ইহা সকলেই বলিতে লাগিলেন। যাঁহারা অদৃষ্টবাদী, যাঁহারা কর্ম্মফলবাদী, যিনি যে বাদী হউন, সকলেই এ বিষয়ে একবাক্যে গবর্ণমেণ্টকে দোষী করিলেন। প্রতাপচাঁদ পাপী, প্রতাপচাঁদের অদৃষ্টের দোষ এ কথা সত্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে এই অত্যাচার হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আর দ্বিমত থাকিল না। সুতরাং কোম্পানীর প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মিল; পাদরিদের প্রতি লোকের ভক্তি না হউক, একরূপ শ্রদ্ধা জন্মিতেছিল, তাঁহারা সত্যবাদী, এ কথা সকলেই বলিত, সে শ্রদ্ধা আর বড় থাকিল না। কালনায় যে পাদরি ছিলেন, যিনি এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাঁহাকে সে অঞ্চল ত্যাগ করিতে হইল। পূর্ব্বে লোকে যে সংখ্যায় খ্রীষ্টান হইতেছিল সে সংখ্যার যেন হ্রাস হইতে লাগিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবল হইবার একটু সূচনা দেখা দিল। অন্যের মোকদ্দমা ফুরাণ করিয়া লওয়ার রীতি বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও একটু হ্রাস পাইল। সম্প্রতি মেকলি সাহেব পিনাল কোডের খসড়া করিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে আর দুই একটি ধারা সন্নিবেশিত হইল। এবং সেই কার্য্যবিধি আইনের সূত্রপাত হইল।

২৪

জাল রাজা ধর্ম্মপ্রণেতা

মোকদ্দমা ফুরাইল। জাল রাজা দেওয়ানীতে নালিশ করিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ সঙ্গতি নাই, দ্বিতীয়তঃ তথায় প্রতাপচাঁদ বলিয়া নালিশ করিলে আবার জেলে যাইতে হইবে। সুতরাং নিরস্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া কলিকাতায় বসিয়া থাকিলেন।

পূর্ব্বে যাঁরা বিশেষ স্বাপক্ষতা করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহ কেহ একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "কি জানি, গবর্ণমেণ্টের যে গতিক দেখিতেছি, আর সাহস হয় না।" কেহ বা সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া প্রকাশ্যে জাল রাজার সহিত আত্মীয়তা রাখিলেন, জাল রাজা তাঁহাদের নিষেধ করিতেন, কিন্তু তাঁহারা শুনিতেন না। তাঁহাদের যত্নে জাল রাজার অন্নকষ্ট—কোন কষ্টই ছিল না, ধনবানের ন্যায় সুখে স্বচ্ছন্দে তিনি দিনযাপন করিতেন।

প্রথমে তিনি কিছু দিন কলিকাতায় চাঁপাতলায় ছিলেন, তাহার পর কলুটোলায় গোবিন্দ প্রামাণিকের বাটীতে দুই তিন মাস থাকেন। তাঁহার নিমিত্ত গোবিন্দবাবু আপনার সর্ব্বস্ব ব্যয় করেন, সে ব্যক্তির একান্ত ধারণা ছিল যে, জাল রাজা সত্যই প্রতাপচাঁদ।

কলুটোলা হইতে জাল রাজা শ্যামপুকুরে গিয়া থাকিলেন। কিছু দিন পরে লাহোরের লড়াই উপস্থিত হইল। এই সময় জাল রাজার প্রতি গবর্ণমেণ্টের আবার দৃষ্টি পড়ে। গতিক বুঝিয়া তিনি কোম্পানীর রাজ্য হইতে পলাইয়া প্রথমে চন্দন-নগরে বোড়াইচণ্ডীতলায় ফরাসিস্ আশ্রয়ে কয়েক বৎসর থাকিলেন, তাহার পর শ্রীরামপুর যান। শ্রীরামপুর তখন কোম্পানীর রাজ্য হয় নাই। সেখানে প্রায় ছয় সাত বৎসর ছিলেন। এই সময় শ্রীরামপুরে আমাদের যাতায়াত ছিল। শুনিতাম তিনি তথায় ঠাকুর সাজিয়া দিনযাপন করিতেন। নিত্য সন্ধ্যার সময় বেশ্যারা এক এক পঞ্চপ্রদীপ আর ঘণ্টা লইয়া সকলে একত্রে তাঁহাকে আরতি করিত, তিনি ঠাকুরের মত সিংহাসনে বসিয়া দীপের নৃত্য দেখিতেন। লোকে বলে সে সময় বড় সমারোহ হইত।

এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অনেকে বিবেচনা করিত যে, জাল রাজার বুদ্ধির একটু গোলমাল হইয়াছে। তিনি সত্যই প্রতাপচাঁদ হইলে এই দুর্ঘটনার পর তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার মতিভ্রম হয় নাই। যাহারা তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, কথায় বার্ত্তায় কখন তাঁহার ভ্রান্তি বুঝা যায় নাই। বরং তখন তাঁহাকে অসাধারণ বুদ্ধিমান ও সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া বোধ হইত। তিনি তৎসাময়িক, কি ইংরেজি, কি বাঙ্গালা—সমুদয় সংবাদপত্র নিত্য পাঠ করিতেন, যাঁহারা সে সময় উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে ফরাসিস্ politics রুস-দেশীয় রাজনীতি, পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতেন। কেহ কেহ বলেন, বিলাতী রাজনীতিতে (European politics) তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। আরও শুনা যায়, তিনি রুসীয় রাজনীতি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বুঝিতেন এবং সেই দেশের কিছু পক্ষপাতীও ছিলেন। এদিকে, বেদান্তশাস্ত্রে তিনি বড় পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীরামপুরে থাকিবার সময় দুই একজন অধ্যাপক তাঁহার নিকট বেদান্তের কথা শুনিতে যাইতেন। সুতরাং এ অবস্থায় বলা যায় না যে, তাঁহার কোন প্রকার চিত্তবৈকল্য জন্মিয়াছিল। অথচ, আবার দেখা যায়, তিনি শালগ্রামশিলার ন্যায় ঝারায় বসিয়া থাকিতেন, লোকের

সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি লইতেন, পূজা গ্রহণ করিতেন, বৈকালি খাইতেন। তখন তাঁহার প্রকৃত অভিসন্ধি কেহ বুঝে নাই।

যাহারা তাঁহার পূজা করিতে আসিত, তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক, পুরুষের দলও নিতান্ত অল্প নহে। অনেকগুলি বাবাজি তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিত। বোধ হয় তাহাদের দ্বারাই জাল রাজার অমানসিক শক্তি দেশ বিদেশ রাষ্ট্র হইত। স্ত্রীলোকদের ধারণা হইয়াছিল, যে 'এ ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেবতা'। অনেকে তাঁহাকে গৌরাঙ্গদেব মনে করিত।

শুনিতে পাওয়া যায় যোগীদের ন্যায় তাঁহার দুই এক বিষয়ে আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। কেহ অনুভব করেন প্রতাপচাঁদ যখন হিমালয় অঞ্চলে যোগীদের সঙ্গে বেড়াইতেন, তখন এ বিষয় কিছু শিখিয়া থাকিবেন। কেহ বলেন যে হটযোগ তাঁহার বিলক্ষণ অভ্যাস ছিল। সেই কারণে লোকে তাঁহাকে মহাপুরুষ মনে করিত। হটযোগ অভ্যাস থাকিলে, বিলক্ষণ "বুজরুগি" দেখান যায় সত্য। যতদূর শুনা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয়, তিনি বৌদ্ধমতে কিছু যোগ শিক্ষা করিয়া থাকিবেন, তান্ত্রিকমতে যোগ অভ্যাস করা বড় কঠিন। বৌদ্ধমতের যোগ অপেক্ষাকৃত সহজ, যত্ন করিলে কতকটা অভ্যাস হয়। বোধ হয় সেই জন্য এখন বৌদ্ধ যোগীই অধিক। আমরা বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম স্বতন্ত্র বলি, অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। বিষ্ণু উপাসনা, শক্তি উপাসনা উভয়ই হিন্দুধর্ম্মের যেরূপ শাখা, বৌদ্ধধর্ম্মও সেইরূপ। বেদান্তের গ্রন্থি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের হাড়ে হাড়ে আছে, বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থার দুই একখানা গ্রন্থ, আর আমাদের তন্ত্র একইরূপ ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা কর্ম্মফলবাদি; এবং কর্ম্মফল যে মানে তাহাকেই হিন্দু বলি। বৈষ্ণব শক্তির মধ্যে আর পূর্ব্বতম বিচ্ছেদ নাই, উভয়েই হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন। আর কিছু দিন পরে হয় ত ভারতীয় বৌদ্ধেরা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবেন। বৌদ্ধদের সঙ্গে হিন্দুর আর বিচ্ছেদ না থাকিবার সূত্রপাত পূর্ব্বে কতক আরম্ভ হইয়াছিল। বৌদ্ধদের দন্তযাত্রা এখন হিন্দুদের রথযাত্রা, উভয় উৎসব প্রায় এক হইয়া গিয়াছে। হিন্দুদের কোন শাস্ত্রে, কোন গ্রন্থে রথযাত্রার উল্লেখ নাই। ইদানীং উৎকলখণ্ড বলিয়া পুরাণের এক অংশ নূতন প্রস্তুত হইয়াছে, কেবল তাহাতেই রথের কথা দেখা যায়। উৎকলের যে দেবতাকে হিন্দুরা জগন্নাথ বলিয়া পূজা করিতেছেন, যাঁহার প্রসাদ ব্রাহ্মণ, বাগ্দী একত্রে আহার করিয়া, হিন্দু আচার পবিত্র করিতেছেন, সে দেবতা মূলে বৌদ্ধদের। পুরীতে তাহাদের দন্তযাত্রা হইত। সিংহলিরা সে দন্ত লইয়া পলাইয়াছে, হিন্দুরা দন্তযাত্রার রথ লইয়াছে, ঠাকুর লইয়াছে, আচার পর্য্যন্ত লইয়াছে। বৌদ্ধ আচার এ স্থলে হিন্দু আচার হইয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থানে বৌদ্ধমূর্ত্তি শিবমূর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত আর কিছুই হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি যাহাদের বিদ্বেষ ছিল, তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম কাহাকে বলে জানিতেন, তাহাদের স্বতন্ত্র ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাঁহারা বুঝিতেন, এখনকার হিন্দুরা তাহা জানেন না, বুঝেনও না। সুতরাং তাঁহাদের

বিদ্বেষভাব আর ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্ভব নহে, কেবল নাম সম্বন্ধে সম্ভব। আচার, ব্যবহার, উপাসনা দেখিয়া এখন যাহাদের সহিত আমরা মিলিয়া থাকি, তাহাদের বৌদ্ধ নাম শুনিলে হয় ত আর তাহাদের সহিত মিলি না। বৌদ্ধ নামের প্রতি আক্রোশ আছে, বৌদ্ধধর্মের প্রতি আর তত নাই, সুতরাং বৌদ্ধনাম না জানিলে, অনেকেই এখন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন, অনেকে হয় ত তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। শুনা যায়, এখন বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকে বৌদ্ধ, কিন্তু তাঁহারা তাহা জানেন না। এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা আচার ব্যবহারে অনেকটা হিন্দুদের মত। তাঁহারা হিন্দু বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। হিন্দুরাও সেই বৌদ্ধদের হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করেন। আমাদের জাল রাজা বোধ হয় এইরূপ কোন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ছিলেন। প্রথমে ছিলেন না, পরে হইয়া থাকিবেন। জাল রাজাকে বৌদ্ধ স্থির করিলে তাঁহার শেষ অবস্থার কার্য্য অনেকটা বুঝা যায়। তিনি অনেক লোককে মন্ত্রশিষ্য করিয়াছিলেন, এমন কি পাঞ্জাবী ও অপর হিন্দুস্থানী পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার অন্য চেলার সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না, স্ত্রীলোক শিষ্যার ত কথাই নাই। বারগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইতেন। দূরস্থ পল্লিগ্রামে গিয়া অতি গোপনে স্ত্রীলোকদের মন্ত্র দিয়া আসিতেন। তিনি যে মন্ত্র দিতেন তাহা বিষ্ণুমন্ত্র নহে, শক্তিমন্ত্রও নহে। তাঁহার দীক্ষাপ্রণালী অর্চ্চনা পদ্ধতি নূতন প্রকার। অদ্যাপি তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা মন্ত্র দিয়া বেড়ান। স্থানে স্থানে লোকে তাঁহাদের ঘোষপাড়ার দল বলিয়া জানে।

এই নূতন ধর্ম্মটি ক্রমে বিস্তার হইতেছে। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা জাল রাজা শিষ্যর সংখ্যা বোধ হয় এখন বহু গুণে অধিক।

অদ্যাপি লোকে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে কিন্তু কেহই জানে না যে, জাল রাজার প্রণীত ধর্ম্মে তাহারা উপদিষ্ট হইতেছে। শিষ্যদের মধ্যে জাল রাজার স্বতন্ত্র নাম 'সত্যনাথ'।

২৫

জাল রাজার মৃত্যু

জাল রাজার মূর্ত্তি বড় প্রশান্ত ছিল, যে দেখিয়াছে সেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছে। সে মূর্ত্তি ক্ষুদ্রচেতা জুয়াচোরদের নহে। গল্প আছে, তিনি একবার কোন পল্লীগ্রামে শিষ্যাদের দেখিতে গিয়া একটি গৃহস্থের বাটীতে গোপনে অবস্থিত করিতেছিলেন, সে বাটীতে কেহ পুরুষ থাকিত না, শিষ্যারা সকলেই তথায় গোপনে গুরুদর্শনে আসিত। গ্রামস্থ লোকেরা পূর্ব্বে শুনিয়াছিল যে, একজন বদ্মায়েস মধ্যে মধ্যে গ্রামে আসিয়া অভিভাবকশূন্য স্ত্রীলোকদের লইয়া রঙ্গরস করিয়া যায়। সেইজন্য তাহারা সঙ্কল্প করিয়াছিল যে, সে বদ্মায়েসকে একবার ধরিতে পারিলে তাহার অস্থি চূর্ণ করিবে। এখন সে সময় উপস্থিত হইল। "বদমায়েসের" সন্ধান পাইয়া তাহারা রাত্রিকালে আট

দশ জন হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইল। প্রভু তখন শিষ্যা পরিবেষ্টিত হইয়া নবধর্ম্মানুশীলন করিতেছিলেন। গ্রামস্থ লোকেরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া গেল। তিনি কোন আপত্তি করিলেন না। তাহার পর, যখন তাহারা অভীষ্ট স্থানে তাঁহাকে লইয়া ফেলিল, তখন তাঁহাকে প্রহার করা দূরে থাকুক, কেহ কোন রূঢ় কথাও বলিতে পারিল না। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া সকলের শ্রদ্ধা হইল।

ইদানীং তিনি ঈষৎ স্থূলকায় হইয়াছিলেন। মোকদ্দমার সময় তাঁহার বর্ণ শ্যাম বলিয়া বোধ হইত ; কিন্তু পরে সেই শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহার চক্ষু এরূপ ছিল যে, তাঁহাকে দেখিতে গেলে প্রথমেই তাঁহার চক্ষের প্রতি দৃষ্টি পড়িত ; অথচ সে চক্ষুতে প্রখরতা মাত্র ছিল না।

তিনি সকলকেই মিষ্ট কথা কহিতেন, মিষ্ট কথাই তাঁহার বশীকরণ মন্ত্র ছিল।

মৃত্যুর আট দশ মাস পূর্ব্বে তিনি কলিকাতার উত্তরে বরাহনগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দৈহিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না। অর্থেরও কিছু অনটন হইয়া থাকিবে, কেন না, বাটীর ভাড়া একেবারে দিতে পারেন নাই। এই সময়ে বোধ হয়, তিনি নিজ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেন, তাহাই আপনাকে একা বলিয়া ভাবিতেন। একা আর থাকিতে পারিতেন না, একা থাকিতে তাঁহার বড়ই কষ্ট হইত। মধ্যে মধ্যে তিনি গ্রামের ভদ্রলোকদের আহ্বান করিতেন, কেহ বা আসিতেন, কেহ বা আসিতেন না। যাঁহারা আসিতেন কাতরভাবে তাঁহাদের বলিতেন, আমি আর একা থাকিতে পারি না, আপনাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে যেন সুখে থাকি।

এই প্রকার অবস্থায় তিনি ১৮৫২ সালে কি ৫৩ সালের প্রথমে ময়রাডাঙ্গা পল্লীতে একটি সামান্য বাটীতে সামান্য দুই তিনটি লোক পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।[৮৭] তাঁহার যাত্রার সময় চক্ষের জল মুছিবার কেহ ছিল না।

তাঁহাকে প্রতাপচাঁদ মনে করিলে তাঁহার এই শেষ অবস্থার নিমিত্ত চক্ষে জল আইসে। পরের দোষে তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, এইজন্য আরও কষ্ট হয়।

তাঁহাকে জাল রাজা মনে করিলেও তাঁহার প্রতি রাগ থাকে না ; তিনি যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছিলেন।

তিনি প্রতাপচাঁদ হউন, আর জাল রাজাই হউন, অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি হাস্যমুখে সেই কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এইজন্য আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি।

পাদটীকা :

১। লাহোর নিবাসী কাশীনাথ কাপুর মহারাজা তেজচন্দ্রের আমলে জগন্নাথধাম দর্শনের পথে বর্ধমানে আগমন করেন এবং পরবর্তীকালে এই শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলকুমারীর অসামান্য রূপলাবণ্যে মোহিত হয়ে

তেজচন্দ্র তাঁকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে কাপুর পরিবারের সামাজিক ও আর্থিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

২। ওড়িষা প্রদেশের পুরী শহরটি নীলাচল বা জগন্নাথক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই তীর্থক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত আছেন এবং দেশদেশান্তর হতে এই তীর্থ দর্শনের নিমিত্ত বহু লোক এখানে আসেন।

৩। পাকিস্তানের অন্তর্গত লাহোর জেলার সদর শহর। অসংখ্য ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হল অতীতের লাহোর শহর। বর্ধমান রাজাদের পূর্বপুরুষগণ লাহোরের অধিবাসী ছিলেন এবং পারিবারিকসূত্রে লাহোরের বহু ব্যক্তি বর্ধমানে আগমন করেন এবং বংশপরম্পরায় এখনও বর্ধমানে বসবাস করছেন।

৪। কাশীনাথ কাপুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও পরাণচাঁদ কাপুরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী কমলকুমারীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে মহারাজা তেজচন্দ্র তাঁকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফল-স্বরূপ তেজচন্দ্রের মৃত্যুর পর পরাণচাঁদ ও কমলকুমারী বর্ধমান জমিদারীর সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন।

৫। পরাণচাঁদ কাপুর ছিলেন কাশীনাথ কাপুরের একমাত্র পুত্র। বাংলা ১১৮৮ সালের ২৪শে মাঘ পরাণচাঁদের জন্ম হয়। মহারাণী বিষণকুমারীর মৃত্যুর পর কমলকুমারীর সঙ্গে তেজচন্দ্রের বিবাহ হয় এবং কমলকুমারীর সহযোগিতায় পরাণচাঁদ বর্ধমান জমিদারীর দেওয়ানপদে নিযুক্ত হন। প্রতাপচাঁদের গৃহত্যাগের পর তেজচন্দ্র তাঁর হস্তের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিলেন। স্বীয় ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর এগার বৎসরের কন্যা বসন্তকুমারীর সঙ্গে তেজচন্দ্রের বিবাহ দেন। পরাণচাঁদের ষড়যন্ত্রের ফলে তেজচন্দ্রের একমাত্র পুত্র প্রতাপচাঁদ গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং গৃহত্যাগী রাজকুমারকে মৃত প্রতিপন্ন করে স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র চুনীলালকে তেজচন্দ্রের দত্তক পুত্ররূপে স্বীকৃতি নিতে বাধ্য করান। চুনীলালই মহারাজাধিরাজ মহতাব্‌চাঁদ বাহাদুর নামে প্রসিদ্ধ। প্রতাপচাঁদের গৃহত্যাগের পর বৃদ্ধ তেজচন্দ্রের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত 'হরিহর মঙ্গল' নামে একখানি অশ্লীল কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। পরাণচাঁদের দুই পত্নীর গর্ভে চার পুত্র ও চার কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বাংলা ১২৫১ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ তাঁর মৃত্যু হয়।

৬। একপ্রকার তাসের জুয়াখেলা।

৭। মহারাজা তেজচন্দ্র আটটি বিবাহ করেন।

৮। কুমার প্রতাপচাঁদ--মহারাজা তেজচন্দ্রের রাণী নানকি কুমারীর গর্ভজাত একমাত্র জীবিত সন্তান প্রতাপচাঁদ রায় এবং আলোচ্য উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র। (বিষদ পরিচয়—বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস)।

৯। রাজা ত্রিলোকচাঁদের দ্বিতীয়া পত্নী এবং মহারাজা তেজচন্দ্রের জননী যাঁর অসামান্য বুদ্ধিমত্তার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস ও নবকৃষ্ণ মুন্সীর হাত হতে বর্ধমান

জমিদারী রক্ষা পেয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর অংশের সম্পত্তি একমাত্র নাবালক পৌত্র প্রতাপচাঁদকে দান করেন।

১০। লেখকের এই উক্তিটি অবিচারের নামান্তর। কারণ প্রতাপচাঁদের পিতামহী মহারাণী বিষণকুমারীর (পিতামহ—রাজা ত্রিলোকচাঁদ) মৃত্যুর সময় প্রতাপচাঁদের বয়স ছিল মাত্র সাত বৎসর।

১১। সিবিল সার্বেণ্ট—Civil Servant.

১২।.. মেজেষ্টার—Magistrate.

১৩। সমগ্র বর্ধমান জমিদারীটি কুক্ষিগত করার লোভে পরাণচাঁদ তাঁর এগার বছরের কন্যা বসন্তকুমারীর সঙ্গে ৬৩ বৎসরের বৃদ্ধ তেজচন্দ্রের বিবাহ দেন। এই বিবাহের ফলে পরাণচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র চুনীলালকে তেজচন্দ্রের দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু এই বিবাহের ফল ছিল অত্যন্ত বিষময়। কারণ পরবর্তীকালে বসন্তকুমারী রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। (বিশেষ বিবরণ রাজবংশের ইতিহাস।)

১৪। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাকী খাজনার দায়ে বর্ধমান সহ বঙ্গদেশের প্রধান জমিদারীগুলির অন্তর্ভুক্ত মহল / পরগণা সকল একের পর এক নিলাম-বিক্রি হতে শুরু হয়। জমিদারী রক্ষার্থে বর্ধমান জমিদারীর মালিক খাজনা ইজারা দেওয়ার কথা চিন্তা করে কোম্পানির বিনা অনুমতিতে পত্তনী প্রথা চালু করেন। পত্তনী প্রথা উদ্ভাবনের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে এটা আইনে পরিণত হয়, যা ঐ আইনের মুখবন্ধে বর্ণিত আছে। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের ৮নং রেগুলেশন-বলে পত্তনীতালুক রেগুলেশন বিধিবদ্ধ হয়। ৮নং রেগুলেশন-এ বর্ণিত খাজনা উশুলের শেষ দিনটিকে 'অষ্টম' নামে অভিহিত করা হত এবং অষ্টমের মধ্যে খাজনা জমা না দিলে জমিদারী বা পত্তনীতালুক নিলামে উঠত।

১৫। জমিদার স্বয়ং প্রজার নিকট হতে খাজনা আদায় না করে অধঃস্তন মধ্যস্বত্বভোগী মারফৎ মহল বা তালুকের খাজনা আদায় করার প্রথাটি পত্তনি নামে অভিহিত হত। খাজনা আদায়কারী মধ্যস্বত্বভোগীকে পত্তনীদার বা দরপত্তনীদার বলা হয়। মূল জমিদারের সঙ্গে প্রজার কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। পত্তনী আইনের মুখবন্ধটি হল,—"Furthermore, in the exercise of the privilege thus conceded to Zemindars under direct engagements with Government, there has been created a tenure which had its origin on the eastates of the Raja of Burdwan, but has since been extended to other Zemindaries."

১৬। গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে কোম্পানির ডিরেক্টারবর্গের পরামর্শে বাংলার জমিদারগণের সঙ্গে স্থায়ী রাজস্ব বন্দোবস্তের জন্য ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মার্চ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন (Reg. I of 1793) কার্যকারী হয়। এই

আইনের একটি ধারার বলে প্রজাকে জমির উপর সকল ক্ষমতা হতে অধিকারচ্যুত করা হয় এবং রাজস্ব আদায়কারী জমিদারগণ জমির প্রকৃত মালিকে পরিণত হলেন।

১৭। কাশিমবাজারের জমিদার রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দী কান্তবাবুর পৌত্র হরনাথের পুত্র অত্যন্ত রূপবান সুপুরুষ ছিলেন। কৃষ্ণনাথের মাতার নাম হরসুন্দরী। কৃষ্ণনাথ ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে কাশিমবাজারের জমিদারী লাভ করেন। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান জেলার ভাটাকুল গ্রামের স্বর্ণময়ীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। একটি ফৌজদারী মামলা হতে অব্যাহতি লাভের জন্য ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর তিনি আত্মহত্যা করেন।

১৮। বারদুয়ারী বা দ্বাদশ তোরণ। বর্ধমান শহরের পশ্চিমভাগে বাঁকা নদী, রথতলা ও দামোদরের খাল অতিক্রম করে কাঞ্চননগরের উত্তর অংশের একটি পাকা সড়ক ধরে বারদুয়ারীতে পৌছান যায়। বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদ রায় তাঁর পিতামহ কৃষ্ণরাম রায়ের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ বিষ্ণুপুর রাজ্য অধিকার করেন এবং বিষ্ণুপুর জয়ের পর বিজয়োৎসব পালনার্থে বারটি তোরণ নির্মাণ করেন। বর্তমানে একটি মাত্র তোরণ অবশিষ্ট আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে মহতাব্ মঞ্জিল নির্মাণের পূর্বে বর্ধমানের রাজারা কাঞ্চনপল্লীতে বসবাস করতেন। প্রতাপচাঁদের উক্তিতে একথাব সমর্থন পাওয়া যায়।

১৯। নীলপুর—বর্ধমান শহরের দক্ষিণ-পূর্ব ভাগের পল্লীটি নীলপুর নামে পরিচিত।

২০। হেয়ার সাহেব—স্কটল্যাণ্ড নিবাসী ডেভিড হেয়ার (১৭. ২. ১৭৭৫—১. ৬. ১৮৪২) এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম পথিকৃৎ। ১৮ বৎসর বয়সে ঘড়ি ব্যবসায়ীরূপে তিনি কলিকাতায় আসেন। কিছুকাল পরে তাঁর সহকারী গ্রে সাহেবকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি দান করে নিজেকে এদেশে শিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত করেন। প্রতাপচাঁদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সখ্যতা ছিল এবং মামলার সাক্ষ্য প্রদানকালে হেয়ার সাহেব কর্তৃক প্রতাপচাঁদের দূরবীন মেরামতের কথা জানা যায়।

২১। প্রতাপচাঁদের দুই স্ত্রী। যথা—প্যারীকুমারী ও আনন্দকুমারী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, আনন্দকুমারী ছিলেন পরাণচাঁদ কাপুরের ভগিনী কন্যা (ভাগ্নী)। 'প্রতাপচন্দ্র লীলারস প্রসঙ্গ সঙ্গীত'-এ আছে যে, অজ্ঞাতবাসের সময় তিনি রণজিত সিংহের দেওয়ান সুদয়াল সিংহের কন্যা রজনকুমারীকে বিবাহ করেন এবং রজনকুমারীর গর্ভে মূলকচন্দ্র নামে এক পুত্র জন্মে। ঐ গ্রন্থে আরও উল্লেখ আছে যে, বর্ধমানে প্রত্যাবর্তনের পথে গয়ায় প্যারীকুমারীর সঙ্গে প্রতাপচাঁদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল ; সেকারণে তিনি গয়ায় প্রতাপচাঁদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করেন নাই।

২২। রাজা ত্রিলোকচাঁদ রায় ও মহারাণী বিষণকুমারীর একমাত্র পুত্র ও কুমার প্রতাপ-

চাঁদের পিতা মহারাজা তেজচন্দ্র রায় বর্ধমানের ন্যায় বিশাল জমিদারীর মালিক হয়েও অবিমিশ্রকারিতা ও বহুবিবাহের ফলে পারিবারিক জীবনে চরম অশান্তির মধ্যে কাল কাটিয়েছিলেন। (বিশেষ দ্রষ্টব্য—রাজবংশের ইতিহাস)।

২৩। লেখক প্রতাপচাঁদ ও তেজচন্দ্রের সমাজের উল্লেখ করলেও কালনায় শিলালিপিসহ তেজচন্দ্রের সমাজগৃহ বর্তমান থাকলেও প্রতাপচাঁদের স্মরণার্থে কোন সমাজের অস্তিত্ব নাই। শিলালিপি হতে আরও জানা যায় যে, মহারাজা মহতাব্‌চাঁদের আমলে মহারাজা তেজচন্দ্রের পঞ্চম রাণী কমলকুমারী কতৃক তেজচন্দ্রের সমাজগৃহ নির্মিত হয়েছিল। কেবলমাত্র প্রতাপচাঁদের নামে বর্ধমান ও কালনা শহরে 'প্রতাপেশ্বর' শিবমন্দির ও শক্তিগড়ে রাধাবল্লভ মন্দিরে "রাজাধীশ প্রতাপচন্দ্র মহিষী প্যারীকুমারী" উল্লেখ পাওয়া যায়।

২৪। পরাণচাঁদের সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম কুঞ্জবেহারী বা নারায়ণবেহারী নয়। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল চুনীলাল। চুনীলালকে তেজচন্দ্রের অনুমতিতে মহারাণী কমলকুমারী দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন এবং রাজগদী লাভের পর তিনি মহারাজাধিরাজ মহাতব্‌চাঁদ (১৮২০-৭৯) নামে পরিচিত হন (পরাণচাঁদ কাপুরের বংশতালিকা দ্রষ্টব্য)।

২৫। বর্ধমান শহরের উত্তর-পশ্চিম ভাগে তারাবাগ নামক উদ্যানের সন্নিকটে হ্রদতুল্য এক সুবিশাল দীঘি। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বর্ধমানের জমিদার কৃষ্ণরাম রায় এই বিশাল সায়র বা দীর্ঘিকা খনন করান। ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণরামের একমাত্র পুত্র জগৎরাম স্নান করার সময় এইখানেই ছুরিকাহত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

২৬। বর্ধমান রেলস্টেশন হতে নবাবহাটের পথে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দক্ষিণস্থ রমণীয় এক সুবিশাল উদ্যান। বর্তমানে এই রমণীয় উদ্যানের কোন চিহ্ন মাত্র নাই। এখানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায়তন ও বনবিভাগের দপ্তর আছে।

২৭। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত মহকুমা সদর কার্যালয়। অতীতে বিষ্ণুপুর ছিল মল্লরাজাদের রাজধানী শহর। আটটি সুবৃহৎ জলাশয়, দলমাদল কামান, নগরদেবতা মদনমোহন ও বিভিন্ন স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত এবং টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত মন্দিররাজির জন্য বিষ্ণুপুরের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে।

২৮। বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিংহের চতুর্থ পুত্র দ্বিতীয় ক্ষেত্রমোহন সিংহ ছিলেন বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দাসের জমিদার।

২৯। মানভূমের বিদ্রোহ—জঙ্গলমহলের অন্তর্গত বরাভূম পরগণার জমিদার রাজা গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ১৮৩৩-৩৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে শেষবারের মত বিদ্রোহ ঘোষণা করে পরাজিত হন। সঞ্জীবচন্দ্রের সময় এই অঞ্চলটি মানভূম জেলায় পরিণত হয়। গঙ্গানারায়ণ ও কোম্পানির সংঘর্ষ চলাকালে প্রতাপচাঁদ বর্ধমানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বর্ধমান হতে বাঁকুড়া

জেলায় চলে যেতে বাধ্য হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশ বরাভূম পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩০। জামিনদারের নগদ অর্থ মেটানোর দায়িত্ব।

৩১। পাথুরিয়াঘাটার বৈষ্ণবদাস শেঠের পৌত্র রাধাকৃষ্ণ বসাক কলিকাতার সাব-ট্রেজারারের দেওয়ান ছিলেন। রাজা প্রতাপচাঁদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল এবং মামলা চলাকালীন প্রতাপচাঁদকে ২০/২৫ হাজার টাকা কর্জ দেন। ফলে তাঁর আর্থিক অনটন হয় এবং তদুপরি পুত্র দয়ালচাঁদ-এর জন্য ট্রেজারী হতে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অর্থগ্রহণ করে শেষ জীবনে দুর্ভাগ্যের শিকার হন। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

৩২। মহাতব্‌চাঁদ—রাজবংশের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

৩৩। 'কাপুর' উপাধির অপভ্রংশ।

৩৪। সিঙ্গুরের জমিদার শ্রীনাথ রায় ছিলেন দ্বারিকানাথের চতুর্থ পুত্র। প্রতিপত্তির জন্য তিনি নবাববাবু নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। শ্রীনাথ রায় ডাকাতদের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন বলে কোম্পানির সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল না।

৩৫। জেমস্ বেলফোর ওগলবি।

৩৬। শীলমোহর লাগান।

৩৭। কালনার বাজার হতে বাম দিকে আগাইয়া গেলে পাথুরিয়া মহল ঘাটে পৌছান যায়।

৩৮। ব্যাণ্ডেল রেলষ্টেশন হতে ৩০ কিলোমিটার পশ্চিমে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া থানার অধীনস্থ একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

৩৯। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র নরহরিচন্দ্র রায় হরধামের জমিদার ছিলেন।

৪০। রাণাঘাটের ৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে চুর্ণী নদীর উভয় তীরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র হরধাম ও আনন্দধাম নামক দুটি গ্রাম-পত্তন করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (ছোট রাণীর একমাত্র পুত্র) শম্ভুচন্দ্রের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে কৃষ্ণনগর ত্যাগপূর্বক হরধামে বসবাস শুরু করেন এবং হরধাম নদীয়া জমিদারীর অন্তর্গত একটি উল্লেখযোগ্য স্থানে পরিণত হয়।

৪১। ভাগীরথীর উত্তর ও পূর্ব ভাগে তিন দিক নদীখাত পরিবেষ্টিত নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর থানার সদর কার্যালয়। শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের শ্রীপাট, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মস্থান ও শ্রীচৈতন্যদেবের আগমনে শান্তিরূপ একটি বৈষ্ণব তীর্থস্থান রূপে বিখ্যাত।

৪২। নথিপত্র।

৪৩। সুপ্রিম কোর্টের এটর্নি ও জাল প্রতাপচাঁদ মামলায় প্রতাপচাঁদের পক্ষের প্রধান উকিল।

৪৪। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হুগলী জেলার বলাগড় থানার অধীনস্থ একটি গ্রাম। বেহুলা রেলষ্টেশন হতে পাইগাছিতে যাওয়া যায়।

৪৫। হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত বেলকুলি গ্রামের অবস্থিতি হল চন্দননগর রেলষ্টেশন হতে ২ কিলোমিটার পশ্চিমে।

৪৬। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার সদর শহর। বিহার রাজ্যে জাহানাবাদ নামে অপর একটি মহকুমা শহরের অস্তিত্ব থাকায় ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে জাহানাবাদের নাম পরিবর্তন করে আরামবাগ রাখা হয়।

৪৭। হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া থানার অধীনস্থ বৈঁচি রেলষ্টেশন হতে ৬ কিলোমিটার উত্তরে এবং বেহুলা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিতি হল বল্লালদিঘি গ্রামের।

৪৮। কলিকাতা নিবাসী মুলুকচাঁদ ক্ষেত্রি ছিলেন একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও গোঁড়া হিন্দু। প্রত্যহ গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত এই নিষ্ঠাবান ব্যক্তি কলিকাতায় বসবাস শুরু করেন। তাঁর প্রপৌত্র দামোদর দাস মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার জমিদার ক্রয় করে সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

৪৯। ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত রাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাটরূপে বৈষ্ণব সাহিত্যে পানিহাটির খ্যাতি প্রায় ৫০০ বছর ধরে চলে আসছে। এই স্থানেই রঘুনাথ দাস —গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ দণ্ডমহোৎসব করিয়েছিলেন।

৫০। জয়নারায়ণ চন্দ্র—সা সাহেবের কোর্ট ক্লার্ক।

৫১। উচ্চ আদালতের, সংবিধানের বিশেষ ক্ষমতা বলে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ অন্যায়ভাবে আটক বা বন্দীকরণের প্রতিষেধ সমেত আজ্ঞালেখ প্রচারের ক্ষমতা।

৫২। Ensign—বৃটিশ পদাতিক বাহিনীর নিম্ন পদমর্যাদার অফিসার।

৫৩। ই. এ. সামুয়েল—হুগলী জেলার অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেট।

৫৪। হুগলী জেলার সরস্বতী-ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত মোগল আমলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি ছিল নয়াসরাই-এ। এক প্রাচীন পথ ধরে হুগলী হতে ত্রিবেণী-নয়াসরাই-কালনা-নবদ্বীপ ও কাটোয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল।

৫৫। গোয়াড়ি—নদীয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগরে উত্তরস্থ পল্লী। কৃষ্ণনগর নামে আরও কয়েকটি স্থান আছে—সে কারণে এই শহরটি গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর নামে পরিচিত।

৫৬। দ্বারিকানাথ ঠাকুর—কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, তাঁর পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৭৯৪-১৮৪৬)। ও কনিষ্ঠ পৌত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ স্বনামেই বিখ্যাত ছিলেন। সেকালে দ্বারকানাথ বাঙ্গালী ব্যবসায়ী হিসাবে অগ্রগণ্য ছিলেন। এছাড়া আইন ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। জনশ্রুতি যে, দ্বারকানাথ জাল প্রতাপচাঁদ মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য পরাণবাবু ও মহতাবচাঁদের নিকট প্রচুর অর্থ লাভ করেছিলেন।

৫৭। রাজা বৈদ্যনাথ--পাথুরিয়াঘাটার জমিদার রাজা সুখময় রায়ের মধ্যম পুত্র রাজা বৈদ্যনাথ রায়।

৫৮। উনবিংশ শতকের বিখ্যাত ইংরাজী সংবাদপত্র।

৫৯। বিখ্যাত ইংরাজ চিত্রকর জর্জ চিনারী ১৮০২ সাল হতে ১৮২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতায় বসবাস করেন এবং ভারতবর্ষ ও চীনদেশে ৫০ বৎসর কাল অবস্থানের পর মাকাও শহরে ইহলোক ত্যাগ করেন। চিনারী সাহেব বহু দেশী ও বিদেশী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তৈলচিত্র অঙ্কন করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। চিনারী ব্যতীত টিলি কেটলে, হিকি, জোফানি, হোজেস, ডানিয়েল এটকিনসন, ফিয়েবিগ, লেফঃ জাম্প, ওরমে, স্যার চারলস্, ডি' ওলি প্রমুখ চিত্রকরগণের এদেশে আগমনের কথা জানা যায় তাঁদের অবিস্মরণীয় শিল্পকীর্তি হতে।

৬০। আরামবাগ থানার অধীনস্থ তিরোল গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন মনসারাম মিত্র। তিনি বর্ধমান কালেক্টরের অধীনে পেশকার পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং জাল প্রতাপচাঁদ মামলায় পরাণচাঁদের পরামর্শদাতা ও ষড়যন্ত্রকারীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। মামলার মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ায় ও অন্যান্য সাক্ষী জোটানর কাজে সহায়তার জন্য প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিরোল গ্রামে ধ্বংসাবশেষ অট্টালিকাটি তাঁর অতীত কুকর্মের সাক্ষ্য দিতেছে।

৬১। মনোভাব।

৬২। ট্রেজারী বা সরকারী কোষাগার।

৬৩। তেলিনীপাড়ার অবস্থিতি হল ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ভদ্রেশ্বর শহরের সন্নিহিত অঞ্চলে। তেলিনীপাড়ার জমিদার বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া পত্নীর সন্তান আলোচ্য উপন্যাসের রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬৪। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুন ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়নকে ডিউক অব ওয়েলিংটন-এর নেতৃত্বে ইংরাজ সৈন্যগণ ওয়াটারলুর প্রান্তরে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জসহ সমস্ত বৃটিশ উপনিবেশে জাঁকজমক সহকারে এই বিজয়োৎসব পালিত হয়েছিল।

৬৫। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বর্ধমানের রাজকুমার প্রতাপচাঁদ বাহাদুর কলিকাতার রামরত্ন মল্লিকের পুত্রের বিবাহে ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বিবাহ সভায় ছদ্মবেশ প্রকাশ হওয়ায় প্রতাপচাঁদ রামরত্ন মল্লিকের পুত্রকে একটি হীরকাঙ্গুরীয় উপহার প্রদানপূর্বক ঐ স্থান ত্যাগ করেন। এ তথ্য জানা যায় ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি 'সংবাদ ভাস্করে' প্রকাশিত বিবাহ সভার বর্ণনা হতে। (সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৪-৫)।

৬৬। ফরাসডাঙ্গা—চন্দননগরের একাংশ। অতীতের ফরাসডাঙ্গা পল্লীকে ঘিরে বর্তমান চন্দননগরের পত্তন হয়েছিল। সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপাদনের জন্য এক সময়ে ফরাসডাঙ্গার প্রসিদ্ধি ছিল।

৬৭। হাওড়া কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ প্রাচীন ব্যবসায় কেন্দ্র। মোগল আমলে স্থলপথ ও জলপথে সারা বাংলাদেশের সঙ্গে সালকিয়ার যোগাযোগ ছিল। ষোড়শ শতকে রচিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে 'শলিথা'র উল্লেখ আছে।

৬৮। ইসাবেল—এই ফরাসী বিদেশিণী মহারাজা তেজচন্দ্রের রক্ষিতা ছিলেন।

৬৯। তোতাকুমারী—মহারাজা ত্রিলোকচাঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও মহারাজা তেজচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

৭০। সমন।

৭১। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বরে সংবাদ কৌমুদীতে প্রকাশিত এক খবরে জানা যায় যে, বর্দ্ধমানের ভূম্যধিকারি মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাংলা ১২৩৯ সালের ২রা ভাদ্র বৃহস্পতিবার অম্বিকা-কালনায় পরলোকগমন করেন। (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৫।)

৭২। খিদিরপুরের অন্তর্গত ভূকৈলাস নামক পল্লীতে স্বনামধন্য রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের বসবাসের স্থানের জন্য প্রসিদ্ধ। ঘোষালদের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে বিশাল শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

৭৩। পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ (১৭৮০-১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দ) কাবুলের অধিপতি জামান শাহের সহযোগিতায় শিখরাজ্য গঠনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শিখরাজ্য গঠনে বাধা দিলে রঞ্জিৎ সিংহ কোম্পানির সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশ সামন্ত রাজ্য বা মিসল্ তাঁর অধীনস্থ ছিল। অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে পঞ্চাশ বছর রাজত্ব পরিচালনার পর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৭৪। বর্দ্ধমান শহরে, বিজয়তোরণ হতে দক্ষিণ দিকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে কালিবাজার মোড় ও বীরহাটা কালিমন্দিরের নিকটস্থ পল্লী।

৭৫। বলগমা—বাঁকুড়া জেলার ছাতনা থানায় অবস্থিত একটি গ্রাম। বাঁকুড়া শহর হতে ২১ কিলোমিটার পশ্চিমে বলগমার অবস্থিতি।

৭৬। সাক্ষী আদালতে না আনলে তার আবাসস্থল বা অবস্থানরত স্থানে সাক্ষ্য গ্রহণ।

৭৭। রেহাই দেওয়া (Ibra)।

৭৮। শরিয়ত আইন, এই আইন কেবলমাত্র মুসলমান প্রজার উপর প্রযুক্ত ছিল।

৭৯। মুর্শিদাবাদ—ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত নবাবী আমলের সুবা বাংলার রাজধানী। ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ জাহাঙ্গীর নগর বা ঢাকা হতে দেওয়ানের কার্যালয় মুখসুদাবাজে স্থানান্তরিত করেন। সম্রাট ফাকখ-সায়রের সময়ে ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে সুবা বাংলার রাজধানীতে পরিণত হয় এবং ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময়ে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ হতে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়।

ঢাকা—বুড়িগঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত বাংলাদেশের রাজধানী এবং প্রাচীন শহর। ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সুবাদার ইসলাম খান রাজমহল (আকবর নগর) হতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং সম্রাটের নামানুসারে রাজধানীর নামকরণ করা হয় 'জাহাঙ্গীর নগর'।

চন্দ্রশেখর—বাংলাদেশের অন্তর্গত চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপর অবস্থিত একটি শাক্ত পীঠ। এই শাক্ত পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভবানী ও ভৈরব চন্দ্রশেখর নামে বিখ্যাত।

আদ্দিনাথ—চট্টগ্রাম জেলার মহেশখালি দ্বীপে অবস্থিত পাহাড়ের উপর একটি হিন্দুতীর্থ।

যৈতেশ্বরী—বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত কলজোর-বাউলভোগ নামক স্থানে 'জয়ন্তী' নামক শাক্ত পীঠের অবস্থিতি।

ত্রিপুরেশ্বরী—ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের ৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ত্রিপুরেশ্বরী নামক স্থানে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। রাজমালা গ্রন্থে আছে—'সতীর দক্ষিণ পদ পড়ে ত্রিপুরাতে'। ত্রিপুরাসুন্দরী খ্যাতি ত্রিপুর ভূমিতে।

বাণেশনাথ—সম্ভবতঃ কোন বাণলিঙ্গ। স্থান পরিচয় অজ্ঞাত।

কাশী—অসি ও বরুণা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র বারানসী।

প্রয়াগ—বর্তমান এলাহাবাদের পূর্ব অংশে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে পূর্ণকুম্ভ ও অর্ধকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্রকূট—উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলায় অবস্থিত রামায়ণে বর্ণিত চিত্রকূট পাহাড় একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানরূপে পরিচিত। সাতনা হতে ৭৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে চিত্রকূটের অবস্থিতি। পিতৃসত্য পালনের সময় শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী সহ এই স্থানে কয়েক বৎসর অবস্থান করেছিলেন।

অযোধ্যা—উত্তরপ্রদেশের ফয়জাবাদ জেলার অন্তর্গত এবং ফয়জাবাদ শহর হতে ৮ কিলোমিটার দূরে সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত অযোধ্যা ছিল রামায়ণ বর্ণিত ইক্ষ্বাকু রাজবংশের রাজধানী। বৌদ্ধ গ্রন্থে ও কালিদাসের রঘুবংশে অযোধ্যাকে 'সাকেত' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। গুপ্তযুগে অযোধ্যা একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। বর্তমানে মন্দির-মসজিদ প্রসঙ্গে অযোধ্যা একটি বিতর্কিত স্থানরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে।

বৃন্দাবন—উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলার অন্তর্গত এবং মথুরা শহর হতে ১৩ কিলোমিটার উত্তরে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থস্থান।

মথুরা—উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলার সদর শহর। মধুদৈত্যের রাজধানী হওয়ায় স্থান নামটি মধুরা বা মথুরা হয়েছে। সুরসেন রাজাদের রাজধানী ছিল মথুরায়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানরূপে চিহ্নিত মথুরা একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থরূপে পরিগণিত হয়।

কুরুক্ষেত্র—দিল্লী হতে ১৬০ কিলোমিটার উত্তরে এবং আম্বালা হতে ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। মহাভারতে বর্ণিত ধর্মযুদ্ধ এই স্থানেই সংঘটিত হয়েছিল।

পুষ্কর—রাজস্থানের আজমীর শহর হতে ১২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। ব্রহ্মা মন্দির, সাবিত্রী পাহাড় ও রঙ্গনাথের মন্দির হল পুষ্করের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান।

প্রভাস—গুজরাট রাজ্যের সোমনাথ অঞ্চলেব প্রাচীন নাম প্রভাস পত্তন। প্রভাস তীর্থে শ্রীকৃষ্ণের অন্তিমলীলা সাধিত হয়েছিল। আমেদাবাদ হতে রেলপথে ভেরাবল গিয়ে, তথা হতে বাসযোগে ৮ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে সোমনাথ যাওয়া যায়।

বদ্রিকাশ্রম—উত্তর প্রদেশের গাড়োয়াল জেলায় অবস্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বদ্রিনাথ বা বদ্রিনারায়ণ। নর ও নারায়ণ পর্বতদ্বয়ের মধ্যস্থ বিষ্ণুগঙ্গা বা অলকানন্দা নদীর তীরে বদ্রিনারায়ণের মন্দির, হৃষিকেশ হতে ৩০১ কিলোমিটার বাসযোগে অতিক্রম করলেই বদ্রিনারায়ণ বা বিশালবদ্রিতে পৌছান যায়।

হরিদ্বার—ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন, প্রসিদ্ধ ও পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলায় গঙ্গা নদীর তীরে হরিদ্বারের অবস্থিতি। মন্দির ও আশ্রমে পরিপূর্ণ এই পবিত্র তীর্থস্থানকে ঘিরে বহু পৌরাণিক উপাখ্যান বা কাহিনী গড়ে উঠেছে। প্রতি বার বৎসর অন্তর হরিদ্বারে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

হিঙ্গুলাক্ষী—বেলুচিস্তানে হিঙ্গোল নদীর তীরে হরপর্বতের চূড়ার উপর প্রসিদ্ধ শাক্ত পীঠ হিংলাজ অবস্থিত। এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট নানা বা নাইনি নামে পরিচিত। সমুদ্রতীর হতে দুর্গম হিংলাজ পীঠের দূরত্ব ৩২ কিলোমিটার।

জ্বালামুখী—হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলায় অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ শাক্ত পীঠ। কাংড়া হতে বাসযোগে ৫৬ কিলোমিটার দূরে জ্বালামুখী যাওয়া যায়। আবার পাঠানকোট হতে ট্রেনে জ্বালামুখী পৌছান যায়। এই সতীপীঠে কোন মূর্তি নাই, কেবলমাত্র নীলাভ অনির্বাণ শিখা জ্বলছে।

লাহোর—পাকিস্তানের অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। লাহোরের কোট্‌লী মহল্লায় বর্ধমান রাজবংশের পূর্বপুরুষ সঙ্গম রায়ের আদি নিবাস ছিল।

অমৃতসর—পাঞ্জাব রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত শিখধর্মের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। শিখধর্মের অন্যতম উপাসনালয় বিখ্যাত স্বর্ণমন্দিরটি রণজিৎ নির্মাণ করেছিলেন।

কাশ্মীর ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর।

৮০। রোজ-নাম্‌চহ্‌ বা দৈনিক বৃত্তান্তলিপি।

৮১। মুসলমান আইন মতে বিধি প্রদানের আদেশ।

৮২। সনাক্ত—পরিচয় জ্ঞাপন বা প্রদান।

৮৩। একমত।

৮৪। 'এই ছয় জনের মধ্যে হরধামের রাজা নরহরিচন্দ্র রায় একজন আসামী ছিলেন। তিনি খালাস হইলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় আর সমাজে মুখ দেখাইতে পারিলেন না। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র বলিয়া তাঁহার বংশাভিমান কিছু অতিরিক্ত ছিল। এমন কি তিনি কৃষ্ণনগরের রাজা গিরিশচন্দ্র [কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছানুসারে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র নদীয়ার জমিদারী লাভ করেন। পরবর্তীকালে শিবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের পুত্র গিরিশচন্দ্র রায় নদীয়ার জমিদারী লাভ করেন] অপেক্ষা আপনাকে সম্ভ্রান্ত মনে করিতেন। রাজা গিরিশচন্দ্রের তাঁহার প্রতি কতকটা জ্ঞাতিবৈরিতা দর্শাইতেন। একবার কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে নরহরি-চন্দ্রের দুর্দশা অনুকরণ করিয়া একটা যাত্রায় "সং" দেওয়া হয়। তাহাতে গিরিশচন্দ্র বড় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে কিরূপ কুরুচি ছিল তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা এ পরিচয় দিলাম। রাজা গিরিশচন্দ্রের ন্যায় ব্যক্তি অন্যের দুর্ভাগ্য লইয়া রহস্য করিতে পারিতেন এবং দেখিতে পারিতেন, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা।'—সঞ্জীবচন্দ্র প্রদত্ত পাদটীকা।

৮৫। Acting বা অস্থায়ী।

৮৬। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৮৭। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'জাল প্রতাপচাঁদ' উপন্যাসে প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তি প্রকাশ করেছেন। প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর তারিখ হল,—১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর। ১৮৫৬, ১৯এ নবেম্বর প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর পরলোকগমন করিয়াছিলেন। 'সংবাদ ভাস্কর' পরবর্ত্তী ২২এ তারিখে লিখিয়াছিলেন :— 'জাল প্রতাপচন্দ্রের কালপ্রাপ্তি।—হা, কি খেদের বিষয়, জাল রাজা বড় আশয় করিয়াছিলেন পুনর্ব্বার মোকদ্দমা করিয়া বর্দ্ধমান রাজ্যেশ্বর হইবেন, শারদীয় পূজার পূর্ব্বে সদর দেওয়ানী হইতে পূর্ব্ব মোকদ্দমার কাগজপত্রের নকল বাহির করিয়াছেন, একজন মান্য উকীলকে ওকালতনামাও দিয়াছেন, রাজপাটে বৈসেন ২ এমত হইয়াছিল, এই সময়ে জ্বর বিকারে গত বুধবারে শ্মশানঘাটে গিয়াছেন, যাঁহারা মনে ২ লঙ্কা ভাগ করিতেছিলেন এইক্ষণে তাঁহারা জাল রাজার শ্মশানে যাইয়া মুণ্ডপাত করুন।' (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৫৯)।

বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস

১

মোঘল সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার ও আস্থাভাজন হয়ে সামান্য নগর কোতোয়াল ও রাজস্ব আদায়কারী চৌধুরীর পদ হতে অল্পকালের মধ্যেই সুবাবাংলার অন্যতম প্রধান জমিদাররূপে 'বর্ধমান রাজবংশ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই জমিদার-বংশের আদিপর্বের কাহিনী সবিশেষ জানা যায় না। তবে প্রবাদ আছে যে, বর্ধমান রাজবংশের আদিপুরুষ আগ্রা হতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনার্থে 'শ্রীক্ষেত্র' গিয়েছিলেন এবং তথা হতে প্রত্যাবর্তনের পথে বাদশাহী সড়ক ধরে সরকার সরিফাবাদের সদর কার্যালয় বর্ধমানে এসে উপস্থিত হন। সঙ্গম রায়ের আদি বাসস্থান ছিল বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত লাহোর শহরের কোটলী মহল্লায় এবং তিনি জাতিতে ছিলেন ছেত্রী।

সঙ্গম রায় বর্ধমান শহরে বসবাস না করে, তথা হতে প্রায় ১০ কিলোমিটার পূর্বে রাইপুর-বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে বাসস্থান নির্বাচন করেছিলেন।[১] সম্ভবতঃ বিদেশে এসে সঙ্গম রায় রাজকর্মচারীদের নিকট হতে দূরে বসবাস করাকে শ্রেয় মনে করে বর্ধমানে বাস না করে বৈকুণ্ঠপুরে এসেছিলেন। শোনা যায়, তিনি খাদ্য-শস্য ও টাকা আদান-প্রদানের (মহাজনী) ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন।[২]

সঙ্গম রায়ের পৌত্র ও বঙ্কুবিহারীর পুত্র আবু রায় বৈকুণ্ঠপুর হতে বর্ধমানে এসে বসবাস স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর সময় হতে এই বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে আবু রায়ই এই বংশের প্রথম পুরুষ যিনি পদস্থ রাজকর্মচারী ও রাজস্ব আদায়ের চৌধুরীর পদ লাভে সমর্থ হয়ে অতি সাধারণ ব্যবসায়ী পরিবারকে সম্ভ্রান্ত রাজবংশে উন্নীত করার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে একদল মোঘল সৈন্য ঢাকা গমনকালে খাদ্য ও রসদের অভাবে বর্ধমান শহরে অবস্থান করতে বাধ্য হলে সৈন্যদলটির ঢাকা গমনের প্রধান অন্তরায় হয়। আবু রায় ফৌজদারের অসহায়তার সময়ে অনতিবিলম্বে খাদ্য ও রসদ সরবরাহ করে সৈন্যদলটিকে ঢাকা গমনের সহায়তা করেন এবং উক্ত কার্যের পুরস্কার স্বরূপ বাংলার সুবাদার সুলতান সুজার সুপারিশক্রমে মোঘল দরবার হতে তাঁকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা হয়েছিল।[৩]

হিজরী ১০৬৪ সনে (১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে) সম্রাট শাহজাহানের ফরমান বলে আবু রায় সরকার সরিফাবাদের ফৌজদারের অধীনে বাৎসরিক ৫৩২ টাকার (সিক্কা) বিনিময়ে রেকাবি বাজার, মোগলটুলি ও ইব্রাহিমপুরের রাজস্ব আদায়ের চৌধুরী ও নগর কোতোয়ালের পদ প্রাপ্ত হন।[৪]

আবু রায়ের পর তাঁর পুত্র বাবু রায় ১,০০,২৬২ সিক্কা টাকা রাজস্ব বন্দোবস্তে

বর্ধমান পরগণাসহ আরও তিনটি পরগণার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব লাভ করেন।[৫] প্রকৃতপক্ষে তিনি রাজস্ব আদায়কারী ক্ষুদ্র জমিদার অর্থাৎ বাবু রায় এই বংশের প্রথম ব্যক্তি যিনি জমিদারের সম্মান ও রাজকার্যভার প্রাপ্তির সুযোগ লাভ করেছিলেন।

বাবু রায়ের পুত্র ঘনশ্যাম রায় রাজস্ব আদায়কারী জমিদারের পদ লাভ করেন। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানা যায় না; তবে তিনি পিতার আমলের মহলগুলির চৌধুরীপদে বহাল ছিলেন। ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান শহরে সুপ্রসিদ্ধ 'শ্যামসায়র' নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণী খননকার্য তাঁর জনহিতকর কার্যের মধ্যে গণ্য করা যায়।[৬] ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে ঘনশ্যাম রায়ের মৃত্যু হয়। যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণে' (অনাদ্যের পুঁথি), ঘনশ্যাম রায়ের পর বলরাম রায় ও তৎপরে কৃষ্ণরামের উল্লেখ রয়েছে,—

'মরিল বলরাম রায় অরাজক পুরী
সেইকালে কৃষ্ণরাম নিল বসুন্ধরী।'

কিন্তু 'বর্ধমান রাজবংশানুচরিত' বা অন্য কোন তথ্যে এর সমর্থন মেলে না। বলরাম রায়ের সঙ্গে ঘনশ্যাম বা কৃষ্ণরামের কোন সম্পর্ক পর্যন্ত জানা যায় না।

কৃষ্ণরাম রায় (১৬৭৫-৯৬):

ঘনশ্যাম রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কৃষ্ণরাম রায় বর্ধমানের জমিদার ও চৌধুরী নিযুক্ত হন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগে মনসবদার ও জায়গীরদারের পরিবর্তে অধিক রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকারে বহু খালিসা জমির রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব জমিদার শ্রেণীর উপর ন্যস্ত হয় এবং সুবাবাংলার মধ্যে কৃষ্ণরাম রায় একমাত্র জমিদার যাঁর অধীনে ৫০টি পরগণার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল।

দীর্ঘ বাইশ বছর সুবাদারের পদ অলঙ্কৃত করে ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ সুবা-বাংলা হতে বিদায় গ্রহণ করেন এবং খান-ই-জাহান বাহাদুর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সম্রাটের ধাত্রীপুত্র নূতন সুবাদার ছিলেন একেবারেই অপদার্থ এবং এক বছরের মধ্যে তিনি বঙ্গদেশ হতে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে ইব্রাহিম খাঁ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ইব্রাহিম খাঁ ছিলেন অতি বৃদ্ধ এবং শাসনকার্যের প্রতি বিশেষ মনযোগী হওয়ার পরিবর্তে পুস্তক পাঠে অধিক সময় ব্যয় করতেন। তাঁর সময়ে আঞ্চলিক ফৌজদারের পরিবর্তে একজন ফৌজদারের অধীনে যশোহর হতে বর্ধমানের পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত শাসনকার্যের ভার অর্পিত থাকায় বড় বড় জমিদারগণ ফৌজদারের ন্যায় রাজস্ব আদায় ও শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করতেন। ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই কৃষ্ণরাম সেনপাহাড়ী পরগণা বলপূর্বক অধিকার করেন। সুবাদার ও ফৌজদারের অপদার্থতার সুযোগে তিনি পদাতিক সৈন্য ও অশ্বারোহী সৈন্য রাখার অনুমতি লাভ করেন এবং ভুরশুট, মনোহরশাহী, চন্দ্রকোনা ও বলাগড়ের জমিদারীও বলপূর্বক অধিকার করেন।

সুবাবাংলার এরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কৃষ্ণরাম রায় বিশেষ প্রভাব বিস্তারে

সক্ষম হন এবং সুবাদার ও ফৌজদারের সম্মতিতে তিনি ছোট ছোট জমিদারগণের কয়েকটি পরগণা অধিকার করেন। কৃষ্ণরামের জমিদারী কাঁসাই নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট ফরমান লাভের নিমিত্ত আবেদন করায় হিজরী ১১০৫ সনে (১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দ) তিনি বর্ধমান অঞ্চলের জমিদারী ও চৌধুরী-পদের নিমিত্ত সনদ লাভ করেন।[৭]

সম্রাট প্রদত্ত সনদবলে ও স্বীয় অধিকৃত অঞ্চলসহ কৃষ্ণরাম এক বিশাল অঞ্চলের জমিদাররূপে গণ্য হয়েছিলেন। এই সময়ে বর্ধমানে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাগণের ক্লেশ নিবারণার্থ 'কৃষ্ণসায়র' নামক এক বিশাল পুষ্করিণী খনন করান এবং শ্রমিকদের এক ঝুড়ি মাটি কাটার জন্য এক কড়ি হিসাবে পারিশ্রমিক দানের ব্যবস্থা করেন।[৮] 'ধর্মপুরাণে'র কবি যাদুনাথের ভাষায় কৃষ্ণরাম ছিলেন খ্যাতিমান পুণ্যশ্লোক জমিদার। কবির বিবরণে আরও জানা যায় যে, কৃষ্ণরামের নিধনকাল ও 'ধর্মপুরাণে'র রচনা সমাপ্তিকাল একই অর্থাৎ ১৬৯৬ সালের জানুয়ারী মাস। এ প্রসঙ্গে জানা যায়,[৯]—

> 'খেত্রী বংশেতে জন্ম নাম কৃষ্ণরাম
> প্রভাতে উঠিয়া মুখে স্বরে যার নাম।
> কৃষ্ণরামের নামে পাপ তাপ-বিমোচনে
> চিরকাল রাজ্যতি করেন বর্ধমানে।'

কৃষ্ণরামের আগ্রাসন নীতিতে ভীত হয়ে বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহ, চন্দ্রকোনার তালুকদার রঘুনাথসিংহ, চিতুয়া ও বরদার (চাকলা বর্ধমানের অধীনস্থ) জমিদার শোভাসিংহ ও ওড়িশার পাঠান সর্দার রহিম খাঁ এক যোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করলে কৃষ্ণরাম একটা ক্ষুদ্র সৈন্যদল নিয়ে বাধা দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন।[১০] বিদ্রোহীরা চন্দ্রকোনা, চেতুয়া, বরদা অঞ্চলে সংগঠিত হওয়ার পর ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে (জুলাই-আগস্ট) বিদ্রোহী হয়ে বর্ধমানের দক্ষিণ অঞ্চলে লুণ্ঠন ও অত্যাচার শুরু করেন এবং বর্ষাকাল অন্তে কৃষ্ণরাম অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বাধা দিতে অগ্রসর হলে সমবেত বিদ্রোহীগণের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। সলিমউল্লার মতে (তারিখ-ই-বাংলা) চন্দ্রকোনার নিকট এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন, প্রথম যুদ্ধ গড়মান্দারনে সংঘটিত হয় এবং কৃষ্ণরাম ক্রমশঃ চন্দ্রকোনা অভিমুখে অগ্রসর হলে তথায় তুমুল সংঘর্ষের পর তিনি নিহত হন।

কৃষ্ণরামের নিধনের পর বিদ্রোহীগণ শোভাসিংহের নেতৃত্বে বর্ধমান শহরে উপস্থিত হয়ে নগর ও কোষাগার লুণ্ঠন করেন। বাংলা ১১০৩ সালের (১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে) পৌষ মাসে অমাবস্যা তিথিতে কৃষ্ণরাম নিহত হয়েছিলেন এবং ঐ তিথিকে স্মরণ করে বর্ধমান রাজবাটীতে বর্তমান শতকের প্রথম ভাগেও তাঁর বাৎসরিক শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হত। বিদ্রোহীদল শহরে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই

কৃষ্ণরামের পরিবারস্থ মহিলাগণ সম্ভ্রম বিনষ্টের আশঙ্কায় জহরব্রত অনুষ্ঠান করেন এবং এই জহরব্রতে তিনজন বিধবা মহিলাসহ মোট তেরজন মহিলা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। বর্ধমান রাজবাড়ীর পুরনো নথিপত্র হতে তেরজন মহিলার নাম জানা যায়, যথা,—কুন্দদেবী, কোতাদেবী, চিমোদেবী, লছমী দেবী, আনন্দ দেবী, কিশোরী দেবী, কুঞ্জদেবী, জিতু দেবী, মুলুক দেবী, লাজোদেবী, পাতোদেবী, দাসোদেবী ও কৃষ্ণা দেবী এবং উক্ত রমণীগণের মধ্যে শেষ ছয়জন ছিলেন কৃষ্ণরামের স্ত্রী।[১১] এই জহরব্রত অনুষ্ঠানটি হয়েছিল পৌষ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে অর্থাৎ কৃষ্ণরাম নিহত হওয়ার পর বিদ্রোহীগণ মেদিনীপুর, হুগলী ও বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চল সাতদিন ধরে লুণ্ঠনের পর বর্ধমান শহরে উপস্থিত হয়েছিলেন। শহরে প্রবেশ করে কৃষ্ণরাম রায়ের পরিবারের ২৫ জনকে হত্যা করে প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কৃষ্ণরাম বর্ধমান শহরে বা সন্নিকটবর্তী কোন স্থানে নিহত হন নাই।

বিদ্রোহী দল বর্ধমানে প্রবেশের পূর্বেই তাঁর পুত্র জগৎরাম রায় (সম্ভবতঃ ঐ সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ব্রজকিশোরী) নগর পরিত্যাগপূর্বক স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে নদীয়ারাজ রামকৃষ্ণের নিকট আশ্রয় লাভের নিমিত্ত মাটিয়ারীতে গিয়ে উপস্থিত হন এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ ও জমিদারী প্রাপ্তির আশায় তথা হতে ঢাকা (জাহাঙ্গীরনগর) গমন করেন।

২

জগৎরাম বর্ধমান হতে পলায়ন করে ঢাকায় সুবাদার ইব্রাহিম খাঁকে সমস্ত বিষয়টি অবগত করান। গ্রন্থকীট সুবাদার বিষয়টির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ না করেই (একটা সাধারণ বিদ্রোহ মনে করে) তিনি একজন মুসলমান সেনাপতির সঙ্গে জগৎরামকে বর্ধমানে প্রেরণ করে বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হন। ফলে ফৌজদার নুরউল্লা খাঁর উপর বিদ্রোহ দমনের আদেশ দেওয়া হয়। যেমন প্রভু, তেমনি তার ভৃত্য। ১৬৯১ খ্রীস্টাব্দ হতে নুরউল্লা খান যশোহর, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হিজলীর ফৌজদার ছিলেন এবং যশোহরের মির্জানগরে তাঁর প্রধান কার্যালয় ছিল। তিনি অধিকাংশ সময়ে কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থকরী ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকতেন এবং ফৌজের ভার তাঁর জামাতা লাল খাঁর উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।[১২]

বর্ধমান অধিকার ও কোষাগার লুণ্ঠন করে শোভাসিংহ ক্ষমতার মোহে সপ্তগ্রাম-হুগলী-চুঁচুড়া-চন্দননগর অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন। হুগলীতে নুরউল্লা খাঁ বিদ্রোহীদের বাধা প্রদান করেন, কিন্তু বিদ্রোহীদের দমনের কোন সদিচ্ছা না থাকায় তিনি ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২২শে জুন শোভাসিংহ কর্তৃক পর্যুদস্ত হয়ে প্রাণভয়ে রাতের অন্ধকারে হুগলী-দুর্গ হতে পলায়ন করেন। নুরউল্লা খাঁর পলায়নের পর শোভা সিংহ চুঁচুড়া ও চন্দননগর আক্রমণ করেন; কিন্তু ওলন্দাজদের সহায়তায় স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শোভাসিংহ এতদঞ্চল ত্যাগ করেন। প্রকৃতপক্ষে ভাগীরথীর সমগ্র পশ্চিম অঞ্চল শোভাসিংহের দখলে চলে যায়।

নূরউল্লার পলায়নের পর সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁকে বর্ধমানের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয় এবং জবরদস্ত খাঁ অশ্বারোহী সৈন্যদলসহ বর্ধমানে আসার পথে রহিম খাঁর সৈন্যদল কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন।[১৩]

হুগলী অধিকারের কাজ অসমাপ্ত রেখে শোভাসিংহ বর্ধমানে চলে আসেন এবং জুলাই মাসের শেষভাগে রহিম খাঁর নেতৃত্বে অপর একটি সৈন্যদল নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চল লুণ্ঠনের জন্য অভিযান করে। শোভাসিংহ বর্ধমানে ফিরে এসে কৃষ্ণরাম রায়ের কন্যাকে বলপূর্বক গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়ে সত্যবতীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করে পাশবিক অত্যাচার করতে উদ্যত হলে তিনি চুলের বেণীর মধ্যে লুক্কায়িত ছুরিকার দ্বারা শোভাসিংহের উদর চিরে ফেলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। সত্যবতীও পাপীর স্পর্শে তাঁর শরীর অপবিত্র হওয়ায় উক্ত ছুরিকার দ্বারা আত্মঘাতিনী হয়েছিলেন।[১৪]

শোভাসিংহের মৃত্যুর পর ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগ হতে ওড়িশার পাঠান নেতা রহিম খাঁ এই বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন এবং রহিম খাঁর নেতৃত্বাধীনে বিদ্রোহের তীব্রতা অন্ততঃপক্ষে দশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

শোভাসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হিম্মতসিংহ বিদ্রোহীদের নেতারূপে মনোনীত হলেও প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বের সমস্ত ক্ষমতা রহিম খাঁর হাতে চলে গেল। তিনি রহিম শাহ উপাধি ধারণপূর্বক সমগ্র ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন। রহিম খাঁ মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজার লুণ্ঠন করে ৬০ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন এবং এই অর্থের সাহায্যে তাঁর সৈন্যদলে ১০ হাজার অশ্বারোহী ও ১০ হাজার পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত করেছিলেন।[১৫] মুর্শিদাবাদ অধিকারের সংবাদ পেয়ে জবরদস্ত খাঁ একদল সৈন্যসহ মুর্শিদাবাদ আগমন করেন; এ কথা প্রচারিত হলে বিদ্রোহীরা ঢাকার পথে অগ্রসর হতে সাহস করে নাই। তবে রাজমহল ও মালদহের কিয়দংশ বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়।

দাক্ষিণাত্যে অবস্থানরত সময়ে বাদশাহ আওরঙ্গজেব সকল সংবাদ অবগত হয়ে তৎক্ষণাৎ ইব্রাহিম খাঁকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁর পৌত্র (বাহাদুর শাহের পুত্র) আজিম উস-শানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। যেহেতু শাহজাদা ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যে ছিলেন, সেকারণে ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁকে অস্থায়ীভাবে সুবাদার নিযুক্ত করে তাঁর উপর বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

রহিম খাঁ রাজমহল ও মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করেন এবং অর্থের দ্বারা বশীভূত হয়ে কাশিমবাজার আক্রমণ করেন নাই। মুর্শিদাবাদ আক্রমণের সময় আফগান সৈন্যদলকে বাধা দিতে গিয়ে এতদঞ্চলের জায়গীরদার নিয়ামত খাঁ ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পরাজিত ও নিহত হন।[১৬] ঢাকা হতে অশ্বারোহী সৈন্যসহ জবরদস্ত খাঁ প্রথমে রাজমহল ও মালদহ পুনরাধিকার করে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন।

বর্ষাকাল অন্তে ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে

শাহজাদা আজিম-উস-শান রাজমহলের পথে বর্ধমানে এসে উপস্থিত হন। বর্ধমানে শিবির স্থাপন করে, জবরদস্তের প্রতি নির্লিপ্ত ভাব প্রকাশ করায় জবরদস্তও তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে মনের ক্ষোভে ৮০০০ সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য ও পিতা ইব্রাহিম খাঁ-সহ বর্ধমান ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের নিকট গমন করেন।[১৭]

জবরদস্তের বর্ধমান হতে প্রত্যাগমনের সংবাদ পেয়ে আফগান শিবিরে উল্লাস দেখা দেয়। কূটবুদ্ধিসম্পন্ন রহিম খাঁ শাহজাদার দুর্বলতা উপলব্ধি করে (জবরদস্তের অশ্বারোহী বাহিনীর অনুপস্থিতি) গর্বিতভাবে দূত মারফৎ মৌখিক প্রত্যুত্তর দিলেন যে, যদি শাহজাদার উজির খাজা আনোয়ার স্বয়ং তাঁর শিবিরে উপস্থিত হয়ে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন, তাহলে সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের বিষয় বিবেচনা করা হবে। রাজনীতি জ্ঞানসম্পন্ন, উদার স্বভাব ও সাধু প্রকৃতির উজির সুবাদারের আদেশে কোন বিচার বিবেচনা না করেই রহিম খাঁর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের অভিলাষে তাঁর শিবিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

এদিকে রহিম খাঁ স্বীয় অহঙ্কারবশতঃ শিবিরের বাইরে না এসে, উজিরকে শিবিরের ভিতরে যাবার জন্য আদেশ করায় সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল এবং তিনি বর্ধমান দুর্গের দিকে প্রত্যাবর্তন করার চেষ্টা করেন। অনুচরবৃন্দসহ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রহিম খাঁ অতর্কিতে উজির ও তাঁর সঙ্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধে উজিরও পশ্চাদপদ না হয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সহায়তায় বাধা প্রদান করেন এবং শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি নিহত হন।

খাজা আনোয়ারের মৃত্যুর পর গর্বোদ্ধত রহিম খাঁ শাহজাদার শিবির আক্রমণ করেন। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও রহিম খাঁ ও তাঁর অশ্ব উভয়েই হামিদ খাঁ কুরেশীর নিক্ষিপ্ত তীরে ধরাশায়ী হলে হামিদ খাঁ, রহিম খাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করে বর্শার ফলকে গেঁথে বিজয়োল্লাস প্রকাশ করায় আফগান সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। মোঘল-বাহিনী আফগানদের পশ্চাদ্ধাবনপূর্বক শিবির লুণ্ঠন করে প্রচুর ধনরত্ন আহরণ করেন। কিন্তু শহজাদা এতেও ক্ষান্ত হলেন না। তিনি আফগানদের নির্মূল করার আদেশ দেন এবং অল্প কিছুকালের মধ্যে যশোহর, হুগলী ও বর্ধমান হতে আফগানরা একেবারেই নির্মূল হয়ে যায়। যুদ্ধ জয়ের পর আজিম-উস-শান বর্ধমান শহরে প্রবেশ করে হজরৎ বহরাম সক্কার সমাধিতে নতজানু হয়ে অভিবাদন করেন। রহিম খাঁর মৃত্যুর পর শাহজাদা আরও দু'বছর বর্ধমানে অবস্থান করেন।

৩

জগৎরাম রায় (১৬৯৯-১৭০২):

১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণরাম রায়ের হত্যার পর তাঁর একমাত্র পুত্র জগৎরাম রায় ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে কালযাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশেষে নূতন সুবাদার কর্তৃক বিদ্রোহ দমিত হলে চাকলা বর্ধমানে মোঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত

হয় এবং জগৎরাম রায় তাঁর পৈত্রিক জমিদারী ফিরে পান। বর্ধমানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে শাহজাদা আজিম-উস-শানের সুপারিশক্রমে হিজরী ১১১১ অব্দে (ইং ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দ) ৫ই জমাদিয়ল আউয়ল তারিখে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হতে ৫০টি মহল বা পরগণার রাজস্ব আদায়কারী জমিদার ও চৌধুরী উপাধিসহ ফরমান লাভ করেন। কিন্তু কীর্তিচাঁদকে প্রদত্ত ফরমান হতে অনুমান করা যায় যে, জগৎরামকে ৪৫টি পরাগণার রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হয়েছিল। জগৎরাম মাত্র ৪ বৎসর কাল জমিদারী পরিচালনা করেছিলেন। বাংলা ১১০৮ সালের ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে (ইং ১৭০২ খ্রীস্টাব্দ, মার্চ মাস) তাঁর পিতৃদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণসায়রে স্নান করার সময়ে জনৈক গুপ্তঘাতকের ছুরিকাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেকারণে বর্ধমান রাজ-পরিবারের কোন ব্যক্তি ঐ অভিশপ্ত সরোবরে স্নান করেন না; এমন কি এর জলপান বা মৎস্য আহার পর্যন্ত করেন না।

৪

কীর্তিচাঁদ রায় (১৭০২-৪০):

জগৎরামের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কীর্তিচন্দ্র রায় উত্তরাধিকারসূত্রে বর্ধমানের জমিদারী লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে কীর্তিচাঁদের সময় হতে এই বংশের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বর্ধিত হয়েছিল। সাহসী ও কুটবুদ্ধিসম্পন্ন কীর্তিচাঁদের সঙ্গে মুর্শিদকুলী খাঁর যে বিশেষ সৌহার্দ ছিল তা পরবর্তী কার্যক্রম হতে অনুমিত হয়।

পিতার মৃত্যুর প্রায় এক বছরের মধ্যেই সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রদত্ত (১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে) অস্থায়ী সনদে দেখা যায়—'জগৎরামের পুত্র কীর্তিচন্দকে বর্ধমান ওগয়হর ৪৯ মহলের জমিদারী ও চৌধুরাই খেতাব দেওয়া হয়েছে এবং এর জন্য সম্রাটের কোষাগারে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা নজরানা স্বরূপ জমা পড়েছে।'[১৮]

কীর্তিচাঁদের আবেদনক্রমে (সম্ভবতঃ সুবাদারের সুপারিশক্রমে) হিজরী ১১১৫ সনের ২০ সওয়াল তারিখে (ইং ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দ) সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হতে একটি সনদ লাভ করেন।

কীর্তিচাঁদ ৪৯টি পরগণার রাজস্ব আদায়কারী জমিদাররূপে নিযুক্ত হয়ে প্রায় ৩৮ বৎসর যাবৎকাল তাঁর জমিদারী পরিচালনা করেন ও জমিদারীর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। যে সকল ভূস্বামীগণের চক্রান্তে তাঁর পিতামহ নিহত হয়েছিলেন তাদের দমন করার সুযোগে ছিলেন। ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার নবাব হলে কীর্তিচাঁদ স্বীয় মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

কীর্তিচাঁদ একে একে চক্রান্তকারীগণের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাঁদের জমিদারী অধিকার করেন। 'তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে,—

"বিষ্ণুপুর জমিদার বরদা প্রদেশ।
ভবানী প্রদেশ করে স্বয়ং আদেশ ॥

পরে সন্ন্যাসীর দল রাখিতে শাসনে।
বর্দ্ধমান ভূপ চিন্তা করে সেই ক্ষণে॥"

কিন্তু মণ্ডলঘাট পরগণার অধিকার বিষয়ে মোহান্তদের বক্তব্য পরিষ্কার নয়। কারণ ঐ পরগণা মোহান্তদের অধিকারভুক্ত ছিল না। পক্ষান্তরে জানা যায় যে, ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দিনের সময়ে রাজস্ব অনাদায়ের ফলে সরফরাজ খাঁয়ের স্বাক্ষরিত ফরমানে আছে—মণ্ডলঘাট পরগণার জমিদার জগন্নাথ চৌধুরীর পরিবর্তে কীর্তিচাঁদের পুত্র চিত্রসেনের নামে হস্তান্তরিত হল।[১৯] তবে বালিগড়ী পরগণার অধিকার নিয়ে তারকেশ্বরের মোহান্তদের সঙ্গে কীর্তিচাঁদের দীর্ঘদিন লড়াই চলেছিল এবং অবশেষে শৈবতীর্থ তারকেশ্বরসহ বালিগড়ী পরগণা বর্ধমান জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই যুদ্ধে বর্ধমানের পক্ষে সেনাপতি ছিলেন কুমার কিশোরীচাঁদ ও জাহীর সিংহ এবং মোহান্ত বলভদ্রগিরির পক্ষে ছিলেন হীরা সিংহ ও ঋদ্ধিনাথ গিরি।

কীর্তিচাঁদ ভুরশুট বা ভুরিশ্রেষ্ঠী পরগণা অধিকার করেন এবং এই জমিদারীটি অধিকারের ফলে সুকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের ভাগ্যে যথেষ্ট বিড়ম্বনা জুটেছিল। ভুরশুট পরগণার ব্রাহ্মণ জমিদার ফুলিয়ার মুখটি বংশের কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের তিন পুত্রের মধ্যে রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়ের উত্তরপুরুষ গড়ভবানীপুরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্র রায়ের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের গড়বাড়ী ছিল পাণ্ডুয়া বা পেঁড়োগ্রামে এবং তিনি দু'আনা জমিদারীর মালিক। ভুরশুটে পরগণার দোগাছিয়া গ্রামে দু'আনা জমিদারীর মালিক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র মুকুট রায়।[২০]

জনশ্রুতি যে, প্রতাপনারায়ণের বংশধর লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে কীর্তিচাঁদের সদ্ভাব ছিল না এবং তিনি গড়ভবানীপুর অভিযান করায় লক্ষ্মীনারায়ণের অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শনের ফলে এই অভিযান সফল হয় নাই।[২১] কিন্তু ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী' কাব্যে আছে,—

"রাজবল্লভের কার্য্য কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য
মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া।"

রাজবল্লভ ছিলেন মুকুট রায়ের উত্তর পুরুষ এবং নরেন্দ্র রায়ের পিতৃব্য। জ্ঞাতি শত্রুতার বশবর্তী হয়ে রাজবল্লভ কীর্তিচাঁদের সহায়ক হন এবং ফলে ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে কীর্তিচাঁদ গড়ভবানীপুর ও পেঁড়ো অধিকার করেন। জমিদার নরেন্দ্র রায় হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েন এবং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ভারতচন্দ্র অগ্রজগণের প্রতারণায় দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অন্যথায় কবি ঘনরাম চক্রবর্তী, নরসিংহ বসু প্রমুখের ন্যায় কীর্তিচাঁদের অনুগ্রহ লাভে সক্ষম হতেন।

নবাব সুজাউদ্দিনের আমলে জমিদার কীর্তিচাঁদের প্রভাব আরও বেড়ে যায়। পিতামহকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তিনি বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণ ও অধিকাংশ অঞ্চল অধিকার করেন এবং বিষ্ণুপুর জয়ের পর বিজয়োৎসব পালনার্থে কাঞ্চননগরে

দ্বারদুয়ারী নির্মাণ করেছিলেন। এই ঘটনার পর বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের পতন শুরু হয় এবং বর্গী হাঙ্গামার ফলে এই বংশের ধ্বংস সাধন অতি ত্বরান্বিত হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের রাজার 'ফতেপুর মহল' দীর্ঘদিন বর্ধমানের অধীনস্থ ছিল।[২২] এরপর ঘাটালের যুদ্ধে চন্দ্রকোনা ও বরদার জমিদারগণকে পরাস্ত করে তাঁদের জমিদারী অধিকার করেন। অতঃপর চিতুয়া ও মনোহরশাহী পরগণা তাঁর অধীনস্থ হয়েছিল।[২৩]

মনোহরশাহী পরগণা অধিকারের পর আরও উত্তরে ফতেসিং (মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদি অঞ্চল) পরগণাও বর্ধমান জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু নবাব সুজাউদ্দিন কীর্তিচাঁদের এই আগ্রাসন নীতি পছন্দ করেন নাই। অধিকৃত পরগণাগুলির ফরমানের দাবীতে কীর্তিচাঁদ সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন। কিন্তু এই অভিযানের ফলাফল জানা যায় নাই। তবে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ হতে অনুমান করা যায় যে, নবাব কীর্তিচাঁদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।[২৪] ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট মহাম্মদ শাহের ফরমান বলে তিনি চন্দ্রকোনার রাজস্ব আদায়ের স্বত্ব লাভ করেন এবং অপর এক ফরমানের অধিকার বলে বিষ্ণুপুর ও হিম্মৎসিংহের অধিকারভুক্ত জমিদারী তাঁর হস্তগত হয়েছিল।

১৭২২ খ্রীস্টাব্দের নূতন রাজস্ব বন্দোবস্তের ফলে বর্ধমান চাকলার আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং সমগ্র চাকলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কীর্তিচাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দ অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত মোট ৫৭টি পরগণার অধিকারী ছিলেন এবং নবাবের কোষাগারে ২০,৪৭,৪০৬ টাকা বার্ষিক রাজস্ব উসুল দিতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, কীর্তিচাঁদের জমিদারীর মোট আয়তন ছিল প্রায় ৫০০০ বর্গ মাইল।[২৫]

প্রভাবশালী জমিদার কূটবুদ্ধিসম্পন্ন এক দেওয়ানকে তাঁর কার্যের সহায়ক হিসাবে পেয়েছিলেন। ভাগ্যান্বেষী পাঞ্জাবী যুবক মানিকচাঁদ বর্ধমানে এসেছিলেন এবং মানিকচাঁদের কৌশল ও বিশেষ সহায়তার ফলে তিনি সুবাবাংলার শ্রেষ্ঠ জমিদার হিসাবে পরিচিত ছিলেন। মানিকচাঁদ পরবর্তীকালে চিত্রসেন, আলিবর্দী ও সিরাজদৌলার অধীনে দেওয়ান ও সেনাপতির কার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বাংলার অন্যান্য জমিদারগণও কীর্তিচাঁদকে বিশেষ সম্মান করত এবং তিনিও জমিদারগণের বিপদের সময়ে যথেষ্ট সহায়তা করতেন। বীরভূমের জমিদার বদর-উল-জমান নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দিতে না পারায় নবাব সুজাউদ্দিন তাঁর পুত্র সরফরাজকে দ্বিতীয় বক্সী সরফউদ্দিন ও খাজা বসন্তসহ বর্ধমানের পথে বীরভূম অভিযানের জন্য প্রেরণ করেন। অনন্যোপায় হয়ে বদর-উল-জমান নবাবের নিকট উপস্থিত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করায় ও বর্ধমানের জমিদার তাঁর রাজস্বের জামিনদার হতে স্বীকৃত হলে তিনি বীরভূমে ফিরে যাবার অনুমতি লাভ করেন।[২৬] ঐ যুগে একজন হিন্দু জমিদারের সাহস ও উদার মনোবৃত্তি সত্যই প্রশংসনীয় ছিল, এতে সন্দেহ নাই। কীর্তিচাঁদ প্রসঙ্গে হাণ্টার মন্তব্য করেছেন,[২৭]—'Kirti Chandra was a

man of bold and adventurour spitit' এবং 'Kirti Chandra Roy was a man of great valour.'

কীর্তিচাঁদের চরিত্র নানা গুণে ভূষিত ছিল। চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পারিবারিক সম্মান রক্ষাকল্পে কৃষ্ণরামের হত্যাকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাস্তি বিধান করেছিলেন। অপরদিকে দেবদ্বিজের প্রতি ভক্তি, প্রজানুরঞ্জক ও সাহিত্যানুরাগের জন্য তিনি মহিমান্বিত হয়েছিলেন। এমন কি বনে বাসকারী সাঁওতালদেরও তিনি বর্ধমান শহরে বসবাসের সুযোগ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।[২৮] সুজাউদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযান ও বদর-উল-জমান-এর জমিদার হওয়ায় তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, মহত্ত্ব ও উদারতা—এই সকল গুণ প্রকাশ পেয়েছে।

১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মাতার নামে বর্ধমান শহরে 'রানিসাগর' (সায়র) নামক হ্রদতুল্য বিশাল পুষ্করিণী খনন করান। রানিসায়রের তীরে ক্ষয়প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠালিপির তারিখ ১৭৩৩ শকাব্দ এবং মাতা ব্রজকিশোরীর নাম ভিন্ন অপর অংশের পাঠ নির্দেশ করা যায় নাই। রানিসায়রের পশ্চিমতীরে তাঁর পত্নী রাজরাজেশ্বরী দেবী কর্তৃক রাজরাজেশ্বরের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৯] রাজরাজেশ্বরীর পিতামহ পীতাম্বর ট্যাণ্ডন ও পিতা বুলচাঁদ ট্যাণ্ডনও পাঞ্জাব হতে বর্ধমানে এসে বসবাস করেন।[৩০]

খেঞা পরগণা কীর্তিচাঁদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রসিদ্ধ শাক্তপীঠ ক্ষীর-গ্রামের 'যোগাদ্যা দেবী'র নূতন মন্দির নির্মাণ করান। তাঁর আমলে এটি হল প্রথম মন্দির। এ ছাড়া দাঁইহাটে কিশোর-কিশোরীর মন্দির ও একটা প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন, যা পরবর্তীকালে বর্গী হাঙ্গামার সময় ভাস্কররামের শিবিরে পরিণত হয়েছিল এবং প্রাসাদের সন্নিকটবর্তী গঙ্গার ঘাটের পাশে দশেরা উৎসবের সময় (নবমীর দিন) আলিবর্দী মারাঠা শিবির আক্রমণ করেন। কীর্তিচাঁদের আমলে নির্মিত কালনার পঁচিশ রত্নবিশিষ্ট 'লালজি মন্দির' অপূর্ব শিল্পকর্মের জন্য আজও বিস্ময় উদ্রেক করে। বর্ধমানের জমিদার বংশের আদি-বাসস্থান বৈকুণ্ঠপুরে তিনি গোপেশ্বর শিবমন্দির (১৬৫৪ শকাব্দ) নির্মাণ করান। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিত্রসেনের নামে বর্ধমান ও কালনায় দুটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আউসগ্রাম থানার দিগনগরের সন্নিকটে হাটকীর্তিনগরে যে গঞ্জটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা আজও তাঁর নাম ও কীর্তিকে অক্ষয় করে রেখেছে।

তাঁর নানা প্রজাহিতৈষী কাজের মধ্যে মঙ্গলকোট থানার অধীনস্থ যাগেশ্বরডিহিতে (বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ রাস্তার পাশে) হ্রদতুল্য এক সুবিশাল পুষ্করিণী ও সম্ভবতঃ এই গ্রামে 'যজ্ঞেশ্বর শিবলিঙ্গ' তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কিছু কিংবদন্তীও জড়িত আছে এবং এ বিষয়ে একটা লোকগাথা কীর্তিচাঁদের কীর্তিকে আজও বিখ্যাত করে রেখেছে। লোকগাথাটির ধুয়ো হল,—

"রাজা রাজ বলহো, রাজা রাজা বল।
যাগেশ্বরে দিয়ে দীঘি নাম রে রহিল॥"

কীর্তিচাঁদের বিদ্যোৎসাহিতা সাহিত্যানুরাগ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষকতার কথা সমসাময়িককালে রচিত মঙ্গলকাব্যেও পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের কয়েকজন মঙ্গলকাব্যের কবি তাঁকে অমর করে রেখেছেন। ধর্মমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর বাসস্থান ছিল দামোদরের দক্ষিণে কৈয়ড় পরগণার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামে। কবি ঘনরাম ১৬৩৩ শকাব্দের (১৭১১ খ্রীস্টাব্দ) অগ্রহায়ণ মাসে শুক্রবার তৃতীয়া তিথিতে 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। কীর্তিচাঁদের প্রশস্তি প্রসঙ্গে ঘনরামের বারংবার উক্তি হল,—

"অখিলে বিখ্যাত কীর্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তী
কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান॥
চিন্তি তার রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥"

উভয়ের সম্পর্ক যে অতি মধুর ছিল সেকথা কবির বর্ণনাতেই পাওয়া যায়,—

"জগত রায় পুণ্যবন্ত পুণ্যের প্রভায়।
মহারাজ চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তিচন্দ্র রায়॥
আশীর্বাদ করি তায় বসিয়া বিরামে।
কইয়ড় পরগণা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রামে॥

কীর্তিচাঁদের অসামান্য গুণগ্রাহিতা ও পণ্ডিতজনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল থাকায় ঐ যুগের সারা বঙ্গদেশের মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে বিস্তর নিষ্কর ভূমি ও ত্রিবেণীতে একটা পুষ্করিণী দান করেন। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁর কীর্তি প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

"ত্বৎকীর্তিচন্দ্রমুদিতং গগনে নিশাম্য
রোহিণ্যপি স্বপতি সংশয়জাতশঙ্কা।
শ্রীকীর্তিচন্দ্রনৃপ কজ্জললাঞ্ছনেন
প্রেয়াংসমঙ্কয়দদো ন বিধো কলঙ্কঃ॥"

অনুবাদঃ "হে মহারাজ কীর্তিচন্দ্র॥ তোমার কীর্তি চন্দ্রের ন্যায় আকাশে উদিত হয়েছে। এ দেখে চন্দ্রের পতিব্রতা পত্নী রোহিণীরও মনে শঙ্কা হল যে পাছে তাঁর স্বামীকে চিনতে না পারেন; এই ভেবে তিনি নিজের স্বামীর গায়ে একটি দাগ দিলেন, তাই এটি চন্দ্রকলঙ্ক হয়।"[৩১] উপরোক্ত উপমাটি সত্যই শ্লাঘার বিষয়।

কীর্তিচন্দ্রের জীবদ্দশায় উত্তরে ফতেসিং পরগণা হতে দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদের মোহনায় মণ্ডলঘাট পরগণা এবং পূর্বে ভাগীরথীর পশ্চিম তীর (সাতসৈকা পরগণা ও সরস্বতী নদীর পূর্বাঞ্চল বাদে) হতে পশ্চিমে পঞ্চকোট পর্যন্ত স্বীয় অধিকারে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

জমিদার কীর্তিচাঁদকে নিয়ে বর্গী হাঙ্গামার যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তা ইতিহাস সম্মত নয়। বর্গী হাঙ্গামার সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন না। লোকগাথার

রচয়িতা অথবা গঙ্গারাম দত্ত কীর্তিচাঁদের চরিত্রের বীরত্বব্যঞ্জক দিক তুলে ধরতে গিয়ে এরূপ অনৈতিহাসিক ঘটনা তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন এবং সেটাই জনমানসে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

সুদীর্ঘ ৩৮ বছর কাল প্রবল প্রতাপের সঙ্গে জমিদারী পরিচালনা করার পর পরিণত বয়সে ১১৪৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে তিনি পরলোকগমন করেন। দাঁইহাট শহরে গঙ্গার তীরে সমাজবাড়ীতে তাঁর অস্থি সমাধিস্থ করা হয়েছিল। সমাজবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত খোদিতলিপি হতে একথার সমর্থন মেলে। তাঁর মৃত্যুকালে মাতা ব্রজকিশোরী, স্ত্রী রাজরাজেশ্বরী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিত্রসেন রায়, পুত্র চিত্রসেন রায় ও ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রিলোকচাঁদ রায় জীবিত ছিলেন। বস্তুতঃ রাজা বা মহারাজা উপাধিপ্রাপ্ত না হয়েও স্বীয় কীর্তির জন্য কীর্তিচাঁদকে বর্ধমান অঞ্চলের লোকেরা রাজা বলে জানত এবং মান্য করত। সমসাময়িককালে রচিত কবিদের মঙ্গলকাব্য হতে একথার সমর্থন মেলে। কালনার লালজি মন্দিরে খোদিত "যৎ-পুত্রাঃ পৃথিবীতলে সুবিদিতাঃ সৎ-কৃর্তিচন্দ্রঃকৃতী" লিপিখানি ঐ একই কথাই আজও ঘোষণা করছে।

৫

রাজা চিত্রসেন রায় (১৭৪০-৪৪):

১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে কীর্তিচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র চিত্রসেন রায় বর্ধমান জমিদারীর অধিকার লাভ করেন এবং ঐ বৎসরে রমজান মাসে সম্রাট মহাম্মদ শাহ প্রদত্ত ফরমান বলে রাজা উপাধিসহ চাকলা বর্ধমানের জমিদারী প্রাপ্ত হন।[৩২]

চিত্রসেন নিজের জমিদারী ও বর্ধমান শহরকে সুরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন এবং এই কাজের প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁর পিতার আমলের দেওয়ান মানিকচাঁদ। মুর্শিদাবাদের নিজামতে মানিকচাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। পঞ্চকোট, বীরভুম ও বিষ্ণুপুরের জমিদারগণের আক্রমণ হতে রক্ষা পাবার জন্য রাজগড়ে একটা দুর্গ নির্মাণ করান; যার অস্তিত্ব এই শতকের প্রথমভাগেও বর্তমান ছিল। এছাড়া অজয়নদের দক্ষিণতীরে বীরভুম সীমান্ত সুরক্ষার জন্য জঙ্গলের মধ্যে সেনপাহাড়ীতে অপর একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন এবং সেখানে পারসী অক্ষরে উৎকীর্ণ রাজা চিত্রসেনের নামাঙ্কিত কামান পাওয়া যায়।[৩৩]

চিত্রসেনের সময়ে সুবাবাংলার রাজনীতি ছিল ঘটনাবহুল। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল আলিবর্দী খাঁ কর্তৃক নবাব সরফরাজ খাঁ গিরিয়ার প্রান্তরে নিহত হওয়ায় প্রথমাবস্থায় আলিবর্দী খাঁ বাংলার প্রতিষ্ঠিত জমিদার ও মুর্শিদাবাদের দরবারে উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের অনুগ্রহ লাভের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। রাজা চিত্রসেনের দেওয়ান মানিকচাঁদের কর্মকুশলতার গুণে মুর্শিদাবাদের দরবারে চিত্রসেনের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সমসাময়িককালের ঘটনাপঞ্জী হতে অনুমান করা যায় যে, চিত্রসেন

মুর্শিদাবাদের দরবারে নিয়মিত হাজিরা দেওয়ার হাত হতে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন, যেখানে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকতে হত। নদীয়ার রাজবংশের সঙ্গে বর্ধমান রাজবংশের সুসম্পর্ক ছিল না। ক্ষিতীশ বংশাবলিতে উল্লিখিত আছে যে, বর্ধমানাধিপতির দেওয়ান মানিকচাঁদ নদীয়ারাজের দেওয়ান রঘুনন্দনকে নবাব দরবারে অপমান করায় রঘুনন্দন তাঁকে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে উত্তর প্রদান করেন। অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত মানিকচাঁদ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বর্গী হাঙ্গামার সময় মানিকচাঁদ বর্ধমান হতে পলায়ন করে মুর্শিদাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও নবাব দরবারে কর্মে নিযুক্ত হন। নবাব দরবারে নিযুক্ত হয়ে রঘুনন্দনের উপর প্রতিশোধের উপায় খুঁজতে থাকেন। হুগলী হতে মুর্শিদাবাদে রাজস্ব প্রেরণের সময় নদীয়ারাজের জমিদারীর অন্তর্গত পলাশীতে ঐ অর্থ লুণ্ঠিত হলে সমস্ত দোষ দেওয়ান রঘুনন্দনের উপর বর্তায়। তাঁকে গর্দভ পৃষ্ঠে বসিয়ে নগর ভ্রমণ করানোর পর তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়।[৩৪]

১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে বর্গী হাঙ্গামার সময়ে ভাস্কররামের অধীনে ২০ হাজার মারাঠা অশ্বারোহী লুণ্ঠন ও চৌথ আদায়ের জন্য বর্ধমানে উপস্থিত হলে এতদঞ্চলের অধিবাসীগণ অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের মধ্যে পতিত হয়। বর্গী হাঙ্গামার প্রারম্ভেই দেওয়ান মানিকচাঁদ প্রাণভয়ে বর্ধমান হতে পলায়ন করায় নবাব আলিবর্দী খাঁ ও রাজা চিত্রসেন উভয়েই গভীর সঙ্কটে পতিত হন।[৩৫] এই সময়ে বর্ধমান শহরকে রক্ষা করার নিমিত্ত তালিতগড়ে মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা গড় নির্মাণ করা হয়। কিন্তু বর্গী হাঙ্গামার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেলে চিত্রসেন ভাগীরথীর পূর্বতীরে মুলাজোড়ের নিকট কাউগাছি গ্রামে পলায়ন করেন। তাঁর সভাকবি বাণেশ্বর তর্কালঙ্কার রচিত 'চিত্রচম্পু' নামক খণ্ডকাব্যে এ সকল সংবাদ জানা যায়।[৩৬] এখানেও কবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে রাজার কর্মচারী রামচন্দ্র নাগের বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় কবি 'নাগাষ্টক' রচনা করে তাঁর মনের জ্বালা মিটিয়েছেন।

চিত্রসেন মাত্র চার বছর বর্ধমান জমিদারীতে অধিষ্ঠিত থেকে ভগ্নমনোরথ চিত্তে বাংলা ১১৫১ সালে (ইং ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দ) রাসপূর্ণিমার পূর্বদিনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর ছত্রকুমারী ও ইন্দ্রকুমারী নাম্নী দুই পত্নী জীবিত ছিলেন। অপুত্রক অবস্থায় চিত্রসেন ইহলোক ত্যাগ করায় মৃত্যুর পূর্বে খুল্লতাত পুত্র ত্রিলোকচাঁদকে উত্তরাধিকারী (দত্তক?) মনোনীত করে যান।

৬

মহারাজা ত্রিলোকচাঁদ রায় (১৭৪৪-৭০):

১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে অপুত্রক অবস্থায় রাজা চিত্রসেন রায় পরলোকগমন করায় তাঁর খুল্লতাতের পুত্র (জগৎরাম রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ও কীর্তিচাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার মিত্রসেন রায়ের একমাত্র পুত্র) ত্রিলোকচাঁদ রায় বর্ধমান

জমিদারীর অধিকার প্রাপ্ত হন। জমিদারীপ্রাপ্তির কাল হতে আমৃত্যু তাঁকে কঠোর সংগ্রাম ও কুটকৌশল অবলম্বন করে জমিদারী পরিচালনা ও রক্ষা করতে হয়েছিল।

ত্রিলোকচাঁদ হিজরী ১১৬৭ অব্দে (১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দ) সম্রাট মহাম্মদ শাহের ফরমান বলে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন এবং পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৪৭ খ্রীস্টাব্দে রাজাবাহাদুর উপাধিসহ চার হাজার অশ্বারোহী ও দু'হাজার পদাতিক সৈন্য রাখার অনুমতি লাভ করেন। ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট আহম্মদ শাহের ফরমান বলে তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ব্যবহারের অনুমতি লাভ করেন।[৩৭]

ত্রিলোকচাঁদ ছিলেন স্বাধীনচেতা জমিদার। বাংলার নবাব ও দিল্লীর বাদশাহের অনুগ্রহ লাভ করলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল না। ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে মহারাজা ত্রিলোকচাঁদের সঙ্গে ইংরাজদের মনোমালিন্য ঘটে এবং রাজা ক্ষীরপাই-এর ফ্যাক্টরী ও বর্ধমানের অন্যান্য স্থানে অবস্থিত কোম্পানির বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করার নির্দেশ দান করেন। এই কার্যের বিরুদ্ধে ইংরাজগণ নবাব আলিবর্দী খাঁর স্মরণাপন্ন হন এবং ১লা এপ্রিল তারিখের এক পত্রে রাজার ঔদ্ধত্য ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নবাবের নিকট প্রতিবাদপত্র দাখিল করেন। নবাবের নির্দেশ, মহারাজা চৌকি বসিয়ে ইংরাজকুঠি বন্ধ করেছিলেন, তা উঠিয়ে নেওয়ার আদেশও জারী হয়েছিল বলে জানা যায়।[৩৮]

সিরাজদৌলাকে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর নূতন নবাব মীরজাফর খান ইংরাজদের অনুগ্রহে মুর্শিদাবাদের মসনদ অধিকার করেন। পলাশীর যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণ বাবদ মীরজাফর কোম্পানিকে ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে, চাকলা বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব হস্তান্তর করে নিষ্কৃতি পেলেও[৩৯] কোম্পানির সঙ্গে ত্রিলোকচাঁদের সুসম্পর্ক না থাকায় বর্ধমান জমিদারীর রাজস্ব মুর্শিদাবাদের রায়রায়াণের মাধ্যমে আদায় হত।

মীরজাফর খানের পদচ্যুতির পর ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের এক চুক্তিতে তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে বাংলার নবাবরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ঐ বছরের ১৭ই নভেম্বর তারিখের কোম্পানির কার্যবিবরণী হতে জানা যায় যে, চাকলা বর্ধমানসহ মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের সনদ ইতিমধ্যেই নবাব মীরকাশিম খানের নিকট ১৫ই অক্টোবর (১লা কার্তিক, ১১৬৬ সাল) তারিখে কোম্পানির হস্তগত হয়েছিল।[৪০]

নূতন সনদ লাভের পর ত্রিলোকচাঁদের সঙ্গে কোম্পানি ও মীরকাশিমের বিরোধ যে চরম পর্যায়ে পেঁাছেছিল, তা তিন পক্ষের পত্রাবলী হতে জানা যায়। মীরকাশিমের চরেরা সংবাদ সংগ্রহ করে কোম্পানির কর্মকর্তাদের নিকট পেঁাছে দিত। বর্ধমান, বীরভুম ও মেদিনীপুরের জমিদারগণ (ঐ সময়ে মেদিনীপুরে বহু জমিদার ছিলেন) বিদ্রোহ করতে পারে, এই সংবাদ মীরকাশিম কর্তৃক কলিকাতায় প্রেরিত হলে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ত্রিলোকচাঁদও প্রায় ১৫ হাজার পদাতিক সংগ্রহ করেন, যা

অনেকে ফকির বিদ্রোহের প্রথম পর্যায় বলে মনে করেছেন। বর্ধমানের রাজাকে উচিত শিক্ষা দেবার সুযোগ গ্রহণ করে কোম্পানি প্রয়োজনীয় সৈন্যবাহিনীসহ বর্ধমান অভিযান করে; মীরকাশিমের পত্রাবলী হতে এসকল তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ইতিপূর্বের ঘটনাবলী স্মরণ রেখে ইংরাজগণ নবাবের কথামত সহসা বর্ধমান আক্রমণ করে নাই। মেদিনীপুরের জমিদারগণকে মীরকাশিম কোম্পানির সহায়তায় দমন করেন। অতঃপর নবাবসৈন্য সহসা বীরভুমের জমিদার আসাদ জামান খানকে আক্রমণ করায় তিনি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ত্রিলোকচাঁদ ও আসাদ জামান খান সম্পর্কে প্রচলিত ইতিহাস নীরব হলেও ত্রিলোকচাঁদ সম্পর্কে এক সরকারী প্রতিবেদনে জানা যায়,[৪১]—"**The early days of British rule in Burdwan were trouble ones. The Burdwan Raja was against this transfer of Government and rallied aganist the British authorities but Major White completely defeated him on the 29th December, 1760.**"

অপরদিকে মীরকাশিমের নিযুক্ত সুলেমান বেগ নামক গুপ্তচরের নিকট সংবাদ পাওয়া যায় যে, রাজা ১৫০০০ হাজার সিপাহী সংগ্রহ করছেন এবং কোম্পানির কর্ম-কর্তাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত আরও ছোটখাট ঘটনা তাঁদের নজরে আনার চেষ্টা করেন। মীরকাশিমের নবাবী ও ইংরাজদের বর্ধমানের দেওয়ানী উপঢৌকন দেওয়ার বিষয় ত্রিলোকচাঁদ যে নির্বিধায়ভাবে মেনে নেয় নাই সে খবরও কলিকাতায় পৌঁছেছিল। মীরকাশিম কলিকাতার কাউনসিলে আরও অভিযোগ করেন যে, বর্ধমানের ভুতপূর্ব জমিদার কীর্তিচাঁদ রায় চিতুয়া, বরদা ও চন্দ্রকোনার জমিদারী অধিকার করে নবাব সুজাউদ্দিনের নিকট ফরমান আদায় করেছিলেন এবং ঐ ফরমান বাতিল করে পূর্বোক্ত জমিদারগণের বংশধরদের ফিরিয়ে দিলে বর্ধমানের রাজা আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে।[৪২]

১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের শেষ ভাগে কোম্পানির সঙ্গে রাজার বিবাদ এরূপ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, উভয়পক্ষ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। হগ ওয়াটস, হলওয়েলকে যে পত্র প্রেরণ করেন তা'হতে জানা যায় যে, ব্রাউনের অধীনে ২০০ জন সৈন্যের একটি দল বর্ধমান অভিযান করতে গেলে রাজাও ৭।৮ শত সিপাহী নিয়ে বাধা প্রদান করেন। এই সংঘর্ষে কোম্পানির ৪৫জন সিপাহী মারা যায় এবং ৫৭জন গুরুতররূপে আহত হয়েছিল। রাজা প্রায় ৫০০০ হাজার পাইক-বরকন্দাজ সংগ্রহ করছে, এ খবর পেয়ে ইংরাজগণ শহরের দিকে আর অগ্রসর হয় নাই। ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে বীরভুমের নূতন জমিদার সেরগড়, সেনপাহাড়ী, গোয়ালাভুম, আজমৎশাহী, মজঃফরশাহী ও মনোহরশাহী পরগণা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করলেও ত্রিলোকচাঁদের পত্রে জানা যায় যে, কোম্পানি এর কোন প্রতিকার করে নাই।[৪৩]

উত্তরোত্তর রাজস্ব বৃদ্ধির দাবী মেটাতে অক্ষম হওয়ায় রাজা বর্ধমান শহর হতে পলায়ন করে সপরিবারে আত্মগোপন করায় ক্যাপ্টেন মার্টিন হোয়াইটের নেতৃত্বে একদল

সৈন্য দামোদরের দক্ষিণ তীরে শিবির স্থাপন পূর্বক অপেক্ষা করতে থাকে এবং রাজার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথে না যেতে হোয়াইটকে নিষেধ করা হয়েছিল। সৈন্যদলকেও কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় তারা যেন স্থানীয় জনসাধারণের উপর কোনরূপ অত্যাচার না করে ; কারণ দেওয়ানগঞ্জের ঘটনা সম্পর্কে কোম্পানির কর্মকর্তাগণ সচেতন ছিলেন। ইংরাজ সৈন্যদল কলিকাতা হতে হুগলীর পথে কালনায় উপস্থিত হয় এবং সেখান হতে তারা বর্ধমানের পথে অগ্রসর হতে থাকে। কলিকাতা হতে সংক্ষিপ্ততম পথে না গিয়ে দীর্ঘতম পথে অভিযানের (মার্চপাস্ট) অর্থ হল এতদঞ্চল কোম্পানির অধীন, একথা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া ও রাজাকে ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা অধীনতা স্বীকার করানো।

রাজা সেনপাহাড়ী দুর্গে অবস্থানরত আছেন এই সংবাদ অবগত হয়ে মেজর হোয়াইট সেনপাহাড়ী দুর্গ অবরোধ করে কামানগুলি দখল করে নেয় ও দুর্গের অন্যান্য দ্রব্যও লুণ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এরপর কিল্লাদার হায়ার সিংকে বন্দী করে দুর্গটিকে প্রহরী বেষ্টিত করে রাখা হয়।[৪৪] সম্ভবতঃ ত্রিলোকচাঁদ এই সময়ের পূর্বে সেনপাহাড়ী ত্যাগ করেছিলেন। ক্লাইভ দ্বিতীয়বার ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পর কোম্পানির সঙ্গে ত্রিলোকচাঁদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। ক্লাইভের সঙ্গে সম্রাটের সাক্ষাতের সময় মিঃ সামনার বর্ধমানের রাজার জন্য রাজাধিরাজ উপাধি, ঝালরদার পালকি ও শিরোপা প্রার্থনা করায় দেওয়ান নবকৃষ্ণ মুন্সী নিজ তহবিল হতে ১০ হাজার টাকা ব্যয় করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য রাজরাজেন্দ্র উপাধি ও শিরোপা প্রার্থনা করেন। কিন্তু ত্রিলোকচাঁদের ভাগ্যে সম্রাটের আনুকূল্য বর্ষিত হলেও এ যাত্রায় কৃষ্ণচন্দ্রের প্রার্থনা নিষ্ফল হয়। অবশ্য কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সম্রাটের নিকট হতে রাজরাজেন্দ্র উপাধিসহ ঝালরদার পালকি ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছিলেন।[৪৫]

মীরকাশিমের পরাজয়ের পর ইংরাজদের সঙ্গে ত্রিলোকচন্দ্রের একটা আপোস-মীমাংসা হওয়ায় কোন সংঘর্ষের সংবাদ জানা যায় না। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের এক ফরমান বলে তিনি 'রাজাবাহাদুর' উপাধি পান। পুনরায় ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিসহ ৫০০০ হাজার পদাতিক ও ৩০০০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য রাখার অনুমতি লাভ করেন। ত্রিলোকচাঁদ সম্রাটের নিকট হতে যে-রূপে শেষ ফরমানখানি লাভ করেছিলেন, ঐ যুগে বহু জমিদারের এটি আকাঙ্ক্ষিত ও ঈপ্সিত ছিল। হিজরী ১১৮১ অব্দের রমজান মাসের ১৪ই তারিখে (১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দ) প্রধান সেনাপতি মারফৎ তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি ব্যবহারের ফরমান লাভ করেন। এছাড়া সম্রাট প্রদত্ত ফরমানে আরও উল্লেখিত ছিল যে, তিনি সৈন্যবাহিনীতে পাঁচ হাজার পদাতিক, তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও কামান ব্যবহারের অধিকারপ্রাপ্ত এবং সৈন্যবাহিনীতে সামরিক বাদ্য ব্যবহারের অনুমতি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্মান।[৪৬] এ উপাধি সেকালে বাংলার অপর কোন জমিদারের ছিল না। প্রসঙ্গতঃ

উল্লেখ করা যায় যে, ইতিপূর্বে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট তিন হাজার টাকার মূল্যের তিন প্রস্থ খিলাত পেয়েছিলেন (হস্তী ২০০০ টাকা, পোষাক ৬০০ টাকা ও শিরপেচ ৪০০ টাকা)।

১৭৪৪-১৭৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৬ বছরের মধ্যে তিনি নিরুপদ্রবে এক বছরও কাল কাটাতে পারেন নাই। সেকারণে তাঁর সময়ে বর্ধমানে বা রাজসভায় সাহিত্যচর্চার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মেদিনীপুর জেলার কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন এরূপ মনে করা যায়। এছাড়া রাজপরিবারের দেওয়ান চুপী নিবাসী ব্রজকিশোর ও তাঁর পুত্র নন্দকুমারের শাক্তপদ রচনার জন্য খ্যাতি ছিল। পরবর্তীকালে ব্রজকিশোরের পুত্র অকিঞ্চনও রাজঅনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। বাংলার সর্বপ্রধান জমিদার হিসাবে ত্রিলোকচাঁদ বহু জনহিতকর কাজ করেছেন। তাঁর আনুকুল্যে যে সকল টোল, দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ভূমিদানই তাঁর অক্ষয়কীর্তিকে আজও স্মরণ করছে।

ত্রিলোকচাঁদের সময়ে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে যে সকল দেবায়তন নির্মিত হয়েছিল, স্থাপত্য ও অলঙ্করণের বিচারে সেগুলি ছিল শ্রেষ্ঠতর। তাঁর সময়ে কালনা শহরে পঁচিশ রত্নবিশিষ্ট কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপালজী মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া কালনায় অনন্তবাসুদেব, রূপেশ্বর শিব, ভুবনেশ্বর শিব, কাশীনাথ শিব, বিজয় বৈদ্যনাথ শিব মন্দির নির্মাণ করান। বর্ধমান শহরে রাজবাড়ীর পার্শ্বে লক্ষ্মী-নারায়ণজীউ মন্দির তাঁর আমলে নির্মিত হয়েছিল। শোনা যায় যে, রাজবাড়ীর একাংশের নির্মাণকার্য তাঁর আমলেই শুরু হয়েছিল (যেখানে বর্তমানে 'উয়োমেন্স কলেজ' স্থাপিত হয়েছে) এবং এই অট্টালিকার নির্মাণকার্য তেজচন্দ্রের আমলে শেষ হয়। ত্রিলোকচাঁদের আমলে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলি তাঁর কীর্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

সারাজীবন ধরে সংঘর্ষ ও সংঘাতের মধ্যে জমিদারী পরিচালনা করে এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সুবিধাভোগী কর্মচারীগণের হাত হতে পৈত্রিক ও স্বীয় অধিকৃত জমিদারী পরিচালনা করে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ১১৭৭ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে, ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দ) সাবিত্রী চতুর্দশী তিথিতে মহারাজাধিরাজ ত্রিলোকচাঁদ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে দুই পত্নী, এক পুত্র ও দুই কন্যা রেখে যান। তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী বিষণকুমারী ছিলেন সেরগড় পরগণার অন্তর্গত উখরা গ্রামের মেহেরচাঁদ হাণ্ডের কন্যা ও বক্তারসিংহ হাণ্ডের ভগিনী। মেহেরচাঁদ লাহোরের মচ্ছিহাট্টা হতে বর্ধমানে আসেন এবং রাজানুগ্রহ ও পত্তনীদারী বন্দোবস্তের দরুণ এই বংশ এখনও উখরায় বসবাস করছে। মহারানী বিষণকুমারীর গর্ভে একমাত্র পুত্র তেজচন্দ্র ১১৭১ সালের ৬ই মাঘ (১৭ই জানুয়ারী, ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দ) জন্ম-গ্রহণ করেন এবং তোতাকুমারী ও চিত্রকুমারী নাম্নী কন্যাদ্বয়ের সঙ্গে লাহোর নিবাসী আলমচাঁদ শেঠ ও দয়াচাঁদ শেঠের বিবাহ হয়েছিল। মৃত্যুকালে মহারাণী বিষণ-

কুমারী ও সুযোগ্য দেওয়ান রূপনারায়ণ চৌধুরীর উপর নাবালক পুত্র ও জমিদারী পরিচালনার ভার অর্পণ করে যান।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, কোম্পানি ও নবাবের দ্বৈতশাসন এবং কোম্পানির রাজস্বনীতির ফলে ত্রিলোকচাঁদের কোষাগার এরূপ শূন্য হয়েছিল যে, ৪২ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারের উত্তরাধিকারীকে তাঁর পারলৌকিকক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত কোম্পানির নিকট অর্থ কর্জ করতে হয়েছিল। অথচ ইংরাজ রেসিডেণ্টগণের প্রদত্ত বিবরণে তাঁর সম্পর্কে বহু ভুল তথ্য তুলে ধরা হলেও পিটারসন ত্রিলোকচাঁদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,[৭]—"The Maharaja of Burdwan whose province had been the first to cry out and the last to which plenty returned, died miserably towards the end of the famine, leaving a treasury so empty that the heir had to melt down the family plate, and, when this was exhausted, to beg a loan from the government in order to perform his father's obsequies."

৭

মহারাজা তেজচন্দ্র রায় (১৭৭০-১৮৩২):

১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে (বাংলা ১১৭৭ সাল) মহারাজা ত্রিলোকচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর ছ'বছর বয়স্ক নাবালক পুত্র তেজচন্দ্রের অভিভাবকরূপে মাতা মহারানী বিষণকুমারী দেবী জমিদারী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ তেজচন্দ্রের জমিদারীর দায়িত্ব তাঁকে দিতে অনিচ্ছুক থাকলেও বিষণকুমারীর বুদ্ধিমত্তার জন্য তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। অবশ্য এর জন্য তাঁকে প্রচুর ঘুষ দিতে হয়েছিল। মহারানী তাঁর পুত্রের পদপ্রাপ্তির জন্য দশ সহস্র মুদ্রা নজরানাসহ এলাহাবাদে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট আবেদন করেন। হিজরী ১১৮৪ সনের ১২ সওয়াল ১২ জুলুস (১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে) তারিখে এলাহাবাদের দরবার হতে প্রধান সেনাপতি সয়ফৎ-উদ্-দৌল্লা মীরসারেফ খাঁর মাধ্যমে তেজচন্দ্রকে মহারাজাধিরাজ উপাধিসহ ৫০০০ পদাতিক সৈন্য, ৩০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, কামান, সামরিক বাদ্য, ঝালরদার পাল্কি ও তোগ (পতাকা) ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়।[৪৮]

১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল পদে ওয়ারেন হেস্টিংস্-এর নিযুক্তির পর বর্ধমান জমিদারীর দেওয়ান মনোনীত করার বিষয়ে সপারিষদ গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে বিষণকুমারীর মতান্তর শুরু হয় এবং তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও ত্রিলোকচাঁদের আমলের দেওয়ান রূপনারায়ণ চৌধুরীর পরিবর্তে চুপী নিবাসী ব্রজকিশোর রায়কে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করা হয়। দেওয়ান নিযুক্তির ব্যাপারে বর্ধমানের রেসিডেণ্ট জন গ্রাহাম ও পরবর্তী রেসিডেণ্ট চার্লস স্টুয়ার্ট উভয়েই দু'লক্ষ টাকা হিসাবে উৎকোচ গ্রহণ করেছিলেন।[৪৯] ব্রজকিশোরের সঙ্গে প্রথমাবধি মহারানীর বিরোধ ছিল এবং

বর্ধমানের রেসিডেণ্ট স্বাভাবিক কারণেই দেওয়ানের পক্ষাবলম্বী হয়েছিলেন। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে মহারানী কাউনসিলে অভিযোগ আনেন যে, ব্রজকিশোর ও রেসিডেণ্ট, হেস্টিংসের সম্মতিতে তাঁর নাবালক পুত্রের আয় ও সম্পত্তির অপচয় ঘটাচ্ছে। হেস্টিংসের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও কাউনসিলে ব্রজকিশোরকে আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদান করতে বাধ্য করা হয়। মহারানীর অভিযোগে আরও জানা যায় যে, বর্ধমান জমিদারী হতে হেস্টিংস ১৫০০০ টাকা, তাঁর দেশীয় সেক্রেটারী কানাইলাল ৫০০০ টাকা ও সহকারী কাশীলাল ৫০০ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেন। বিরোধী সদস্যগণ কর্তৃক আনীত প্রস্তাবে হেস্টিংসের পক্ষীয়গণ তীব্র বিরোধিতা করলেও[৫০] ব্রজকিশোর রায়ের অর্থনৈতিক অপরাধের সঙ্গে হেস্টিংস জড়িত না থাকলে তদন্তের স্বপক্ষে তাঁর বিরোধিতার অপর কোন গ্রহণযোগ্য কারণ ছিল না।

১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী কাউনসিলের আদেশে ব্রজকিশোরকে বরখাস্ত করে মহারানীর হস্তে দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং এ কাজের জন্য কাউনসিলের সদস্যগণ দু'লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেন। ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দ হতে ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মহারানী নিজে জমিদারী পরিচালনা করেও রাজস্ব জমা দিতে অক্ষম হওয়ায় ১৫ বছর বয়স্ক তেজচন্দ্রকে জমিদারীর ভার অর্পণ করা হয়।

বিষণকুমারীর পরিচালনাধীনে ১৭৭৯-৮০ খ্রীস্টাব্দে জমিদারীর দেয় রাজস্ব ৬ লক্ষ টাকা উসুল দিতে না পারায় হেস্টিংস ও নবকৃষ্ণ মুন্সীর গোপনচক্র সক্রিয় হয়ে উঠে এবং ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের ২১শে জুলাই হেস্টিংসের পরামর্শে নবকৃষ্ণ বর্ধমানের সাঁজোয়াল পদের জন্য আবেদন জানায়। নবকৃষ্ণ বর্ধমান জমিদারীর বকেয়া রাজস্ব পরিশোধের জন্য তেজচন্দ্রকে বাৎসরিক ১২% হার সুদে ৯ লক্ষ টাকা কর্জ দেন।[৫১]

৪ঠা আগস্ট নবকৃষ্ণ বর্ধমানের সাঁজোয়াল নিযুক্ত হন এবং এই পদে তিনি ১৮ মাস বহাল ছিলেন। প্রথম বছরে তিনি রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করলেও পর বৎসর বিশেষভাবে অকৃতকার্য হন এবং বাংলা ১১৮৮ সালে তাঁর সাঁজোয়াল পদের কার্যকাল শেষ হয়। নবকৃষ্ণের পদচ্যুতির পর ২০ বছর বয়সী যুবক তেজচন্দ্র জমিদারী পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই সময় নবকৃষ্ণ ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মনোনীত কয়েকজন ব্যক্তি সদাসর্বদা তেজচন্দ্রকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করে। ফলে বিলাস-ব্যসনে মগ্ন হয়ে তিনি জমিদারী পরিচালনা বিষয়ে কার্যত অত্যধিক অমনোযোগী হওয়ায় বাকী খাজনার দায়ে তাঁর কয়েকটি পরগণা নিলাম হয়ে যায়। জমিদারীর অবস্থা পরিবর্তনের জন্য পরবর্তী কালেক্টর সামুয়েল ডেভিসের সুপারিশে জমিদারী পরিচালনার ভার পুনরায় বিষণকুমারীকে অর্পণের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হয়। রাজস্ববোর্ডের সভাপতি উইলিয়াম কুপারকে লিখিত কালেক্টর সামুয়েল ডেভিসের পত্রে (১১. ১০. ১৭৯৩) জানা যায় যে, মহারানীর অংশের জন্য দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৯, ৯৯, ৫৮৩ টাকা ১৩ আনা ১১ পাই ২ কড়ি।[৫২] অতঃপর মাতা ও পুত্র পৃথকভাবে জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব পান এবং ১৭৯৮

খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিষণকুমারীর মৃত্যু পর্যন্ত এরূপ বন্দোবস্ত বহাল ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বর্ধমান জমিদারীর অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে চলে যায়। কিন্তু ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে তেজচন্দ্র কোম্পানির নিষেধ সত্ত্বেও একতরফাভাবে পত্তনীপ্রথার প্রবর্তন করায় তঁার আর্থিক স্বচ্ছলতা শুরু হয় এবং অবশিষ্ট বত্রিশ বছর সুনির্দিষ্ট আয়ের দ্বারা তিনি অত্যন্ত বিলাসবহুল ও জঁাকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করেন। পত্তনীপ্রথার দৌলতে তঁার আয়ের পরিমাণ এরূপ বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ঐ সময়ে তিনি বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী জমিদাররূপে পরিগণিত হয়েছিলেন।

তেজচন্দ্র বিদ্যোৎসাহী ও প্রজানুরঞ্জক জমিদার ছিলেন। বর্ধমানে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন এবং এই সময়ে মিশনারীগণ এখানে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের সময় তাঁর নিকট হতে বিবিধ প্রকার সাহায্য লাভ করেছিল। কলিকাতার হিন্দু কলেজে এককালীন অর্থদানের জন্যে ঐ কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বর্ধমান ও পার্শ্বস্থ জেলার বিভিন্ন স্থানে বহু মন্দির নির্মাণ করেন এবং ঐ সকল মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকে আজও তাঁর কীর্তি ঘোষণা করছে। তেজচন্দ্রের সময়ে বর্ধমান শহরের সন্নিকটে নবাবহাটে ও কালনা শহরে একশ' নয়টি 'শিবমন্দিরক্ষেত্র' নির্মিত হয়েছিল। বর্ধমান শহরে বাঁকা নদীর উপর ও মগরায় সরস্বতী নদীর উপর সেতু দু'টি (প্রথমটি সংস্কার ও দ্বিতীয়টি নির্মাণ) তাঁর জনহিতকর কাজের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তির অধিকারী হয়েও তেজচন্দ্রের পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল। মধ্যযুগের আমীরওমরাহদের ন্যায় আটবার বিবাহের পরও তাঁর একজন বিদেশিনী রক্ষিতা ছিল। মহারানী বিষণকুমারী পর্যন্ত অভিযোগ করেন যে, তঁার পুত্র রাজবাড়ীকে হারেমে পরিণত করেছে। তঁার বিবাহিত আটজন পত্নীর নাম জানা যায়, যথা,—(১) জয়-কুমারী (২) প্রেমকুমারী (৩) সেতাবকুমারী, (৪) তেজকুমারী, (৫) কমলকুমারী, (৬) নানকীকুমারী, (৭) উজ্জ্বলকুমারী ও (৮) বসন্তকুমারী।[৫৩] মোট আটজন পত্নীর মধ্যে নানকীকুমারী ব্যতীত অপর কোন পত্নীর জীবিত সন্তান ছিল না। বাংলা ১১৯৮ সালের ১০ই কার্তিক (২৪শে অক্টোবর, ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দ) নানকীকুমারীর গর্ভে প্রতাপচাঁদের জন্ম হয়। উজ্জ্বকুমারীর গর্ভে তিনটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলেও তারা অতি শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল এবং চতুর্থবারে সন্তান জন্মগ্রহণের সময় ১২৩৩ সালের ১৩ই মাঘ তাঁর মৃত্যু ঘটে।[৫৪]

তেজচন্দ্রের আটবার বিবাহ-সূত্রে প্রচুর আত্মীয়স্বজনের রাজবাড়ীতে অবস্থান হেতু পারস্পরিক বিবাদ শুরু হয় এবং বৃদ্ধ বয়সে তেজচন্দ্রকে এর ফলভোগ করতে হয়েছিল। পারিবারিক অন্তঃকলহ শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রে পরিণত হয় এবং এর ফলে তাঁর একমাত্র পুত্র প্রতাপচাঁদকে বর্ধমান ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। অবশেষে প্রতাপের নিরুদ্দেশ বা অকালমৃত্যু ঘোষিত হওয়ার পর প্রবল প্রতিপক্ষীয়েরা জয়লাভ

করেন। তেজচন্দ্রের পত্নীগণের মধ্যে মহারানী কমলকুমারীর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল এবং তাঁর অদূরদর্শিতার ফলে কমলকুমারীর ভ্রাতা পরাণচাঁদ কাপুরকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করা হয়। কমলকুমারী ও পরাণচাঁদের চক্রান্তে তেজচন্দ্র ও প্রতাপচাঁদ ক্রমশঃ অসহায় হয়ে পড়েন। অবশেষে বৃদ্ধের কামাহুতিতে পরাণচাঁদ তাঁর এগার বছরের কন্যা বসন্তকুমারীকে আহুতি দিয়ে জমিদারীর সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সক্ষম হন। তেজচন্দ্র নামে জমিদার হলেও প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন পরাণচাঁদ। পরাণচাঁদ একাধারে দেওয়ান ও পারিবারিক সম্পর্কে প্রথমে শ্যালক ও পরে শ্বশুর রূপে পরিচিতি লাভ করেন। প্রতাপের গৃহত্যাগের পর পরাণচাঁদ তাঁর কনিষ্ঠপুত্র চুনীলালকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করার পরামর্শ দান করেন। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট (২রা ভাদ্র, ১২৩৯ সাল) ৬৮ বছর বয়সে (৬২ বৎসরকাল জমিদার) ভগ্নহৃদয়ে মহারাজা তেজচন্দ্র রায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

৮

রাজা প্রতাপচাঁদ (১৭৯১-১৮২১ / ১৮৫৬) ঃ

তেজচন্দ্রের ষষ্ঠ পত্নী নানকীকুমারীর গর্ভে প্রতাপচাঁদের জন্ম হয় এবং জন্মের কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর মাতৃ বিয়োগ হওয়ায় পিতামহী মহারানী বিষণকুমারীর নিকট সস্নেহে লালিতপালিত হন। সাত বছর বয়ঃক্রমকালে পিতামহীর মৃত্যু হলে প্রতাপ-চাঁদের ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়। মৃত্যুর পূর্বে বিষণকুমারী দেবীর পরিচালনাধীন জমিদারী তাঁর নামে হস্তান্তরিত হয়।

নাবালক প্রতাপচাঁদের পক্ষে গঙ্গানারায়ণ মিত্র সরবরাহকার বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং মহারানীর এই হস্তান্তর প্রথমে অস্বীকার করলেও এই ব্যবস্থা তেজচন্দ্র ও কালেক্টর মানতে বাধ্য হন। গভর্নমেণ্টের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের পত্রালাপ ও তথ্যাদি হতে জানা যায় যে, প্রতাপ মহারানীর অধিকৃত জমিদারীসহ মহারাজা উপাধি ব্যবহার করার অনুমতি লাভ করেছিলেন। এ বিষয়ে সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যগুলি হল,[৫৫]—

1. 'Letter from Collector of Burdwan, reporting the death of Maharani Bishnu Kumari, the Zamindar of Burdwan and stating that no agent (*Mukhtar*) had appeared, requesting orders thereon. (7728) Dated-13. 11. 1798.'

2. 'Petition from Maharajadhiraj Pratap Chand Bahadur, informing the Board that his grandmother, the Late Rani, left the whole of the Zamindari of Burdwan to him and praying to be allowed to pay the revenue through his agent, and enjoy his estate. (7818) dated-2.1. 1799.'

3. 'Petition from Ganganarayan Mitra, Manager (*Sarbarahkar*) of Maharajadhiraj Pratab Chand, informing the Board that he delivered a petition and a voucher (chalan) for the instalment due to the end of Kartik, together with the Rani's will, to the Collector of Burdwan, who would not accept it, and praying to be allowed to pay the money at Board's Office. (7819) Dated-2.1. 1799.'

4. 'Letter from Collector of Burdwan, in reply to orders of 2nd January requiring a report upon the claim of Maharaja Pratab Chand to the Zamindari of Burdwan, in virtue of a mortgage deed (*Hebanama*) said to have been executed in his favour by the Late Rani. (7999) Dated-9.4. 17799.'

5. 'Letter to Collector of Burdwan, transmitting a letter from the Secretary to Government, and of the Board's address to which it refers regarding the mortgage (*Hebanama*) supposed to have been executed by the Late Rani of Burdwan. (8001) Dated-26.4. 1799.'

সেক্রেটারী হোল্ট ম্যাকেঞ্জী সকাশে প্রেরিত প্রতাপচাঁদের পত্নীদ্বয়ের আবেদনপত্রের বিষয়গুলির সঙ্গে উপরোক্ত রাজস্ববিষয়ক পত্রগুলির বিশেষ পার্থক্য নাই। তাঁরা আবেদনপত্রে জানিয়েছিলেন—"আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামী মহারাজা প্রতাপচন্দ্র বর্ধমানের মহারাজা ৺তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের পুত্র বাঙ্গালা ১২২৭ সালের ২৭শে পৌষ ৺প্রাপ্ত হন এবং আমারদিগকে অর্থাৎ দুই বিধবাকে হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে স্থাবরাস্থাবর তাবদ্বিষয়ে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া যান। আমাদের ৺প্রাপ্ত স্বামীর জীবদ্দশায় অতিবৃহৎ জমিদারী ছিল তাহা কতক তাঁহার পিতামহীর দত্ত কতক তাঁহার পিতার দত্ত কতক তিনি স্বয়ং ক্রয় করেন। আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামীর মৃত্যুর সাত বৎসর পূর্বে তাঁহার পিতা বৃদ্ধ হওয়াতে আপনার পৈতৃক ও স্বোপার্জিত তাবদ্বিষয় দানপত্রের দ্বারা প্রতাপচন্দ্রকে দিয়াছিলেন এবং তাহা দেওয়ানী ও কালেকটরী আদালতে রেজিস্টরী করিয়া দেন।"

প্রতাপচাঁদ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না বটে কিন্তু তাঁর সাহস, বৈষয়িক বুদ্ধি ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য বর্ধমান ও কলিকাতার শিক্ষানুরাগী মহলে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে সক্ষম হন। অপরিণামদর্শী মহারাজা তেজচন্দ্রকে আজীবন নারীসঙ্গদোষে ইন্ধন জুগিয়েছিল কাশীনাথ কাপুরের পুত্র পরাণচাঁদ কাপুর। অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় কাশীনাথ পাঞ্জাব হতে ভাগ্যান্বেষণে বর্ধমানে এসেছিলেন। তাঁর কন্যা কমলকুমারীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তেজচন্দ্র পঞ্চমবার দার পরিগ্রহ করেন এবং এই বিবাহসূত্রে পরাণচাঁদ দেওয়ানের ক্ষমতা লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে বিষণকুমারীর মৃত্যুর পর তেজচন্দ্র, পরাণচাঁদ ও কমলকুমারীর হাতের

ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিলেন। প্রতাপচাঁদের বিষয়বুদ্ধি জ্ঞানের ফলে পরাণচাঁদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তেজচন্দ্র পরলোকগত মাতার সম্পত্তির বিরাট অংশ তাঁর নামে হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। এই সময়ে তিনি সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের অনুগ্রহ লাভ করেন এবং কমলাকান্ত পিতা ও পুত্রের মিলন ঘটানোর চেষ্টা করলেও পরাণচাঁদ সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে সক্ষম হন। বর্ধমানে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, পরাণচাঁদ নানাভাবে তেজচন্দ্রকে কমলাকান্তের বিরুদ্ধে অসম্মানজনক ব্যবহারে প্ররোচিত করায় তিনি মহারাজাকে নির্বংশ হওয়ার অভিশাপ দেন। প্রতাপচাঁদকে দু'বার বিষ প্রয়োগে হত্যার চক্রান্ত করেও পরাণচাঁদ ও কমলকুমারী সফল না হওয়ায় অতি হীন ও জঘন্য চক্রান্তের জালে প্রতাপকে আবদ্ধ করা হয়। হুগলী কোর্টে সাক্ষ্যদানের সময় প্রতাপ-চাঁদ কোন প্রকারেই তাঁর প্রকৃত অপরাধের উল্লেখ না করলেও তাঁর জবানবন্দীতে পাওয়া যায়—"ক্রমে অধিক মদ খাইতে লাগিলাম। শেষে অদৃষ্টদোষে গুরুতর পাপগ্রস্ত হইলাম। তখন কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের নিকট স্বকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ব্যবস্থা দিলেন, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল; তাহা অশক্তে চতুর্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস।" এখন প্রশ্ন জাগে যে মহাপাপটি কোন শ্রেণীভুক্ত! একদিকে বিশাল জমিদারীর মালিক হওয়ার সম্ভাবনা এবং পাপ ব্যক্ত না করার জন্য অপরদিকে চরম দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা অপেক্ষা করে আছে; অথচ পৈত্রিক সম্পত্তি ও জমিদারীর জন্য মামলা দায়ের করেও তিনি তা প্রকাশে অনিচ্ছুক। এক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান (মনুসংহিতা ১০৪-৫/১১) হতে অনুমান করা যায় যে, অপরাধটি ছিল 'গুরুপত্নীগামী' বা 'বিমাতৃগামী'। প্রতাপের দুই সুন্দরী স্ত্রী বর্তমান। এক্ষেত্রে সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা যায় যে, কমলকুমারীর যোগাযোগে ও হীন চক্রান্তের দ্বারা তিনি গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন, অবশ্য তেজচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে এটি ঘটেছিল। সম্ভবতঃ সুরাপানে মত্ত অবস্থায় কমলকুমারী কর্তৃক প্রতারিত হয়ে প্রতাপচাঁদ শাস্ত্রের বিধান অনুসারে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি অন্যান্য দোষে দোষী হলেও নারীঘটিত কোন দুর্বলতা তাঁর ছিল না। হুগলী কোর্টে কোন সাক্ষীই এবিষয়ে ইঙ্গিতও করেন নাই (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

সম্ভবতঃ প্রতাপচাঁদ ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে বর্ধমান ত্যাগ করেন এবং ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতাস্থ বাবু রামরত্ন মল্লিকের পুত্রের বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ছদ্মবেশে থাকা অবস্থাতেও সকলে তাঁকে চিনতে পারায় তিনি বরকে একটি হীরকাঙ্গুলীয় দান করে পুনরায় নিরুদ্দেশ হন। বৃদ্ধ তেজচন্দ্র নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধানে চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করেন এবং বহু প্রচেষ্টার পর এক মুসলমান কর্মচারীর তৎপরতায় তাঁকে রাজমহল হতে বর্ধমানে নিয়ে আসা হয়। প্রায়শ্চিত্ত না হওয়ায় গৃহত্যাগের জন্য অন্য কৌশল অবলম্বন করে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে প্রতাপচাঁদ গুরুতর পীড়ার ভান করেন এবং প্রাণের কোন আশা নাই,

একথা সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে গঙ্গাযাত্রার জন্য তিনি ১৬ই পৌষ কালনায় গমন করেন। কেবলমাত্র রাজবল্লভ কবিরাজ ব্যতীত তাঁর নিজের কোন লোক কালনায় সহগমন করে নাই। এমনকি মহারাজা তেজচন্দ্র ও তাঁর পত্নীদ্বয়ও বর্ধমানে ছিলেন। সংবাদে প্রকাশ যে, মহারাজা প্রতাপচাঁদ স্বাভাবিকরূপে বারদুয়ারী হতে নেমে হস্তীতে আরোহণপূর্বক অম্বিকাতে গমন করেছিলেন।

কালনায় তিন দিন অবস্থানের পর কবিরাজের পরামর্শে অন্তর্জলি করার ইচ্ছায় শেষযাত্রার জন্য রাত্রি দেড় প্রহরের সময় পালকি করে গঙ্গার ঘাটে তাঁকে নিয়ে আসা হয়। এই ঘটনা ঘটেছিল বাংলা ১২২৭ সালের ২১শে পৌষ, বুধবার (ইরাজী ১৮২১ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী)। এরপর প্রতাপচাঁদের তিরোভাব ও আবির্ভাব রহস্যজনক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, প্রতাপের মৃতদেহ তেজচন্দ্র বা তাঁর রানীদের দেখান হয় নাই। স্বভাবিক মৃত্যু হলে সে যুগে উইল সম্পাদন করা ও দত্তক গ্রহণ (নিঃসন্তানের ক্ষেত্রে) করার প্রথা ছিল। প্রচার যে, প্রতাপের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে অথচ তিনি কোন কার্যই সম্পাদন করেন নাই বা তাঁর রানীদের জন্য কোন ব্যবস্থা করে যান নাই। বর্ধমান রাজবংশের আরও প্রথা ছিল যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর ভস্ম সমাজগৃহ নির্মাণপূর্বক রক্ষিত হত ; কিন্তু তেজচন্দ্রের মৃত্যুর পর সমাজ নির্মিত হলেও প্রতাপচাঁদের সমাজ দেখা যায় না। ঐ সময় একটা জনপ্রবাদ ছিল যে, প্রতাপচাঁদ মরে নাই—অন্ধকার শীতের রাত্রে নৌকাযোগে পলায়ন করেছে। এ বিষয়ে তেজচন্দ্র অস্বাভাবিকভাবে নিরুত্তর ছিলেন। তিরোধানের সময়ে প্রতাপচাঁদের বয়স ছিল ২৯ বৎসর ২ মাস ১০ দিন।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর পরাণচাঁদের কুপরামর্শে তেজচন্দ্র পুত্রবধূদ্বয়ের প্রতি অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার শুরু করেন। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের ২১শে জুন তারিখে বর্ধমান হতে প্যারীকুমারী ও আনন্দকুমারী কর্তৃক কলিকাতাস্থ গভর্ণর জেনারেলের সেক্রেটারী হোল্ট ম্যাকেঞ্জীকে লিখিত পত্র হতে জানা যায় যে, তেজচন্দ্র ও পরাণচাঁদ, বিধবাদ্বয়কে নানাভাবে উৎপীড়িত করেছিলেন। বর্ধমানের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট জে. আর হ্যাচিনসন, কালেক্টর এলিয়ট, রেজিস্টার এডমণ্ড মলোচি ও সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার প্রতাপচাঁদের পত্নীদ্বয়ের প্রতি সহানুভুতি দেখালেও হুগলীর জজ ওকলি তেজচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করে প্রতাপচাঁদের নামে হুগলী জেলার জমিদারী অন্যায়ভাবে তেজচন্দ্রকে দেওয়ার আদেশ দেন (৬ই এপ্রিল, ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে)। ঐ বৎসরের ১০ই নভেম্বর প্রতাপ-চাঁদের পত্নীরা সুপ্রিম কোর্টে তেজচন্দ্রের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। এই মামলার ফলাফল জানা না গেলেও অনুমান করা যায় যে, তেজচন্দ্রের অনুকুলে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রতাপের পত্নীরা রাজবাড়ী হতে মাসোহারা পেতেন।

১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী (১৩ই মাঘ, ১২৩৩ সাল) সপ্তম রানী উজ্জ্বলকুমারীর মৃত্যুর পর পরাণচাঁদের কৌশলে বংশরক্ষার প্রলোভনে প্রভাবিত হয়ে ৬৩ বছরের বৃদ্ধ তেজচন্দ্র পরাণচাঁদের একাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা বসন্তকুমারীকে

বিবাহ করেন। এরপর পরাণচাঁদ ও কমলকুমারী, পরাণচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র চুনিলালকে 'দত্তকপুত্র' রূপে গ্রহণ করার জন্য তেজচন্দ্রকে প্রভাবিত করলেও প্রতাপচাঁদের গৃহে প্রত্যাগমনের আশায় তিনি প্রথমে 'দত্তক' নিতে অস্বীকৃত ছিলেন। বিকৃত রুচির বৃদ্ধ জমিদারকে সন্তুষ্ট করার জন্য পরাণচাঁদ ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে 'হরিহরমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি দত্তক গ্রহণের অনুমতি দান করেন এবং পরাণচাঁদ ও কমলকুমারী নাবালক চুনিলালের অভিভাবক নিযুক্ত হন। চুনিলাল বর্ধমান জমিদারীর মালিক হয়ে মহারাজা মহতাবচাঁদ বাহাদুর নামে পরিচিত হন। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের ২২শে আগস্ট লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক, কমলকুমারীর অভিভাবকত্ব ও মহতাবচাঁদকে জমিদাররূপে স্বীকৃতি দিয়ে বর্ধমানে পত্র প্রেরণ করেন।

প্রতাপচাঁদের অন্তর্ধানের ১৪ বছর ও তেজচন্দ্রের পরলোকগমনের তিন বছর পর ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে গৌরাঙ্গসুন্দর এক সুপুরুষ সন্ন্যাসী বর্ধমান শহরে[৫৬] আবির্ভূত হলে গোপীনাথ ময়রা, কুঞ্জবিহারী ঘোষ, তারাচাঁদ ঘোষ প্রমুখ পুরাতন কর্মচারীবৃন্দ ঐ সন্ন্যাসীকে 'প্রতাপচাঁদ' বলে সনাক্ত করেন এবং অপরপক্ষে—'পরাণবাবু হয়ে কাবু হাবুডুবু খেতেছে।' বর্ধমান শহরে বসবাস করা নিরাপদ মনে না করে প্রতাপচাঁদ কাঞ্চননগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু পরাণচাঁদের নিযুক্ত লাঠিয়ালরা তথায় উপস্থিত হলে তিনি বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহের আশ্রয়প্রার্থীরূপে বাঁকুড়াতে বসবাস করলেও পরাণচাঁদের চক্রান্তে মানভুমের বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত থাকার অজুহাতে তাঁকে বাঁকুড়ার জেলে বন্দী করে রাখা হয় এবং আট মাস পরে বিচারের জন্য হুগলী কোর্টে চালান দেওয়া হয়। বর্ধমানে প্রতাপচাঁদের স্বপক্ষে বহু সাক্ষী থাকার ভয়ে কয়েক লক্ষ টাকা উৎকোচস্বরূপ ব্যয় করে হুগলী কোর্টে মামলাটি স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট জেমস্ বেলফোর ওগিলবি তিন লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করে মামলাটি বর্ধমানের পরিবর্তে হুগলীতে স্থানান্তরিত করেন। হুগলী জেলার জজ কার্টিস সাহেবও যে উৎকোচের দ্বারা বশীভুত হয়েছিলেন, তার প্রধান প্রমাণ হল তিনি সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বেই বিচারের ফলাফলের ইঙ্গিত প্রকাশ করেছিলেন। কোন কৌশলি নিযুক্ত করতে না দিয়ে একতরফা বিচারে ৬ মাস জেল এবং মুক্তির পর ৪০,০০০ টাকার পরিমাণে এক বছরের জন্য 'ফেলজামিন' দিতে হুকুম হয়। কলিকাতাস্থ নিজামত আদালতে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হলেও জেলা জজের রায় বহাল থাকে। প্রতাপচাঁদ স্বীয় অপরাধ জানতে চাওয়ায় জজসাহেব উত্তর দিয়েছিলেন যে, আসামী আলোক শা ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী এবং তার অপরাধ হল সে নিজেকে প্রতাপচাঁদ বলে প্রচার করে লোক জোটাচ্ছে ও শান্তিভঙ্গ করছে। সম্ভবতঃ প্রতাপচাঁদ ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বর্ধমান শহরে আসেন এবং ঐ মাসেই বাঁকুড়ায় গ্রেপ্তার হন। আট মাস পরে অর্থাৎ আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে হুগলীতে চালান দেওয়া হয়। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে জজসাহেব রায় দেন ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জেল হতে মুক্তিলাভ করেন।

জেল হতে ছাড়া পেয়ে তিনি তিন মাসকাল চুঁচুড়ার বিপরীত তীরে ভাটপাড়ায় (?) অবস্থান করেন। প্রতাপচাঁদ কলিকাতাস্থ তাঁর সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করতে মনস্থ করেন এবং সাক্ষী যোগাড়ের জন্য বর্ধমান যাত্রা অত্যাবশ্যক ছিল। প্রায় ৩০০ জন অনুগামীসহ প্রতাপচাঁদ ২রা মে, হুগলী হতে কালনা যাত্রা করেন। প্রতাপের আগমনের পূর্বেই বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট ওগিলবির নির্দেশে ক্যাপ্টেন লিটিলের অধীনে একদল সশস্ত্র সৈন্য কালনার গঙ্গার তীরে উপস্থিত হয়ে বিনা প্ররোচনায় গুলি চালায়। তিনি শান্তিপুরে পলায়ন করেন এবং সেখানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রতাপচাঁদের উকিল ডব্লিউ. ডি. শ'কে পাইগাছির নীলকুঠি হতে বন্দী করে বর্ধমানের জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ৭ই মে 'ইংলিশম্যান পত্রিকা' ও 'বেঙ্গল হরকরা পত্রিকা'র খবরে প্রকাশ যে, শ'-এর পক্ষে লেইথ সাহেব 'হেবিয়াস কর্পাস'-এর (*writ of habeus corpus*) আবেদন করায় সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে মুক্তি দানের আদেশ দেয়। ওগবির বিরুদ্ধে নরহত্যা ও বিনা বিচারে আটক করার অপরাধে তাঁকে ছুটিতে যাবার আদেশ দেওয়া হয় এবং পরে বর্ধমান হতে অন্যত্র বদলি করা হয়।

হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট ই. এ. সামুয়েল (পূর্বে বর্ধমানে ছিলেন) নিজেই সাক্ষী যোগাড়ের ব্যবস্থা করেন এবং ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরকে সাক্ষী সংগ্রহ করার জন্য পত্র লেখেন। শোনা যায় দ্বারকানাথ ঠাকুর সাক্ষী হতে রাজী হয়েছিলেন ; কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে তিনি উক্ত কর্ম হতে বিরত ছিলেন। পরবর্তীকালে দ্বারকানাথ অতি অল্পমূল্যে মহতাবচাঁদের নিকট রানিগঞ্জ অঞ্চলের কয়েকটি কলিয়ারীর বন্দোবস্ত পেয়েছিলেন। সামুয়েল যেরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মামলার তদ্বির করেছিলেন তাতে মনে হয় যে, ওগিলবির অপেক্ষা তার ঘুষের পরিমাণ অল্প ছিল না।

১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ২০শে নভেম্বর, হুগলীর জজকোর্টে বিখ্যাত 'জাল প্রতাপচাঁদ মামলা'র শুনানী আরম্ভ হয়। এই মামলায় সরকারী তরফে বিগনেল সাহেব ও প্রতাপচাঁদের পক্ষে মর্টন সাহেব আইনজ্ঞ ছিলেন। প্রতাপচাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি হল,—

১। অলোক শা ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী মৃত রাজা প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের নাম ব্যবহার করেছে।

২। প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করে কলিকাতার ট্রেজারির দেওয়ান রাধাকৃষ্ণ বসাকের নিকট জবরদস্তিপূর্বক অর্থ গ্রহণ করেছে।

৩। বেআইনিভাবে অস্ত্র সংগ্রহ ও কালনায় লোক জমায়েত করেছে।

'জাল প্রতাপচাঁদ মামলায়' আসামীর স্বপক্ষে উল্লেখযোগ্য সাক্ষীগণের মধ্যে বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ, ডাঃ রবার্ট স্কট, জন রিডলে, মিসেস হেরিয়েট কিটিং, মিসেস মফিয়া ক্রেন, ফাঁসুয়ে সুলেমান (চন্দননগর), মেজর জন মার্শাল (৭১নং

পল্টনের ব্রিগেডিয়ার), হাজি আবু তালেব মোগল, ডাঃ জুলিয়ান নাইটার্ড, জন ফ্রেডারিক, গোলোকচন্দ্র ঘোষ, গোপীমোহন পরামাণিক, রামধন বাগদি, আমিরউদ্দিন, আগা আব্বাস, ডেভিড হেয়ার, রামজয় সিংহ, হাকিম আলি উল্লা, কুঞ্জবিহারী ঘোষ, পিটার এমার, ফ্রেজার সাহেব, নাজির গোলাম হোসেন, আগা ইস্পাহানী, স্বরূপচন্দ্র গোস্বামী, ভি. এ. ওভারবেক প্রমুখের নাম করা যায়। সরকার পক্ষের সাক্ষীগণের মধ্যে সি. টি. ট্রোয়ার (প্রাক্তন ম্যাজিস্ট্রেট, ১৮০৮-১৭), এইচ. টি. প্রিন্সেপ, জেমস্ পিটার, জন বুচার, দ্বারকানাথ ঠাকুর (দ্বিতীয়বার সাক্ষ্যদানে বিরত ছিলেন), রাধামোহন সরকার, বসন্তলালবাবু, নন্দবাবু, ভৈরববাবু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্ধমান মহারাজার বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ চার্লস দু বোর্ড্যু (Charles Du Bordieuxe), গয়া হতে পত্র লেখেন (৩১শে মে, ১৮৩৬) যে, তিনি সাক্ষ্য দিতে রাজী আছেন; কিন্তু অর্থাভাবের জন্য তাঁকে হুগলীতে আনা সম্ভব হয় নাই। সরকারী উকিলের আপত্তিতে প্রতাপচাঁদের মাতুল, পিতৃস্বসা তোতাকুমারী ও রাজবাড়ীর ডাক্তার হ্যালিডে সাহেবের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই। সামুয়েলের আপত্তিতে রাজবাড়ীর প্রাক্তন চিকিৎসককে বারাণসী হতে আনা সম্ভব হয় নাই। সামুয়েল ও লিটলের ভয়ে তেলিনীপাড়ার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষ্যদানে বিরত ছিলেন। সরকারী পক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্য 'সমাচার দর্পণ' ও 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেই সামুয়েল উক্ত পত্রিকা দুটির ৩০ কপি সংগ্রহ করে কোর্ট প্রাঙ্গণে বিনামূল্যে বিলি করার ব্যবস্থা করেন। প্রতাপচাঁদের পত্নীদ্বয় লোকলজ্জার ভয়ে প্রথমে সাক্ষ্যদানে অস্বীকৃতা ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁরা রাজী হলেও প্রতাপচাঁদের আপত্তিতে তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই।

মামলাটি যে প্রচুর উৎকোচের বিনিময়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হুগলী কোর্টে দায়ের করা হয়েছিল, সে বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন থেকে যায়,—

১। প্রতাপচাঁদকে প্রথমবারে বাঁকুড়া জেলায় বন্দী করা হয়েছিল, সেকারণে তাঁর বিচার বাঁকুড়ায় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ঐ সময়ে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার নাম ছিল 'পশ্চিম বর্ধমান জেলা'। তাহলে এই মামলার বিচার হওয়া উচিত ছিল বর্ধমানের জজসাহেবের আদালতে। বর্ধমানের সাক্ষীদের উৎকোচের দ্বারা বশীভূত করতে না পেরে পরাণচাঁদ প্রচুর অর্থ ব্যয় করে হুগলীতে মামলাটি স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন।

২। দ্বিতীয়বারের বিচারের সময় 'চার্জ দাখিল' করা হয়েছে যে, ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ২রা মে (মতান্তরে ৭ই মে) প্রচুর লোক জড়ো করে তিনি কালনায় হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হাঙ্গামা ঘটেছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনা শহরে, অথচ প্রতাপচাঁদসহ সাতশ' লোককে হুগলীতে চালান দেওয়ার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

৩। পরাণচাঁদের ভয় ও দুর্বলতা ছিল এই যে, বর্ধমানের জজআদালতে মামলার

শুনানি হলে বর্ধমানের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, রাজবাড়ীর কর্মচারীবৃন্দ ও অন্তঃপুরের মহিলারা স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দিতে পারে।

৪। বর্ধমানে প্রতাপচাঁদের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ করা সহজ ছিল।

৫। জাল প্রতাপচাঁদের দাবী ছিল বর্ধমান জমিদারীর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে এবং এটি নিষ্পত্তি হওয়া উচিত ছিল বর্ধমান অথবা কলিকাতার দেওয়ানী আদালতে। এই মামলায় মহতাবচাঁদ অথবা কমলকুমারী ছিলেন তাঁর প্রতিপক্ষ। অথচ সুকৌশলে বিনাকারণে সরকার স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ফৌজদারী মামলায় তাঁকে দু'বার আসামী করেন। সরকারী মামলা চলাকালীন পরাণচাঁদ সাক্ষী ও অর্থ সরবরাহ করেছিলেন কার স্বার্থে? মামলা চলাকালীন ভূমিরাজস্ব জমা না পড়লেও এই সময় কোন এক অজ্ঞাত কারণে জমিদারী নিলাম হয় নাই।

৬। ১৪ বছর অজ্ঞাতবাসের পর প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছায় প্রতাপচাঁদ অসুখের ছলনা করেছিলেন ; নচেৎ ঐ যুগে অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পূর্বে দত্তকপুত্র গ্রহণের রীতি ছিল—প্রতাপচাঁদ কোন দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন নাই।

সাক্ষীদের জবানবন্দীর শেষে জজের সম্মুখে প্রতাপের বক্তব্য হল—"পরাণের আত্মীয় কুটুমের কথায় নির্ভর করে কেন আমার মাথা খাও! প্রতাপের মরণের সময় পরাণের কুটুম্ব, পরাণের চাকর, পরাণের অন্নদাস ব্যতীত কি কেহই ছিল না? প্রতাপেরও ত কুটুম্ব, আমলা, চাকর সকলই ছিল, কই তাহাদের একজনকেও ত ডাকা হয় নাই।" জজ একথায় কোনরূপ কর্ণপাত করেন নাই। আদালতে প্রতাপ আরও বলেন—"বিমাতা মহারাণী কমলকুমারী আমার পরম শত্রু, আমার বয়স ১৬।১৭, তখন তিনি দুইবার আহারের সঙ্গে বিষ দেন। একবার আমি তাহা ফেলিয়া দিই, আর একবার একটা ইঁদুরকে খাইতে দিই। ইঁদুরটি তাহা খাইয়া তৎক্ষণাৎ মরে। শেষ অবধি আমার অন্ন আমি স্বতন্ত্র পাক করাইতাম। পরাণ আর বসন্তলালবাবু আমার সর্বনাশ করিবার নিমিত সহস্র ফাঁদ পাতিতেন, আমি তাহা হইতে কৌশলে উদ্ধার হইতাম। তাঁহারা পিতার মন এরূপ ভারাক্রান্ত করিলেন যে, আমি তাহার আর কোন উপায় করিতে পারিলাম না। আমি সেই অবধি অধঃপাতে গেলাম। ক্রমেই অধিক মদ খাইতে লাগিলাম। শেষে অদৃষ্ট দোষে গুরুতর পাপগ্রস্ত হইলাম। তখন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট স্বকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ব্যবস্থা দিলেন, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল ; তাহা অশক্তে চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস। তিনি এই সঙ্গে বলিয়াছিলেন যে এরূপভাবে অজ্ঞাতবাস করিবে যে, সকলেই জানিবে—তুমি মরিয়াছ। বাড়ী হইতে পলায়ন করার পর রাজমহল হইতে পিতার লোকদ্বারা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে পিতা মহাশয় পরাণের অত্যাচার ও পীড়নের কথা জানিতে পারিলেন এবং সেই অবধি পরাণের উপর তিনি হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। প্রায়শ্চিত্ত হইল না দেখিয়া পীড়ার ভান করিয়া কালনায় গেলাম। কালীপ্রসাদকে বলা ছিল সে ভাউলিয়া লইয়া ঘাটে থাকিবে এবং সঙ্কেতসূচক শাঁক বাজাইবে ; শঙ্খধ্বনি

শুনিয়া বিকার রোগীর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলাম। এরপর অন্তর্জলিযাত্রার ব্যবস্থা হইলে গঙ্গার পাড়ে আনীত হইলাম। শীতকালের রাত্রে রাজবাড়ীর লোকেরা তাঁবুতে ছিল, অবসরেই সে নিঃশব্দে সাঁতার দিয়া ভাউলিয়ায় উঠি এবং রাত্রি শেষে সেটি মুর্শিদাবাদের উদেশ্যে যাত্রা করে।"

একজন কাজীর প্রশ্নের উত্তরে প্রতাপচাঁদ ১৪ বছর কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থান করেছেন তার বর্ণনা করেন। কালনায় কাশীপ্রসাদ পূর্বব্যবস্থা মত নৌকা প্রস্তুত রাখে এবং রাত্রি শেষে উভয়ে নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদে পলায়ন করেন এবং তথা হতে ঢাকা-ব্রহ্মপুত্রনদ-চন্দ্রশেখর-আদিনাথ (এক বছর)-বৈদ্যেশ্বরী-ত্রিপুরেশ্বরী দর্শন করে বানেশনাথে এক বছর অবস্থান করেন। অতঃপর কাশী-প্রয়াগ-চিত্রকুট-অযোধ্যা-বৃন্দাবন-মথুরা কুরুক্ষেত্র-পুষ্কর প্রভাস-বদরিকাশ্রম-হরিদ্বার-হিঙ্গুলা-জ্বালামুখী-লাহোর-অমৃতসর দর্শনান্তে ছ'বছর কাশ্মীরে কাটিয়েছিলেন। কাশ্মীর হতে দিল্লী হয়ে প্রথমে কলিকাতা (কালীঘাট) ও পরে বর্ধমানে প্রত্যাবর্তন করেন। সমুদয় ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিত ছিল এবং এই বিবরণটি তাঁকে বাঁকুড়ায় গ্রেপ্তারের সময় জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট এলিয়ট সাহেব কেড়ে নেন ও পরে আর ফেরত পান নাই।

জবানবন্দী শেষ হলে, অপর একজন কাজী মন্তব্য করেন যে, ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ এমন জোরাল নয়, যার উপর ভিত্তি করে প্রতাপচাঁদ নাম ধারণের জন্য তাঁকে দণ্ড দেওয়া যায়। কিন্তু জজসাহেব তাঁকে দণ্ড দিতে কৃতনিশ্চয়। তাঁর মতে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ন্যূনতম পক্ষে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া উচিত। কাজী ও জজের মতের অনৈক্য হওয়ায় নিজামত আদালতে মামলাটি প্রেরণ করা হয়েছিল। নিজামত আদালতের রায়ে মৃত মহারাজা প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের নাম ব্যবহার করার নিমিত্ত আসামী আলোক শা ওরফে প্রতাপচাঁদ ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীর এক হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছ'মাস কারাবাসের হুকুম হয়, তবে অন্যান্য চার্জ হতে মুক্তি দেওয়া হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রতাপচাঁদ নিজামত আদালতে আপীল করায় বিচারপতি ডাব্লিউ. ব্রাডন ও সি. টুকার রায়ে প্রতাপচাঁদের সর্বনাশের মূল কারণ হয়েছিল। তিনি প্রিভিকাউন্সিলে আপীলের অনুমতি চাওয়ায় জজেরা তাঁর আবেদন নামঞ্জুর করেন। অপরপক্ষে মামলাকালীন যাঁরা প্রতাপচাঁদকে কর্জ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তাঁরা বুঝতে পারেন যে, সরকার যেকোন কৌশলে তাঁকে বর্ধমানের জমিদারীর অধিকার হতে বঞ্চিত করবেন। অতএব তাঁরা পুনরায় কর্জ দিতে রাজী হন নাই। জনশ্রুতি এই যে, প্রতাপচাঁদের সঙ্গে রঞ্জিৎ সিংহের সৌহার্দ ছিল এবং সরকার অবগত ছিল যে, প্রতাপচাঁদ মরে নাই। যদি প্রতাপচাঁদ বর্ধমানের জমিদারী লাভ করে, তাহলে রঞ্জিৎ সিংহের বঙ্গদেশে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে।

মামলায় পরাজয়ের পর প্রতাপচাঁদ কিছুকাল চাঁপাতলায় (কলিকাতা) বাস করে গোবিন্দ পরামাণিকের কলুটোলার গৃহে দু'তিন মাস ছিলেন। শ্যামপুকুর পল্লীতে বসবাসের সময় লাহোরে ইংরাজদের সঙ্গে শিখদের যুদ্ধ শুরু হওয়ায় তিনি কোম্পানির

রাজ্য হতে পলায়ন করে চন্দননগরের বড়াইচণ্ডীতলায় ফরাসীদের আশ্রয়ে কয়েক বৎসর ছিলেন। অতঃপর সন্ন্যাস জীবনযাপনের নিমিত্ত প্রায় ৭ বছর শ্রীরামপুরে বসবাস করেন এবং সেখানে তাঁর প্রচুর শিষ্যসংখ্যা বর্ধিত হয়েছিল। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের প্রথমভাগে বরাহনগরে চলে আসেন ; এই সময়ে তাঁর শরীর অসুস্থ এবং আর্থিক অসচ্ছলতা ছিল। অবশেষে ঐ বছরের ১৯শে নভেম্বর দু'চার জন সংগীসাথী পরিবৃত হয়ে ময়রাডাংগা পল্লীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর শেষযাত্রার সময়ে চোখের জল ফেলার জন্য কেউই উপস্থিত ছিল না। সংগম রায়ের বংশ তথা শেষ বংশধর লুপ্ত হয়।[৫৭]

৯

মহারানি বসন্তকুমারী (১৮১৬-১৯০০) ঃ

মহারাজা তেজচন্দ্রের মৃত্যু সময় তাঁর কনিষ্ঠা পত্নী বসন্তকুমারীর বয়স ছিল প্রায় ষোল বছর। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতি ও অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তেজচন্দ্র তাঁকে কলিকাতা ও বর্ধমানে বহু স্থাবর সম্পত্তি দান করে যান। কিন্তু ২১ বছর বয়ঃক্রম না হওয়ায় তিনি স্বাধীনভাবে সম্পত্তি ভোগ দখলে বঞ্চিত ছিলেন। এই সম্পত্তির পরিচালনভার পরাণচাঁদ ও কমলকুমারীর উপর বর্তায়। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে বসন্তকুমারীর বয়স ২১ বছর উত্তীর্ণ হলে উক্ত সম্পত্তি স্বাধীনভাবে ভোগদখল ও অধিকার লাভের জন্য সুপ্রিমকোর্টে নালিশ করেন। তাঁর হলফনামায় আরও বলা হয়েছিল যে, পরাণচাঁদ ও কমলকুমারী তাঁকে প্রকারান্তরে নজরবন্দী করে রেখেছে। বসন্তকুমারী বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট ও জজসাহেবের নিকট আবেদন করেও কোন প্রতিকার হয় নাই। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর উকিল ডব্লিউ. এন. হেজর, সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করায় জজ সি. টুকার আদেশ দেন যে, ঐ রানি স্বেচ্ছামতে সর্বত্র গমনাগমন করার অধিকারিণী এবং তাঁর সমুদয় সম্পত্তির পরিচালনভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করতে সক্ষম। নগর দেওয়ানী আদালতের রায় বর্ধমানের জজ সাহেব নানা কারণে স্থগিত রাখার চেষ্টা করায় তাঁকে সাসপেণ্ড করা হয়।

কলিকাতাস্থ নূতন চীনাবাজারের অধিকারিণী ছিলেন বসন্তকুমারী। পূর্বোক্ত মামলা চলাকালীন তাঁর কর্মচারী মদনমোহন কাপুরকে কর্মচ্যুত করে উইলিয়ম প্রিন্সেপ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও হেজর সাহেবকে প্রজাগণের নিকট ভাড়া আদায়ের অধিকার প্রদান করে ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখে বসন্তকুমারী এক নোটিশ জারী করেন।

বর্ধমান ও কলিকাতায় মামলার সময় বসন্তকুমারীর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। পিতার শঠতা ও লোভের কাছে বলি দিয়ে নিজেকে তিনি বঞ্চিতা করে রেখেছিলেন। মামলা চলাকালীন তাঁর এটর্নি কার-টেগোর এণ্ড কোম্পানির উকিল

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায়ই সাক্ষাৎ লাভ ঘটত এবং সুপুরুষ ও বিপত্নীক দক্ষিণারঞ্জনও রানির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ফলে উভয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয়। সম্ভবতঃ মামলা মোকদ্দমা উপলক্ষে বা সম্পত্তির তদারকির জন্য বসন্তকুমারী কলিকাতায় গিয়েছিলেন এবং আর বর্ধমানে প্রত্যাগমন করেন নাই। এবিষয়ে টমাস এডওয়ার্ড অনেক মুখরোচক সংবাদ পরিবেশন করেছেন, যার মধ্যে বহু অতিরঞ্জিত তথ্য আছে। সম্ভবতঃ ১৮৪৩-৪৯ সালের মধ্যে বসন্তকুমারীর সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের হিন্দুমতে বিবাহ হয়। গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য বা গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এ বিবাহে পৌরোহিত্য করেন। এতদ্সত্ত্বেও অসবর্ণ বিধবাবিবাহ অসিদ্ধ বিবেচিত হতে পারে এই আশঙ্কায় তদানীন্তন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট বার্চ সাহেবের সম্মুখে সাক্ষী রেখে সিভিল ম্যারেজ সিদ্ধ হয়েছিল। কর্মসূত্রে নানস্থানে অবস্থান করার পর শেষজীবনে তাঁরা অযোধ্যা ও লক্ষ্মৌ-এ বসবাস করেন। তাঁদের এক পুত্র ও দু'টি কন্যাসন্তান ছিল। দক্ষিণারঞ্জন ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ও বসন্তকুমারী ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।[৫৮]

১০

মহারাজাধিরাজ মহতাবচাঁদ (১৮৩২-৭৯) ঃ

তেজচন্দ্রের শেষ ইচ্ছানুসারে মহতাবচাঁদ বর্ধমানের জমিদারী লাভ করেন। 'জাল প্রতাপচাঁদ' সংক্রান্ত মামলা প্রকাশ্যে সরকারী প্রচেষ্টায় হলেও এই মামলা পরিচালনার জন্য যে প্রভুত অর্থ ব্যয় হয়েছিল তার সবটাই মহতাবচাঁদের অভিভাবক পরাণচাঁদকে বহন করতে হয়। সেকারণে সময়মত রাজস্ব জমা দিতে না পারায় অংশিক জমিদারী বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয় এবং অবশেষে সমগ্র জমিদারীকে 'কোর্ট অব ওয়ার্ডসে'র অধীনে রেখে একজন কমিশনারকে বর্ধমানে পাঠান হয়।

১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে ২৪ বছর বয়সে মহারাজাধিরাজ মহতাবচাঁদ বাহাদুর স্বহস্তে বর্ধমানের জমিদারীর পরিচালনভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে জমিদারীর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হলেও বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁর কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। বর্ধমানের রাজাদের একমাত্র পরিচয় ছিল এই যে, তাঁরা প্রভুত অর্থ ও সম্পত্তির মালিকরূপে সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান জমিদার। পত্তনীতালুক ও কলিয়ারী ইজারা দিয়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন এবং অপরদিকে দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করে পরিচিত ব্যক্তি ও দেববিগ্রহের জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করে আদর্শ জমিদাররূপে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করেছেন। বর্ধমান জমিদারীর প্রায় সবটাই পত্তনী তালুকরূপে ইজারা দেওয়া ছিল এবং সাধারণ প্রজার সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক ছিল না বা পত্তনীদার ও দরপত্তনীদারগণের অত্যাচার ও জুলুম হতে চাষী বা প্রজাকে রক্ষা করার কোন প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করেন নাই। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়েও তাঁরা স্বাভাবিক কারণে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে

সহায়তা করে গেছেন এবং সে কাজের ফলশ্রুতি স্বরূপ তাঁরা সরকারী খেতাব, ছোটলাট ও বড়লাটের কাউন্সিলে সম্মানজনক সদস্য পদটি লাভ করতেন। বর্ধমানের এই সামন্ততান্ত্রিক বংশটি চরিত্রগতভাবে বঙ্গদেশের অন্যান্য জমিদারশ্রেণী হতে পৃথক ছিল না। সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ) ও সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ) সময় এঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইংরাজদের সহায়তা করেছেন।

পাঞ্জাব নিবাসী কেদারনাথ নন্দে, পুত্র বংশগোপাল নন্দে ও কন্যা নারায়ণকুমারী (জন্ম ৫ই জুন, ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ) সহ বর্ধমানে বসবাস করতেন। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে নারায়ণকুমারীর সঙ্গে মহতাবচাঁদের বিবাহ হয়। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী বহু চক্রান্তের অংশগ্রহণকারী মহারানি কমলকুমারীর মৃত্যু হয়। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের ১লা নভেম্বর তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে যোগদান করেন। মহতাবচাঁদের কোন পুত্রসন্তান না থাকায় ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে মার্চ বংশগোপাল নন্দের পুত্র ব্রহ্মপ্রসাদ নন্দেকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং ইনিই কুমার আফতাবচাঁদ নামে পরিচিতি লাভ করেন। পরবর্তী বংশধরগণের প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সঙ্গম রায়ের শেষ বংশধর প্রতাপচাঁদের পর দেওয়ান পরাণচাঁদ কাপুরের বংশই জমিদারী পরিচালনা করেছিল। পরাণচাঁদের অপর এক পুত্র রাসবিহারী, সোঁয়াই নিবাসী গোপাললাল শেঠ তলওয়ারের কনিষ্ঠ পুত্র জহুরিলালকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং ইনি পরবর্তীকালে রাজা বনবিহারী কাপুর নামে পরিচিত হন। বনবিহারী কাপুরের কর্মনিষ্ঠার গুণে ইনি মহতাবচাঁদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানের 'দেওয়ান-ই-রাজ'-এর পদ লাভ করেন। অপুত্রক অবস্থায় আফতাবচাঁদের মৃত্যু সময় বনবিহারীর পুত্র বিজনবিহারীকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণের অনুমতি দিয়ে যান। এ সিদ্ধান্ত নারায়ণকুমারীর মনঃপুত হয় নাই।

সাহিত্যানুরাগী জমিদার হিসাবে মহতাবচাঁদের খ্যাতি ছিল। কিন্তু বর্ধমানের প্রাথমিক শিক্ষা ও ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি বিশেষ কিছুই করেন নাই। তিনি নিজে কয়েকটি শাক্তপদ রচনা করে গেছেন। তাঁর সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ধমানে যাতায়াত ছিল। বিদ্যাসাগর মহতাবচাঁদকে '*First Man of Bengal*' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বিধবাবিবাহের আইন প্রণয়নের জন্য যে আবেদন করা হয়, তাতে তাঁর স্বাক্ষর ছিল। প্রভুত অর্থ ব্যয় করে হরিবংশ, রামায়ণ, চাহার দরবেশ, সিকন্দরনামা, মসনবী আলা ও সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ ব্যতীত বহু প্রাচীন গ্রন্থ রাজবাড়ীর মুদ্রণ যন্ত্রে মুদ্রিত করিয়ে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা তাঁর অক্ষয় কীর্তি। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দ হতে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়কালে বহু প্রথিতযশা পণ্ডিত ব্যক্তি মহাভারতের অনুবাদ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রকাশ দেখে যেতে পারেন নাই। এই

অসমাপ্ত কাজটি আফতাব্‌চাঁদের আমলে সমাপ্ত হয়। এই শুভ কাজটি শুরু হয়েছিল ১২৬৫ সালের বৈশাখ মাসে।

১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী দিল্লীর দরবারে মহারানি ভিক্টোরিয়া 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' রূপে ঘোষণার সময় সভায় মহতাব্‌চাঁদ উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ সভায় তাঁর নামের পূর্বে 'হিজ হাইনেস্' শব্দ ব্যবহার ও ১৩টি কামান রাখার অধিকার প্রদত্ত হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে মহতাব্‌চাঁদই একমাত্র জমিদার যিনি এই সম্মান লাভ করেছিলেন। উপাধিপ্রাপ্তির প্রতিদান স্বরূপ তিনি মহারানি ভিক্টোরিয়ার একটি শ্বেত মর্মর মূর্তি জনসাধারণকে উপহার দেন এবং এটি কলিকাতার যাদুঘরে স্থাপিত আছে; লর্ড লিটন এই মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করেন। বর্তমান রাজপ্রাসাদ 'মহতাব্ মঞ্জিল' তাঁর আমলে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর বায়ু পরিবর্তনের জন্য ভাগলপুরে গিয়েছিলেন এবং তথায় ৫৯ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।[৫৯]

মহারাজা আফতাব্‌চাঁদ মহতাব্ (১৮৭৯-৮৫):

মহতাব্‌চাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর দত্তকপুত্র আফতাব্‌চাঁদ ১৯ বছর বয়সে বর্ধমান জমিদারীর অধিকার প্রাপ্ত হন এবং তিনি মাত্র পাঁচ বছর বর্ধমানের গদিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দুর্বলচিত্তের মানুষ আফতাব্‌চাঁদ বয়সে অত্যন্ত নবীন হওয়ায় তাঁর সময়কালে জমিদারী পরিচালনার বিষয়ে শৃঙ্খলাবোধের অভাব ছিল। মহতাব্‌-চাঁদের সংগৃহীত প্রচুর অর্থ ও ধনরত্নের অধিকাংশই রাজকোষে জমার পরিবর্তে রাজ-অন্তঃপুরের মহিলাদের হস্তগত হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে বনবিহারী কাপুর জমিদারী কার্য পরিচালনা করতেন। আফতাব্‌চাঁদ নিজ ব্যয়ে বহু জনহিতকর কাজ করেছেন। তাঁর আমলে তেজচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী হাই-স্কুলটিকে ৮০,০০০ টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করা হয়েছিল। শহরের জলকষ্ট নিবারণার্থে ৫০,০০০ টাকা ব্যয়ে লাকুর্ডিতে জলকল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ পাবলিক লাইব্রেরীর বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নাই। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে মাত্র ২৫ বছর বয়সে অপুত্রক অবস্থায় তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পত্নী বিনোদেয়ী দেবীকে দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতি দান করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর প্রায় দু'বছর পরে অর্থাৎ ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে বনবিহারী কাপুরের কনিষ্ঠ পুত্র বিজনবিহারী কাপুরকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করা হয়েছিল।

মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব্ (১৮৮৭-১৯৪১):

আফতাব্‌চাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তরাধিকারী মনোনীত না হওয়ায় জমিদারী 'কোর্ট' অব ওয়ার্ডস'-এর তত্ত্বাবধানে যায়। আফতাব্‌চাঁদের সময়ে

বনবিহারী কাপুর ও টি. ডি. বর্গমিলার জয়েণ্ট ম্যানেজার নিযুক্ত ছিলেন। মিলারের মৃত্যুর পর এইচ. আর. রেইলি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন; কিন্তু তিনি ওড়িশায় বদলি হওয়ায় বনবিহারী এককভাবে ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন। এই সময়ে জমিদারীর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়। মিলার ও বনবিহারী ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর অর্থ সংগ্রহে সক্ষম হলেও জমিদারীর হাল ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখের 'দি স্টেটসম্যান পত্রিকা'র সম্পাদকীয় নিবন্ধে প্রকাশ —'The friends of this old family insists in particular upon the necessity of enquiry being made into the vast sums of money that had been drawn from the hoards of the Raj during the last six years by the Joint Managers, Bun Behari and Mr. Miller on the plea that they were required for current expenditure or for investments in Government securities; also into the amounts that are declared to have been remitted by these same gentlemen during the same period to London, and to local tradesmen, with the invoices of the goods bought; the aggregate amount of Mr. Miller's personal drawings from the Prince during the five years of his Raj; the amounts entered as gifts during the same period to Bun Behari and his crew of personal followers; and the sale of eight lakhs of old coins through the cashier of the Raj, and their disposal." ঐ সময়ে 'ইংলিশম্যান পত্রিকা'য় বনবিহারীর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছিল। বনবিহারীর পুত্র বিজয়চাঁদ মহতাব্ রাজগদিতে আসীন হওয়ার পর 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস্'-এর তত্ত্বাবধানে নাবালকের অভিভাবকরূপে বনবিহারী ম্যানজারের পদ লাভ করেন এবং এই সময় হতে রাজবংশের শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হয়। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে বনবিহারী 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন।

রাজগদি লাভের সময় বিজয়চাঁদের বয়স ছিল মাত্র ছ'বছর (জন্ম ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর)। সেকারণে তাঁর জমিদারী 'কোর্ট অব ওয়ার্ডসে'র তত্ত্বাবধানে যায় এবং এবারেও তাঁর পিতা ছিলেন রাজবাড়ীর ম্যানেজার। সাবালকত্ব লাভের পর ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে বিজয়চাঁদ স্বহস্তে জমিদারী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী দিল্লীর দরবারে বিজয়চাঁদ 'মহারাজাধিরাজ বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। ঐ বৎসর ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁর অভিষেকক্রিয়া উপলক্ষে লেফটেনাণ্ট গভর্ণর বোর্ডিলিয়ন বর্ধমানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বড়লাট লর্ড কার্জন বিজয়চাঁদের আমন্ত্রণে বর্ধমানে আগমন করেন এবং তাঁর প্রতি সম্মান ও আনুগত্য প্রকাশের জন্য শহরের প্রবেশ পথে 'স্টার অব ইণ্ডিয়া' নামক ইষ্টক নির্মিত সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করা হয়। পরে

বড়লাটের নামানুসারে ঐ তোরণটি 'কার্জন গেট' নামে অভিহিত করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর নির্মাতার নামানুসারে এটির নামকরণ হয় 'বিজয়তোরণ'।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে লাহোর নিবাসী ঋণ্ডামল মেহেরার কনিষ্ঠা কন্যা রাধারাণী দেবীর সঙ্গে বিজয়চাঁদের বিবাহ হয়। বিজয়চাঁদের দুই পুত্র এবং দুই কন্যা। সর্বজ্যেষ্ঠা সুধারাণী দেবী এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়চাঁদ (১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুলাই) বর্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠা কন্যা ললিতারাণী ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ও কনিষ্ঠ পুত্র অভয়চাঁদ ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর আলিপুরে 'বিজয় মঞ্জিলে' জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব লেফঃ গভর্ণর স্যার এণ্ড্রু ফেজারকে আততায়ীর হাত হতে রক্ষা করার জন্য 'কে সি. আই. ই.' উপাধিসহ তৃতীয় শ্রেণীর সম্মানজক পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জুন হতে এই বংশ 'মহারাজাধিরাজ বাহাদুর' উপাধিটি বংশগত রূপে ব্যবহারের অনুমতি লাভ করে। বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদাররূপে তিনি বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর দানের পরিমাণও কম নয়। তিনি ফ্লাউড কমিশনের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

বিদ্যাশিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে বিজয়চাঁদের অবদান যৎসামান্য। তিনি নিজেও সাহিত্যচর্চা করতেন। প্রথমবারের ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি একটি ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেছিলেন। এছাড়া তিনি 'বিজয় গীতিকা' নামক বাংলা কবিতার বই রচনা ও প্রকাশ করেন। তাঁর ইংরাজী রচনার মধ্যে 'Impression,' Meditations,' 'The Indian Horizon' (1932), 'Studies' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, তিনি ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাংলা ১৩২১ সালের চৈত্র মাসে বিজয়চাঁদের সভাপতিত্বে (মূল অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি) ও বর্ধমানের অপর এক সুসন্তান মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর (পৈত্রিক নিবাস মাথরুণ, থানা মঙ্গলকোট) ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্ধমান শহরে 'অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২২শে চৈত্র অপরাহ্ণে সভার শেষে বঙ্গের সুধীজন ও বর্ধমান-বাসীদের বিজয়চাঁদ যে ভাষায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন তা সে যুগের এক প্রবল-প্রতাপান্বিত জমিদারের নিকট আশা করা কল্পনাতীত ছিল। তাঁর অভিভাষণটি ছিল অত্যন্ত আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ,—"আপনাদের অভ্যর্থনার জন্য এখানকার সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য মিলিয়া অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা আমায় মুখপাত্র করিয়া আমার উপর আয়োজনের ভার দিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি জানাইতেছি যে, আমার কার্যে যদি প্রশংসনীয় কিছু থাকে, তবে সেটা তাঁহাদের, আর ত্রুটি যাহা কিছু হইয়াছে তাহা সমগ্র আমারই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনোমত কার্য করিবার জন্য আমায় সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা মোটের উপর আমাকে ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট ঋণী।

বর্ধমানের প্রতি আপনাদের এই আকর্ষণ বর্ধমানবাসী বহুদিন ভুলিবে না। আপনারা যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়া, যেরূপ স্নেহ ও প্রীতি দেখাইয়া যাইতেছেন, তাহার জন্য আপনারা বর্ধমানবাসীর ও আমার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।"

বহু দোষ-গুণে যুক্ত মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব্ বাহাদুর বাংলা ১৩৪৮ সালের ১২ই ভাদ্র (১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট, শুক্রবার) ৬০ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।[৬০]

১১

মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাব্ (১৯৪১-৫৫):

বিজয়চাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়চাঁদ পিতার মৃত্যুর পর বর্ধমানের জমিদারী প্রাপ্ত হন। তেজচন্দ্রের পরবর্তী জমিদারগণের মধ্যে ইনি উত্তরাধিকারসূত্রে পৈত্রিক জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু উদয়চাঁদই এই বংশের তথা বর্ধমানের শেষ জমিদার। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের ভূমিরাজস্ব কমিশন সুপারিশ করে যে, জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করা উচিত। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের সময় ঐ সুপারিশ কার্যকরী হয় নাই। অবশেষে 'পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩', আইন দ্বারা বর্ধমানসহ সারা পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করা হয়।

জমিদারী প্রথা বিলোপের পর বর্ধমানের বিপুল সম্পত্তি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দান করে উদয়চাঁদ তাঁর পিতার নির্মিত কলিকাতার 'বিজয় মঞ্জিলে' বসবাস করতেন। উদয়চাঁদ যে সকল প্রতিষ্ঠানকে সম্পত্তি দান করেছেন তার মধ্যে সিংহভাগ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকুল্যে গেছে। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে 'মহতাব্ মঞ্জিলে' বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১০ই অক্টোবর বর্ধমান রাজবংশের সর্বশেষ জমিদার মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাব্ বাহাদুর ৭৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরলোকগমন করেন। উদয়চাঁদের মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সহধর্মিণী রাধারাণী দেবীর মৃত্যু হয়েছিল। রাধারাণী দেবী কয়েক বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। অতি সম্প্রতিকালে অর্থাৎ ১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিজয়চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার অভয়চাঁদের মৃত্যু ঘটে বাঙ্গালোর শহরে এবং মরদেহ বর্ধমান শহরে নিয়ে এসে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। উদয়চাঁদের তিন পুত্র ও তিন কন্যা বর্তমান এবং তাঁর উইল অনুসারে কনিষ্ঠ পুত্র ডঃ প্রণয়চাঁদ মহতাব্ দেবসেবা ও অন্যান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়করূপে কলিকাতাস্থ 'বিজয় মঞ্জিলে' বসবাস করছেন।

বঙ্গের অন্যান্য জমিদার বংশের ন্যায় আবু রায়ের প্রতিষ্ঠিত এবং কৃষ্ণরাম ও কীর্তিচাঁদের দ্বারা পালিত জমিদারীর বিলোপ সাধন হলেও এখনও বর্ধমানবাসীর মনে ঐ অবাঙালী জমিদার বংশের প্রতি একটা শ্রদ্ধা মিশ্রিত অনুকম্পার ছাপ আছে। রাজবাড়ীর 'উত্তর ফটক' হতে 'মহতাব্ মঞ্জিলে'র দিকে দৃষ্টিপাত করলে আজও সেই প্রতীক চিহ্নের কথা মনে পড়ে যায়,—

দু'পাশে উল্লম্ফনরত অবস্থায় দুটি বলশালী অশ্বের মধ্যস্থলে ঢাল সহ উন্মুক্ত তরবারি। প্রতীক চিহ্নের নিম্নভাগে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে 'Deo Credito Justician Colito' যার অর্থ হল—'সুপ্রশংসিত-সুবিবেচক-সুপ্রজাপালক।'

বর্ধমান রাজবংশের বংশতালিকা
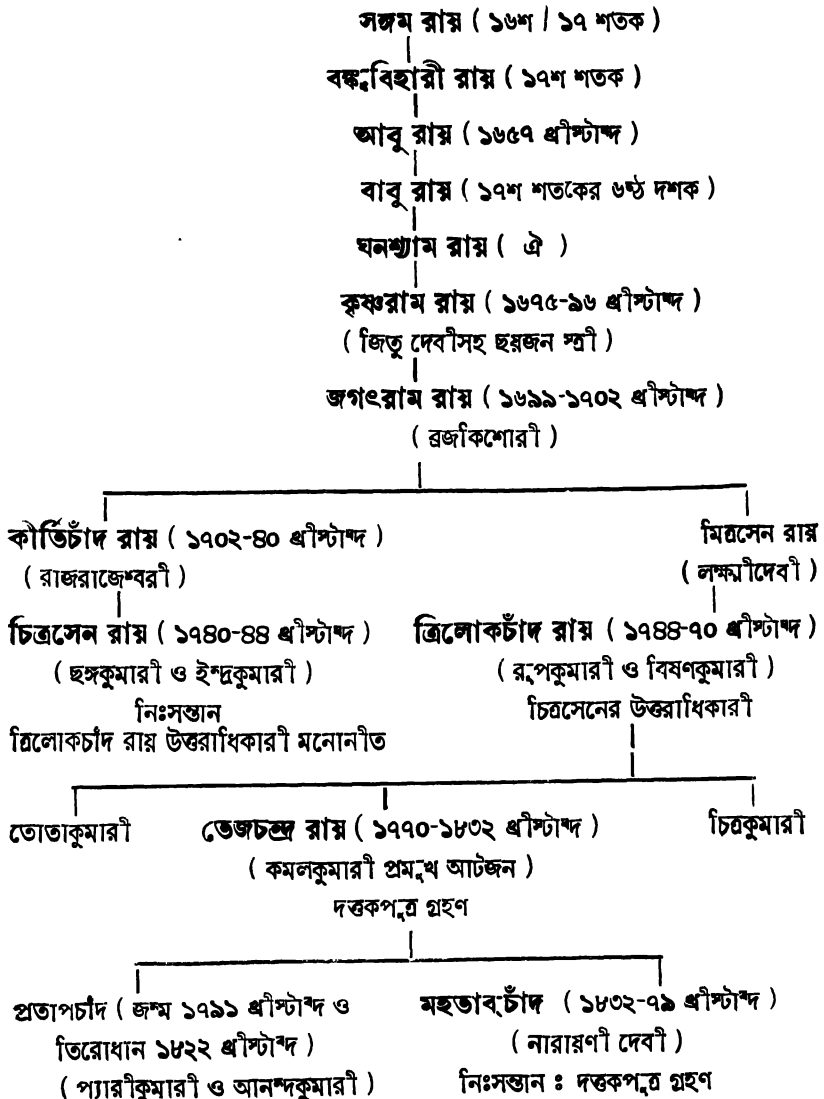
আফতাবচাঁদ মহতাব্[১]
(১৮৭৯-৮৫ খ্রীস্টাব্দ)
(বেনদেয়ী দেবী)
নিঃসন্তান ঃ দত্তকপুত্র গ্রহণ

বিজয়চাঁদ মহতাব্ (১৮৮৭-১৯৪২ খ্রীস্টাব্দ)
(রাধারাণী দেবী)

সুধারাণী | **উদয়চাঁদ মহতাব্**[২] (১৯০২-৬৬ খ্রীস্টাব্দ) | ললিতারাণী | অভয়চাঁদ

(রাধারাণী) — অভয়চাঁদ (১৯১৫-৯৩)

উদয়চাঁদ মহতাব্-এর সন্তান:

বরুণাদেবী | সদয়চাঁদ | জ্যোৎস্না দেবী | মলয়চাঁদ | প্রণয়চাঁদ[৩] | করুণা দেবী

১। মহতাব্চাঁদের নামানুসারে 'রায়' উপাধির পরিবর্তে 'মহতাব্' উপাধি গ্রহণ।
২। জমিদারী প্রথার বিলোপ—১লা বৈশাখ, ১৩৬২ সাল (ইং ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দ)
৩। মহারাজাধিরাজের উইল অনুসারে দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত।

রাজবাড়ী

আদিনিবাস—বৈকুণ্ঠপুর (থানা বর্ধমান)

বর্ধমান—সম্ভবতঃ কৃষ্ণরাম রায়ের সময়ে কাঞ্চননগর ও ইদিলপুরের সন্নিকটে রাজাদের পূর্বপুরুষগণ বসবাস করতেন।

বর্ধমান—বর্তমান মহিলা মহাবিদ্যালয়ে অর্থাৎ বর্ধমান দুর্গের একাংশে ত্রিলোকচাঁদ বসবাস করতেন বলে শোনা যায়।

কালনা—সিংহদ্বারের প্রতিষ্ঠালিপি হতে জানা যায় যে, তেজচন্দ্রের সময়ে ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়।

বর্ধমান—উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে মহতাব্চাঁদ কর্তৃক বর্তমান রাজবাড়ী নির্মিত হয়েছিল।

কাশীনাথ কাপুর

পরাণচাঁদ | **কমলকুমারী** (অপুত্রক) (তেজচন্দ্রের ৫ম রাণী) | **অম্বিকা** (গোপালচাঁদ মেহেরা)

অম্বিকা → **আনন্দকুমারী** (স্বামী-প্রতাপচাঁদ) অপুত্রক

শ্যামচাঁদ **রাসবিহারী** তারাচাঁদ **চুনীলাল** বিজয়কুমারী নয়নকুমারী নবীনকুমারী বসন্তকুমারী

বনবিহারী (দত্তকপুত্র) (তেজচন্দ্রের দত্তকপুত্র) (তেজচন্দ্রের ৮ম রাণী ও পরবর্তীকালে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী

বিজনবিহারী মহারাজাধিরাজ **মহতাব্‌চাঁদ**

(আফতাব্‌চাঁদের পত্নী বেনদেয়ী দেবীর দত্তকপুত্র মহারাজাধিরাজ **স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব্‌**)

উদয়চাঁদ মহতাব্‌

পাদটীকা :

১। ভারত গৌরব—সুরেন্দ্রমোহন বসু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৭।

২। *Bengal Dist. Gazetteers, Burdwan*—J. C. K. Peterson, p. 26.

৩। *Calcutta Review*, 1910, p. 122.

৪। *Calcutta Review*, 1872, p. 76 ; বিশ্বকোষ—১৭শ খণ্ড, পৃঃ ৬৩১।

৫। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত—রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩।

৬। *Calcutta Review*, 1910, p. 122 ; বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ৪।

৭। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত : পরিশিষ্ট, পৃঃ ৫-৬।

৮। সাহিত্য প্রকাশিকা—পঞ্চানন মণ্ডল সং, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০।

৯। *Calcutta Review*, 1910, p. 124.

১০। *Calcutta Review*, 1910, p. 123.

১১। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ৯।

১২। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৪ সাল, পৃঃ ১১৯।

১৩। *History of Bengal*, Vol, II, p. 393 ; *History of Aurangzib*, Vol. V, p. 287.

১৪। *Riyazu-S-Salatin*, p. 233 ; *History of Bengal*, Vol. II, p. 394 ; *History of Aurangzib*, Vol. V, p. 286 ; *The History of Bengal*—C. Stewart, p. 373-74 ; ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতং (ইং)—পৃঃ ৩৬।

১৫। কৌশিকী, ১৩৮৩, পৃঃ ৩৫।

১৬। *The History of Bengal*—C. Stewart, p. 375.

১৭। *The History of Bengal*, p. 385 ; *History of Bengal*, Vol. II, p. 394-5.

১৮। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ২০।

১৯। ঐ পৃঃ ২৪।

২০। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪৩১।

২১। ঐ পৃঃ ৪৩১।

২২। *Bengal Dist. Gazetteers Bankura*—L. S. S. O'Malley, p. 28 & p. 88.

২৩। *Bengal Dist. Gazetteers Burdwan*. p. 29 ; *Indian Land System*—Radhakumud Mookherjee, p. 41.

২৪। *Statistical Accounts of Bengal*, Vol. IV, p. 146. 'Kritichand, then proceeded to Murshidabad and got his name registered as propietor of the new properties.'

২৫। *Calcutta Review*, 1910, p. 125 ; *Imperial Gazetteers*, Vol. IX, p. 101.

২৬। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস—নিখিলনাথ রায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫৭।

২৭। *Statistical Accounts of Bengal*—Hunter, Vol. IV, p. 124.

২৮। *Annals of Rural Bengal*—W. W. Hunter, p. 429.

২৯। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ৩৭।

৩০। ঐ পৃঃ ৩৩।

৩১। রাজসভার কবি ও কাব্য—দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৮১।

৩২। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পরিশিষ্ট, পৃঃ ২৩।

৩৩। Bengal Dist. Gazetteers, Burdwan, p. 3.

৩৪। ক্ষিতিশ বংশাবলি চরিত, পৃঃ ৬৭।

৩৫। *The Seir Mutaqhrin*—Gholam Hossein Khan, Vol. II, p. 37.

৩৬। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৫ সাল, পৃঃ ৫৭-৬১।

৩৭। *Calcutta Review*, 1910, p. 125.

৩৮। *Sel. From Unpublished Records of Govt.*, No. 151.

৩৯। *Fifth Report*, p. 142.

৪০। *A Summary of the Changes in the Jurisdictions of Bengal*—Monmohan Chakrabatti, p. 3.

৪১। *Thc Story of Administration Laws in Bengal*—Govt. of West Bengal (Judicial Dept.), p. 72.

৪২। *Records of Govt.*, No. 508.

৪৩। Sel. *From Unpublished Records of Govt.*, No. 468 & No. 503.

৪৪। *Ibid*, No. 539.

৪৫। নদীয়া কাহিনী—কুমুদনাথ মল্লিক, পৃঃ ৩০ ; মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—ডঃ অলোককুমার চক্রবর্তী, পৃঃ ২৯।

৪৬। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ৮৫।'

৪৭। *Bengal Dist. Gazetteers*, Burdwan—J. C. K. Peterson, p. 34.

৪৮। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পরিশিষ্ট পৃঃ ৮৬।

৪৯। *East Indian Fortune*—P. J. Marshall, p. 195.

৫০। ভারতবর্ষের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)—ডঃ কিরণ চৌধুরী, পৃ ৯৪-৯৫।

৫১। *Bulletin of School of Oriental and African Studies* : University of London, Vol. XXVII, Part-2, 1964, p. 389. হেস্টিংস-এর বিচারের সময় 'Nabakisen produced bonds for sicca rupees 934, 727 with interest at 12%' *Nabakisen versus Hastings*—P. J. Marshall.

৫২। *Bengal Historical Records* (*New Series*) *Burdwan*: *letters* issued—Ed. Asoke Mitra, p. 82, p. 98 & p. 109.

৫৩। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ১৩০।

৫৪। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮।

৫৫। *Bengal Manuscript Records*—W. W. Hunter, Vol. III, Ref. No. 7228 / 7818, 7788, 7819, 7999, 8001 ; সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৯-৪২।

৫৬। জনশ্রুতি এই যে, প্রতাপচাঁদ বর্ধমান শহরে প্রত্যাগমনের পর শহরের বহির্ভাগে অর্থাৎ রেলস্টেশনের উত্তরে ও কাটোয়া-বর্ধমান রাস্তার ধারে বর্তমান 'বাজেপ্রতাপপুর' পল্লীতে অবস্থান করেন এবং তাঁর নামানুসারে ঐ স্থানের নাম 'বাজেপ্রতাপপুর' হয়।

৫৭। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত—রাখালদাস মুখোপাধ্যায় ; জাল প্রতাপচাঁদ—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম ও ২য় খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; *Calcutta Monthly Journal*—1839-40, p. 97-133 & p. 257-267.

৫৮। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত ; রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—মন্মথনাথ ঘোষ, পৃঃ ৩৭-৪৪ ও পৃঃ ৯৩-৯৪, সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড)।

৫৯। *Calcutta Review*, 1872, p. 174-95 ; 1910, p. 112-130 ; *The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zaminders etc.*

etc.—Loke Nath Ghosh, Part-II, p. 8 ; বর্ধমান রাজবংশানুচরিত ; বংশপরিচয় (৩য় খণ্ড) ; ভারত গৌরব (১ম খণ্ড)—সুরেন্দ্রমোহন বসু ।

৬০। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত ; বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন (অষ্টম অধিবেশন, ১৩২১ সাল), ভারত গৌরব (১ম খণ্ড) ; বংশ পরিচয় (৩য় খণ্ড) ; ***Glimpses of Bengal***—A. Cloude Campbell, p. 46-77.

প্রতাপচন্দ্র লীলারস প্রসঙ্গ সঙ্গীত

বিরচিতং শ্রীঅনুপচন্দ্র দত্ত

সুপ্রিমকোর্টে মামলায় পরাজয়ের পর জাল প্রতাপচাঁদ প্রিভিকাউন্সিলে আপীলের অনুমতি চাওয়ায় জজেরা আবেদন নামঞ্জুর করেন। সর্বোপরি আর্থিক অনটনের জন্য অনন্যোপায় হয়ে তিনি সাধারণের ন্যায় চাঁপাতলা, কলুটোলা, শ্যামপুকুর, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, বরানগর, ময়রাডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনযাপন শুরু করেন। এই সময়ে অনেকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামবাসী অনুপচন্দ্রও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি, যিনি স্বীয় গুরুদেবের লীলা প্রকাশার্থে "প্রতাপচন্দ্র লীলারস প্রসঙ্গ সঙ্গীত" রচনা করেন।

"প্রতাপচন্দ্র লীলারস প্রসঙ্গ সংগীত" গ্রন্থের কোন পুঁথি বা ছাপা অবস্থায় পাওয়া যায় না। বিশ্বকোষের প্রবর্তক রংগলাল মুখোপাধ্যায় হস্তলিখিত একখানি গ্রন্থ 'বীরভুমি' পত্রিকার সম্পাদক নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রেরণ করায় তিনি গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রকাশ করলেও সম্পূর্ণ অংশ ছাপা হয় নাই। সম্ভবতঃ সঞ্জীবচন্দ্র 'জাল প্রতাপচাঁদ' রচনা করার সময়ে লীলারস প্রসংগের কোন সন্ধান পান নাই; অন্যথায় জাল প্রতাপচাঁদে এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ বা মন্তব্যের সম্ভাবনা আশা করা যেত। আলোচ্য গ্রন্থটি ভক্তি রসাত্মক হলেও 'জাল প্রতাপচাঁদ'-এ অনুল্লিখিত অথচ রহস্যময় একটি অংশ লীলারস প্রসংগে বর্ণিত আছে। সেকারণে উপযুক্ত অংশটি, পুনর্মুদ্রিত করে প্রকাশ করা হল। 'বীরভুমি' পত্রিকার পুরাতন কপি সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে এবং উপযুক্ত অংশ প্রকাশের ইহাও অন্যতম কারণ।

বাংলা ১৩০৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় 'জাল প্রতাপচাঁদ' শিরোনামে "প্রতাপচাঁদ লীলারস প্রসংগ সংগীত" প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী চৈত্র, ১৩০৯ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ সংখ্যায় প্রবন্ধটির প্রকাশ সমাপ্ত হয়।

"প্রতাপচন্দ্র লীলারস প্রসংগ সংগীত" গ্রন্থের রচয়িতা অনুপচন্দ্র দত্ত বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অধীনস্থ শ্রীখণ্ড গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি এই গ্রামে বৈদ্যবংশীয় দুর্গামংগল দাসের পরামর্শে ১৭৬৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১২৫০ বংগাব্দের ১৩ই অগ্রহায়ণ (১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে) গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। অনুপচন্দ্র তাঁর গুরু জাল—রাজার নিকট হতে তাঁর জীবন রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন; যে সকল ঘটনা জাল রাজা হুগলী কোর্টের জবানবন্দীতে বলতে পারেন নাই বা সুপ্রিম কোর্টে তাঁকে বলতে দেওয়া হয় নাই। এ বিষয়ে আলোচ্য অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জাল রাজার জীবিত অবস্থায় গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়েছিল।

অজ্ঞাতবাসের পরিকল্পনা

মগধ তৈলঙ্গ কাশী কামিখ্যা উৎকলবাসী
স্বপ্রদেশী যত বন্ধুগণ।
ছল করি পত্র দিয়া আনিলেন আমন্ত্রিয়া
অজ্ঞাতের ব্যবস্থা কারণ॥
অখাদ্য ভোজন আর অগম্য গমন যার
অপেয় পানাদি পাপ জন্য।
অতিশয় মনস্তাপ কিসে ধ্বংস হয় পাপ
এই পরিচয় নহে অন্য।
বিচারেণ বন্ধুগণ তৎপাপ মোচন
হয় করে পুরাণানুকল্প।
যদি বর্ষ চতুর্দ্দশ করিয়া অজ্ঞাতবাস
ভণ্ড মৃত্যু প্রকাশয় স্বল্প।
এই বিধি জানি স্থির বিচার করেন ধীর,
মনে মনে শুধিব অন্তরে।
সময় নিকট জানি ভাবিলেন চক্রপাণি
রোগ ছলে যাব গঙ্গা তীরে॥
সৃজন বিকার জ্বর বুঝি ভাবে নৃপবর
চিকিৎসক কবিরাজে ডাকি।
নাড়ী ধরি নির্বাচিল মৃত্যুরোগ উপার্জিল
জীবের অগোচর এই ফাঁকি॥

গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা

শিবিকার দ্বার ধরি বহুত বিলাপ করি
রাণীগণ করয়ে রোদন।
প্রবোধিয়া মৃদুভাবে চলিলেন গঙ্গাবাসে
শোকাকুল পুরবাসিগণ॥
উত্তরিলেন অম্বিকায় আবাল বৃদ্ধা যুবা ধায়,
রূপ করিবারে দরশন।
আকুল নগরবাসী পুরুষ প্রকৃতি আসি
সবে করে হরি সঙ্কীর্ত্তন॥
জাহ্নবীর তট জুড়ি তম্বু কানাতে ঘেরি
তার মধ্যে পাতিয়া আসন।

বসিলেন করি ছল হরি ভকত বৎসল
সবার মন করিয়া হরণ ॥
ঘেরা পরদা চতুর্ভিত গেলা জলে আচম্বিত
দণ্ডাইয়া করি নানা স্তব ।
অন্তরীক্ষে গঙ্গাদেবী আসিয়া চরণ সেবি
তুসিলেন করিয়া গৌরব ॥
নিকটে পরাণ চন্দ্র গোসাঁই ব্রহ্মানন্দ
দোঁহাকারে কহেন বচন ।
যে রাজ্যের আমি রাজা ত্রিলোকেতে করে পুজা
সেই রাজ্যে আমার গমন ॥
এরাজ্যের রাজ্য কাজ কিয়ৎকাল অব্যাজ
পিতা পুত্রে কর অধিকার ।
পুর্ব্বের পুণ্যের বলে কিয়ৎকাল কুতুহলে
কর ভোগ বাঞ্ছা যত যার ॥
একথা স্মরণ রবে বিস্মরণ না হইবে
তবে পাবে সম্পদ বিস্তর ।
কহিলাম সতন্তর সাক্ষী গঙ্গা দিবাকর
গোসাঁই ব্রহ্মানন্দের গোচর ॥
ধীরাজ মহারাজ নরেন্দ্র নরের মাঝ
থাকিবেন দীপ্ত যত কাল ।
অনুগত হবে সবে সর্ব্ব ধর্ম্ম সমভাবে
সন্তোষে রাখিবে মহীপাল ॥
অধর্ম্ম সঞ্চার যবে জাতি কুল সব যাবে
লোক মাঝে পাবে বহু লাজ ।
প্রাণ লইয়া টানা টানি পাবে এই শাস্তি জানি
পদচ্যুত হবে এই রাজ ।
যার রাজ্য সেই লবে নিকাশে আটক হবে
নাহি গতি বিনা সে শরণ ।
শুনি বাক্য সুকৌশল ভয়ে তরল বিরল
জোড় হাতে করিল স্তবন ॥
অন্তর্গঙ্গা জানি তায় করিলেন মহাকায়
ক্ষণেক হইয়া সচেতন ।
দিবা দণ্ড দশ হয় উঠি বসি হাসি পায়
ক্ষৌর কর্ম্ম করিবারে মন ॥

ঈষৎ ইঙ্গিত হয়　　　নন্দসুন্দর আসি তায়
ক্ষৌর কর্ম্ম করি সমাপন।
হরিদ্রা আমলকি মাখি　　　স্নান করি কহেন ডাকি
উপহার করিব ভোজন ॥

ওলা মিছরী শর্কর　　　সরবত স্বতন্তর
তরমুজ শ্রীফল দাড়িম্ব।
হরীতকী ত্বক ছানি　　　সুধা মকরন্দ আনি
তাহাতে মিশ্রিত অবলম্ব।

সর ছানা রসে ছাঁকা　　　মনক্কা মাখন মাখা
নানা জাতি মোরব্বা পক্কান্ন।

সাজাইয়া থরে থর　　　পরিকর জোড় কর
সম্মুখে দণ্ডায় পাতি কর্ণ ॥

যথা ইচ্ছা আহুতি করি　　　পরি ষণ্গ উপরি
বসিলেন মন কুতুহলী।
দেখি তায় চমৎকার　　　হর্ষচিত্ত সবাকার
পরাণ চন্দ্র করে কৃতাঞ্জলি ॥

*　　*　　*　　*　　*

দিবা হয় অবসান　　　দেখি মুখ ম্রিয়মাণ,
অনুমানি পরিকরগণ।

সবে করে কানা কানি　　　কপালে আঘাত হানি
না জানি কি ঘটে বিড়ম্বন ॥
পূর্ব্বের নিয়ম কাল　　　উপস্থিত সেই কাল
নামিলেন দ্রবময়ী জলে।
উত্তরাস্য দাঁড়াইয়া　　　চকিত অচেতন হৈয়া
ডুবিলেন মায়া করি ছলে ॥

ঘেরা পরদা পার হইয়া　　　ধনু শতান্তর গিয়া
উঠিলেন তরণী বিরলে।
কেহ না দেখিতে পারে　　　হাহাকার শব্দ করে
ইতি উতি তপাশিয়া বুলে ॥
না পাইয়া সন্ধান　　　ভাবে বুঝি গেল প্রাণ
পরাণের পরাণ সংশয়।
ব্রহ্মানন্দ কহে আসি　　　শিরে হাত দিয়া বসি
বলে বল কি হবে উপায় ॥

একথা হইলে গোল   ভূপতি শুনিবে বোল
সবংশে গাড়িবে একখাদে।
করিলে নানা সন্ধান   তবু যদি বাঁচে প্রাণ
তবু অপমান অপবাদে ॥
কিসে দায় রক্ষা হয়   কর গোসাঁই সে উপায়
পড়িলাম বিষম সঙ্কটে।
দেখি শুনি ব্রহ্মানন্দ   অন্তরেতে নিরানন্দ
সৃজিল উপায় নিজ ঘটে ॥
কাষ্ঠের সিন্ধুক এক   ত্বরা করি আনিলেক
আর এক বাজনিয়া শঙ্খ।
সে শঙ্খ সিন্ধুকে রাখি   সিন্ধুক কম্বলে ঢাকি
লেপন করিল তার পঙ্ক ॥
অগ্নি দিয়া জ্বালাইল   মৃতদাহ গন্ধ হইল
পরাণের প্রাণ হইল স্থির।
প্রবঞ্চক শবদাহ   না জানিল অন্য কেহ
প্রাতঃকালে উদয় মিহির ॥
নিরঞ্জন সমাধান   ঝিল করি নির্ব্বাণ
সজল নয়নে সবে চলি।
দিবানিশি শোকে ভাসি   অম্বিকা নগরবাসী
আবাল বৃদ্ধ বিরহে ব্যাকুলী ॥
মৃত্যু হওয়া মিথ্যাবাণী   প্রতাপচন্দ্র আছে জানি
পরম্পর কিংবদন্তী হয়।
বিচারিয়া বিজ্ঞ লোক   তৎকাল পাসরে শোক
মধ্যে মধ্যে কানাকানি কয় ॥
পরাণচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ   কপট শোকে নিরানন্দ
মনোদুঃখে গিয়া রাজধানী।
মরণের বৃত্তান্ত   জানাইল আদ্য অন্ত
শোকে মগ্ন রাজার ভগিনী ॥
অনুগত লোক যত   শোকেতে জীবন মৃত
বিরহেতে বধূ ঠাকুরাণী।
ঘটিল দশম দশা   মুখে না নিঃসরে ভাষা
দোঁহাকার সংশয় পরানী ॥
দীপক রাগিণী স্বরে   কত না করুণা করে
ক্রন্দন করয়ে দিবানিশি।

প্রজ্জ্বলিত বৈশ্বানর দহিতেছে কলেবর
সর্ব্বাঙ্গ গলিয়া পড়ে খসি ॥
ধৈর্য্য নাহি ধরে ধরা অধারা না যায় ধরা
পাহাড় পাষাণ গলি যায় ।
পশু পক্ষী ছিল যারা রোদন শুনিয়া তারা
ত্যজিল আহার পাণী তায় ॥
অঝরে নয়ন ঝরে সকলে স্বস্থান ছাড়ে
বনপথে সবার গমন ।
মহারাজ রাজ্যেশ্বর ব্যাকুলিত নিরন্তর
বাকরোধ বিরহে বিমন ॥
প্রতাপচন্দ্রের বিচ্ছেদে জগৎ মজিল খেদে
পরাণচন্দ্রের মনাহ্লাদ তার ।
অন্তর্যামী নারায়ণ জানিয়া সবার মন
প্রবোধ করিতে ইচ্ছা যায় ।

*

পবনে করি স্মরণ কহিলেন বিবরণ
জগতে জানাহ এই বাণী ।
প্রতাপচন্দ্র জীবিতমান পুনঃ আসি বর্দ্ধমান
অধিষ্ঠান হইবেন জানি ॥
পবন আদেশ পাইয়া বর্দ্ধমান প্রবেশিয়া
প্রচার করেন এই বোল ।
একজনের মুখ হইতে আর জন শুনি তাথে
নগরে নগরে হইল গোল ॥
শোকের সাচব্য হয় বিষাদে হরিষ বর
প্রকারে প্রবোধ পায় সবে ।
পরাণে তণ্ডক করি অম্বিকা ছাড়িয়া হরি
তরণী বাহিয়া যান তবে ॥
মধ্যমকাণ্ডের আদ্য লীলা প্রকাশিত চারুশীলা
সমাপ্ত হইল এতদূরে ।
ভণ্ড মৃত্যু পরকাশ পরেতে অজ্ঞাতবাস
সে বৃত্তান্ত কহি অতঃপরে ॥
প্রতাপচন্দ্র লীলারস প্রসঙ্গ সঙ্গীত বশঃ
ঘোষিতে ঘোষণা ভূমণ্ডলে ।
অনুপচন্দ্র বিরচন তুষিতে জগত মন
সঁপি মন গুরুপদতলে ॥

আপনি কাণ্ডারী তরি ত্বরা চলি যায়। কেহ পথে জিজ্ঞাসিলে দেন পরিচয় ॥
হরিদাস কাণ্ডারী আমি হরি চরণ দায়। হরিসঙ্গে হরি ব'লে যাই হরিদ্বার ॥
শুনি পরিচয় সে প্রবোধ পায় তবে। বিধির অগম্য ভাবের অন্ত কতো পাবে ॥
নবদ্বীপ করিয়া পাছে নৌকা চলি যায়। হেন কালে নিত্যানন্দ মিলিল তথায় ॥
ত্যজিয়া নবাবী বেশ বেনয়া ফকির। গৌর আগমনে মনে হইয়া অস্থির ॥
নিজদেশে ভণ্ড মৃত্যু করিয়া প্রকাশ। পূর্ব্বের নিয়ম যথা আছিল নির্য্যাস ॥

* * *

তরণী ত্যজিয়া হরি-তটে উপনীত। হইল মিলন দোঁহে লোকে অবিদিত ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ হবে থাকিতে অজ্ঞাত। কোথা কোন রূপে যাই এবে অচিরাৎ ॥
শুনি স্বরূপাঙ্গে কন বিবরণ। উজ্জ্বল নগরে যাই আছে প্রয়োজন ॥
শ্যামলাল ব্রহ্মচারী তথা করে বাস। পূর্ব্বমত যোগী যোগে বড়ই বিশ্বাস ॥

* * *

প্রথমে আসাম রাজ্য ব্রহ্মার মুলুক। প্রতাপচন্দ্র পরিচয় জানান চুম্বক ॥
কৃতনাম খ্যাতি কৃত ব্রহ্মা নাম। তেঁই সে ব্রহ্মার মুলুক সেহীত আসাম ॥
ব্রহ্মার মুলুকে খেলা যেই হইল প্রকাশ। জানিল জানরেল তাহা করিয়া নির্য্যাস ॥
প্রতাপচন্দ্র জীবিতমান থাকা হইল সত্য। কভু মিথ্যা নয় কথা সবে জানি তথ্য ॥
পশ্চাৎ প্রমাণ হেতু ধরা সুরতহাল। দৈবের নির্ব্বন্ধ বাধা মিটাইতে জঞ্জাল ॥
তথা হইতে চলিলেন কামরূপ কামাক্ষ্যা। যোগ যাগে তন্ত্রমন্ত্র আদি করি শিক্ষা ॥
তদন্তরে দেব রাজা নেপাল ভুপাল। হেরিয়া নাথ বদরিনাথ সহিত হেমতাল ॥
চন্দ্রশেখর চিত্রকুট হরিদ্বার। কাশী কাঞ্চি প্রয়াগ অযোধ্যা সরযূপার ॥
ব্রজধাম বৃন্দাবন গোকুল মথুরা। মিথিলা জনকপুর দ্বারকা শিঙ্গারা ॥
গোকরণ নাথ জ্বালামুখী বৈদ্যনাথ। নানা তীর্থ নানা দেশ ভ্রমিয়া পশ্চাৎ ॥
বন উপবন আর পর্ব্বত পাহাড়। নানা বেশে পরবাসে করিয়া বিহার ॥
লাহোর গঞ্জার সে মুলুক পেশোয়ার। সিংহকুল রণজিৎ নাম, তার অধিকার ॥
কাশ্মীর কাবুল চীন কনুজ কান্দাহার। গৌতগঞ্জ কুটী আওমিলও (?) সহর ॥
কান্দপুর বাস বিতালি ভগবন্ত নগর। হিমাদ্রি পর্ব্বত হিমালয়ের উত্তর ॥
মণিপুর সেতুবন্ধ তৈলঙ্গ কর্ণাট। কাঞ্চীপুর নগর কান্তি দ্রাবিড় গুজরাট ॥
মুলতান দিল্লী লক্ষ্মৌ বোম্বাই ইরান। তুর্কিস্থান মক্কা মদিনা মাধাই ॥

* * *

শ্যাম সাহি অতিক্রম করিয়া তখন। অবশেষ রূপ মধ্যে দিয়া দরশন ॥
নিৰ্জ্জন নিবাসী দোঁহে বিচারিয়া মনে। দিল্লীর ঈশ্বর আসি মিলিল সেখানে ॥

রণজিত সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

আচম্বিত দেখি রূপ আনন্দে রণজিত ভূপ,
আগে সরি করি নতি স্তুতি।
বসিতে দিব্যাসন যোগাইল ততক্ষণ
পাদ্যার্ঘ সুগন্ধি আরতি॥
বনমালী বলরাম পূরাইতে মনের কাম
ছদ্মবেশ ধরিয়াছ হরি।
কৃপা করি-পরিচয় দাও হরি দয়াময়
রহিলাম রাঙ্গা পদধরি॥
হেনকালে উপনীত রুম সাহার প্রেরিত
দূতহস্তে পত্রী পরয়ানা।
পত্রী লইয়া শিরে তুলে পাঠ করে বন্ধ খুলে
প্রেমে ভাব উপজিল নানা॥
ব্রহ্মাদি দেবগণ যে মায়ায় মুগ্ধ মন,
সে করণ কে বুঝিতে পারে।
সত্বগুণ দূরে গেল রজ তম উপজিল
বলে ভাল সামান্য আকারে॥
পুরী বর্দ্ধমান ধাম প্রতাপচন্দ্র যার নাম
সেই বুঝি হবে কহ সত্য।
সাহা পত্র শিরে ধরি হইলাম আজ্ঞাকারী
সর্ব্বাপদ করিবহিনিষ্পত্য॥
শুনি সত্য সুকৌশল হেলায় হইল হিল্লোল
মাতি মত্ত মাতঙ্গ বিশেষ।
আজি কিম্বা কালি হয় দণ্ডেক বিলম্ব নয়
যেবা ইচ্ছা শুনি সে আবেশ।
কিয়ৎকাল করি বাস মনে এই অভিলাষ
ইঙ্গিতে ইঙ্গিত পরিচয়।
জানিয়া বিশেষ তত্ত্ব রাজা হইল অত্যন্ত
মনে মনে আনন্দ হৃদয়॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ ঘরে দিব্য সিংহাসন পরে
মৃগচর্ম্ম পাতি তার উপর।
বসিলেন দুটি ভাই রবি শশী এক ভাই
অপরূপ মুনিমনোহর॥

অন্তঃপুরবাসী নারী সেবাতে নিযুক্ত করি
পরিকর হইয়া রাজন।
নিরবধি কায়মন সেবা করি অনুক্ষণ
ভক্তিপথে থাকিয়া ভাজন।
যত পুরবাসী জন আনন্দে বিভোল মন
রোগ শোক তাপ নিবারণ।
সৎপ্রসঙ্গ সারাদিন বাল্য যুবা কি প্রবীণ
ওয়া গুরু বলি কালযাপন ।।
কুটিল কপটহীন নিষ্ঠা মন প্রতিদিন
রাজ আজ্ঞাধারি শিরোপর।
সাতাইশ লক্ষ সেনা যার নব লক্ষ অসোয়ার
হয় হস্তী মত্ত মাতোয়ার
প্রহরে প্রহরী সব কে করিবে অনুভব
যে বৈভব জগৎ সমাজ।
পাণ্ডু বংশের অংশ সেনা বলবন্ত সর্ব্বজনা
যোড় হাতে সবে যুদ্ধ সাজ ।।
দেখিয়া ঐশ্বর্য্য সাজ প্রতাপচন্দ্র মহারাজ
প্রকাশেন নিজ পরিচয়।
বর্দ্ধমানবাসী রাজা জানি সবে করে পূজা
ভক্তিভাবে সর্ব্বময় ।।

তৃতীয় বিবাহ

দৈবখেলা অনুপম সুদয়াল সিংহ নাম
জনকাংশে ক্ষাত্র কুলোদ্ভব।
রঞ্জিতের প্রিয়পাত্র শ্রীরূপের নেত্রে নেত্র
হেরি মাত্র কি নেত্র উৎসব ।।
হইল পূর্ব্ব স্মরণ স্নেহে পুলকিত মন
কবিরূপ দরশন তায়।
শরীর রোমাঞ্চ হয় প্রাণে তুল্য ভাবোদয়
ভাবে পরিচয় কর কায় ॥
ঘরণী ঘরের কর্ত্তা তারে জানাইতে বার্ত্তা
চলিল দেওয়ান দ্রুতগতি।
প্রবেশিয়া অন্তঃপুর জায়ারে কহেন চতুর
শুন শুন রসবতী সতী ॥

আজি রাজ দরবার দেখিলাম চমৎকার
দূর্বাদল শ্যাম রাম রূপ।
দক্ষিণে অনুজ তার গৌরবর অবতার
সুমিত্রা কুমার রসকুপ ॥
মনে হয় পুনঃ যাই নিকটে থাকি সদাই
রামরূপে ভুলিয়াছে মন।
কহিলাম সমাচার কেমন মন তোমার
কহ প্রিয়া স্বরূপ বচন ॥
স্বামি মুখে মৃদুভাষ প্রেয়সী প্রেমে উল্লাস
গদ গদ স্বরে কহে ভাষ।
পুন এ সৌভাগ্য কবে তনয়া কি জানকী হবে
নাম রজনকুমারী প্রকাশ।
তব মুখে রাম বোল শুনি মন উৎরোল
কত সাধ মনেতে সাধন।
চল চল সঙ্গে যাই হেরিয়া হিয়া জুড়াই
মন সাধ মিটাই আপন ॥
তনয়া রজন কুমারী রামে সমর্পণ করি
জগজনে জানাই ভজন।
বিলম্বের কার্য্য নাই অবিলম্বে চল যাই
তার ঠাঁই হইগো ভাজন ॥
লইয়া কুমারী সঙ্গে স্ত্রীপুরুষ নানা রঙ্গে
নানা উপহার ভারে ভার।
শুভ যাত্রা শুভক্ষণ গত মাত্র দরশন
ঘুচিল মনের অন্ধকার ॥
কুমারীরে করে ধরি রামে সমর্পণ করি
দেওয়ানের প্রেয়সী চতুরা
বলেন লক্ষ্মী সঁপিলাম মনঃ প্রাণ সাধিলাম
ধনুর্ভঙ্গ মিথিলার ধারা ॥

এরপর রঞ্জিৎ সিংহের সঙ্গে ইংরাজদের বিবাদের সূত্রপাত ও প্রতাপচাঁদের মধ্যস্থতার ঘটনা বর্ণিত আছে। রজনকুমারীর গর্ভে প্রতাপচাঁদের পুত্র মুলুকচন্দ্রের উল্লেখ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। পাঞ্জাবে কিছুকাল বসবাসের পর তিনি দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে গয়া, কাশী, নেপাল, বিরাট ও মুর্শিদাবাদ হয়ে উত্তর রাঢ়ের পথে শ্রীখণ্ড গ্রামে তাঁর আগমন ঘটে। কবি প্রতাপচাঁদের প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে গয়ায় সাক্ষাৎকার বর্ণনা করেছেন,—

ধর্ম্মের নন্দন মন করি উপশম। তথা হইতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে গয়াভুম ॥
নবম বৎসর গত হইল অজ্ঞাত। পরম আশ্চর্য্য খেলা হইল অকস্মাৎ ॥
প্রতাপচন্দ্র বিরহে প্যারীকুমারী ব্যাকুল। গয়াভুম যাব বলি করিলেন তুল ॥
ঈশ্বরী ঈশ্বর লীলা মহিমা অপার। ইচ্ছাতে ঘটনা ঘটে কে খণ্ডিবে আর ॥
মনেতে বাসনা রূপ করি দরশন। শিবিকা সোয়ারি হ'য়ে করিলেন গমন ॥
সেই দিবস গয়াভুম করিলেন প্রবেশ। ছদ্মবেশী আসি মিশিলেন হৃষীকেশ ॥
উভয়ের মনোবাক্য হইল পরিচয়। বিষাদে হরিষ চিত্ত হইল উদয় ॥

* * * *

গোপন মিলন এই লোকে অপ্রকাশ। অন্তলীলা সারকথা করিবে বিশ্বাস ॥
লোক বুঝাইতে লীলা আর এক প্রকার। বিস্তার করিয়া কহি নির্য্যাস তাহার ॥
প্যারীকুমারী পথে চলেন যখন। স্বরূপাঙ্গ ছদ্মবেশী পথেতে মিলন ॥
কেশ বেশ মাথা ভুষ রাকা চন্দ্রমুখ। হেরি রূপ চমৎকার দূরে মনোদুখ ॥
অট্টহাসি মৃদুভাষী ক্ষণেতে মগন। প্রতাপে প্রতপ্ত (?) নাস্তিঃমুখে উচ্চারণ ॥
বারবার বাক্য সার শুনি সিমন্তিনী। কি করি ব্যবস্থা মনেতে অনুমানি ॥
বুধগণের বিধিবাক্য মনে ঐক্য করি। ফলগু নদী তীরে বসি প্যারীকুমারী ॥
প্রতাপচন্দ্র জীবিতমান পিণ্ড দিতে নাই। গয়াভুমে এই কথা সবারে জানাই ॥
পিণ্ডদান না করিয়া রাণী ফিরে যান। গয়াভুমে একথার লোকে করে গান ॥
পুনঃ আসি প্রতাপচন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশ। কহিতেছেন বিবরণ বচন শ্লেষ ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ গতে স্বদেশে গমন। হইলে দুষ্ট দলন হইবে মিলন ॥
কলঙ্ক ভঞ্জন আগে করিব জগতে। পরাণচন্দ্র প্রতিবন্ধ হইবে নানা মতে ॥
বিচারে পরাস্ত যবে হবে নরাধম। মনে মনে জানে সে পশ্চাৎ আছে যম ॥
বিপদে অধৈর্য্য হওয়া ভাল কার্য্য নয়। স্থির পাণি প্রস্তর ভেদ করে সত্য কয় ॥
কিয়ৎকাল ব্যজে কর্ম্ম হইবে সফল। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা বিনা সকলি বিফল।
ইঙ্গিতে আশ্বস্তা হয়েন প্যারীকুমারী। কহিলেন ইচ্ছা যেবা কর বনচারী ॥
তব মনোবাঞ্ছা যে বা অন্যথা কি হয়। এত কহি স্বপ্রদেশে গমন নিশ্চয় ॥
বর্দ্ধমান প্রবেশেন প্যারীকুমারী। গয়ার বৃত্তান্ত কহেন করিয়া চাতুরী ॥
না করেন পিণ্ডদান অনেকে জানিল। সুস্পষ্ট হইয়া কথা অস্পষ্ট রহিল ॥

প্রতাপচাঁদের আদেশে স্বরূপাঙ্গ উত্তররাঢ় দেশে ভ্রমণ করতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে মুরশিদাবাদ হতে জজান পাঁচথুপি গেলেন। পাঁচথুপি মুরশিদাবাদের ১৪ / ১৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম ময়ূরাক্ষী তীরে অবস্থিত। তারপর পাঁচথুপীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব সোণারুন্দিগ্রামে পরমানন্দ নামক ব্রাহ্মণের বাটী গমন করেন। তথা হতে মশাগ্রাম নিবাসী জমিদার বদনানন্দের গৃহে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে সোণারুন্দি

(বনয়ারিবাদ) গ্রামের রামানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁরা মশাগ্রাম হতে বর্ধমান গমন করেন ও তথায় এক মাস অবস্থান করেন। সেই স্থানে শ্রীখণ্ড-নিবাসী দীননাথ নামক এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। দীননাথ শ্রীখণ্ডের বাবু দুর্গামঙ্গলের কর্মচারী। তিনি বাটীতে প্রত্যাগমন করে দুর্গামঙ্গলবাবুকে সন্ন্যাসীর কথা বলেন। দুর্গামঙ্গলবাবু সে কথায় বড় মনোযোগ দেন নাই। সহসা একদিন অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে স্বরূপাঙ্গ একাকী শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হলেন। বেলা দুই প্রহরের সময় গ্রামের মধ্যভাগস্থিত ব্রাহ্মণপাড়ায় যেখানে ভগবতী ব্রাহ্মণীর শিবালয় আছে, সেই স্থানে সন্ন্যাসী একাকী উপস্থিত হলেন। প্রথমেই দীননাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। দীননাথকে জিজ্ঞাসা করেন, "রামসুন্দর তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাটী কোথায়?" দীননাথ পথ দেখাইয়া দিলে তিনি ক্রমশঃ উত্তর মুখে গিয়ে দুর্গামঙ্গলবাবুর বাটীতে উপস্থিত হলেন। দুর্গামঙ্গলবাবুকে সংবাদ দিবার জন্য ভৃত্যদের আদেশ করায় তারা বলে বাবা পূজা আহ্নিক করছেন। তখন স্বরূপাঙ্গ বলেন, "বাবুকে বল, পূজা আহ্নিকে কোন প্রয়োজন নাই।" দুর্গামঙ্গলবাবু শুনিয়া উঠিয়া আসিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহার বড় ভক্তি হল। সন্ন্যাসী তথায় সাত মাস অবস্থান করলেন। এইবার উভয়ে প্রতাপচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হলেন। সঙ্গে পরাণ মুখুজ্যে, কানাই নাপিত, রামানন্দ নামক চারিজন লোক ছিল। ছয় জনে জলপথে বরাহনগরে প্রতাপচাঁদের নিকট উপস্থিত হলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব (প্রতাপচাঁদ) তাঁদের সঙ্গে এলেন না। সকলে শ্রীখণ্ড ফিরিয়া এলেন। দুর্গামঙ্গলবাবু পুনরায় নবানন্দকে প্রতাপচাঁদকে আনবার জন্য প্রেরণ করলেন। এবার প্রতাপচাঁদ আসবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সঙ্গে বরাহনগরের সাগর বসু ও গোবিন্দ ঘোষ এলেন।

সাগর গোবিন্দ বুধানন্দ সহচর। যাত্রা করি চলিলেন নৌকার উপর॥
মৃগচর্ম্ম পাতি তায় বসিলেন রূপ। কামিনীমোহন রূপ জিনি অপরূপ॥
ভাগীরথী দ্বিকুল করিয়া দীপ্তিমান। নিশি দিশি সম ভাব অভাব অজ্ঞান॥
কুল ত্যজি কুলবতী কুলে আগমন। কুল কুল কুল কুলাইবেন শ্রীমধুসূদন॥
আবাল বৃদ্ধ যুবা কিবা প্রকৃতি পুরুষ। ব্যগ্র চিত্তে সবে ধাই সহি কুশাঙ্কুশ॥
পঞ্চম দিবস মধ্যে দাঁইহাটের ঘাট। উত্তরে তরণী যথা, মুনির শ্রীপাঠ॥
হাটে জনরব হইল আইল গৌরাঙ্গ। নিরখি মোহিত মন রূপের তরঙ্গ॥
শ্রীখণ্ডে সংবাদ রূপ পাঠান গোপনে। স্বরূপাঙ্গ সাজিলেন বাবু সঙ্গোপনে॥
শ্যামলাল হাজারা খ্যাতি ব্রাহ্মণ নন্দন। সহকারী সহ সঙ্গে সদা মত্ত মন॥
ভেটিলেন স্বরূপাঙ্গ লইয়া সঙ্গিগণে। করে কর ধরি রূপ বসি একাসনে॥
কাশীরায়ের চবুতরা নিকট গঙ্গার। সেই স্থানে অবস্থিত হইল সবার॥
কবিরাজ কমলাকান্ত বৈদ্যকুলোদ্ভব। চতুর্মুখে লিখক পাত্র লীলার বৈভব॥

* * * *

বেড়ায় তরণী আনি করি আরোহণ। কণ্টকনগর পথে সবার গমন ॥
কণ্টকনগর ঘাটে উত্তরে তরণী। সোণার মানুষ আইল হইল এই ধ্বনি ॥
পুরুষ প্রকৃতি ধায় দেখিবার মন। কমলা বেওয়ার ঘরে হইল আসন ॥
কায়স্থকুলোদ্ভব নারী স্বভাব সরলা। কৃষ্ণ অনুরাগী চিত্ত সহজে চঞ্চলা ॥
বাবু সঙ্গ স্বরূপাঙ্গ বাবুর আলয়। নিজাসনে বসিলেন আসি দয়াময় ॥
শিবিকা প্রেরিত হেতু হইল ইঙ্গিত। তৈনাৎ তৎক্ষণাৎ বাবু পাঠান ত্বরিত ॥
অট্ট অট্ট হসন দশন দীপ্ত হয়। জগজন চমকিত হেরি জগৎময় ॥
অবিলম্বে শিবিকায় করি আরোহণ। শ্রীখণ্ডাসনে আসি দেন দরশন ॥
আগে সারি বাবু বার ধরি শিবিকার। নিজালয় আসিয়া মাগেন পরিহার ॥
বসিলেন একাসনে রূপ স্বরূপাঙ্গ। নগর শ্রীখণ্ড মাঝে বাড়ল তরঙ্গ ॥

শ্রীখণ্ডগ্রামে প্রতাপচাঁদ দুর্গামঙ্গলবাবুর গৃহে অবস্থান করেন এবং তিনি প্রতাপচাঁদের অত্যন্ত অনুরাগী ভক্তে পরিণত হন। গ্রামস্থ অন্যান্য লোকেরাও সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীখণ্ডে আট দিন অবস্থানের পর তিনি বর্ধমান উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। এর পরের ঘটনাসমূহ 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। বাহুল্য ভয়ে পুনরুক্তি হতে বিরত থাকাই শ্রেয়।

গ্রন্থ সমাপ্তির পর গ্রন্থকার লিখেছেন—"ইতি আনাগত প্রতাপচাঁদ লীলারস প্রসঙ্গ সঙ্গীত গ্রন্থ সমাপ্ত। বিচরিতং শ্রীঅনুপচন্দ্র দত্ত উগ্রক্ষত্রিয় কুলজাত শ্যামসুন্দর দত্তাঙ্গজ মৃত্যুঞ্জয় জনক কনিষ্ঠ গোপাল, ভ্রাতুষ্পুত্র গুরুদাস ধনঞ্জয় বিশ্বজয় শ্রীখণ্ডধাম বসতিং * * * শকাব্দা ১৭৬৫। আনন্দনামা বর্ষ ১২৫০। ১৩ মার্গশীর্ষেতু ত্রয়োদশ দিবসীয় সোমষষ্ঠী নক্ষত্র শ্রবণা দিবা দ্বিপ্রহর।"

প্রতাপচন্দ্র গাথা

দ্বিজ কার্তিকচন্দ্র

প্রতাপচাঁদ সম্পর্কিত একটি গাথায় প্রতাপের গৃহত্যাগ ও পুনরায় প্রত্যাবর্তনের পর বাঁকুড়ায় জেলাশাসক কর্তৃক কয়েদ হওয়ার কাহিনী বর্ণিত আছে। কিন্তু গাথাটির সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে ১৫৫৩ সংখ্যক পুঁথির মাত্র ২টি পৃষ্ঠা রক্ষিত আছে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে দ্বিজ কার্তিকচন্দ্র রচিত গাথায় কালনা অভিমুখে গঙ্গাযাত্রা, পলায়ন ও প্রত্যাবর্তনের পর কারারুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত আছে। দ্বিজ কার্তিকচন্দ্রের কোথায় নিবাস ছিল সে কথা জানা যায় না। ডঃ আবদুস সামাদের মতে, 'প্রতাপচাঁদের জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে তিনি যে রকম ওয়াকিবহাল, তাতে তাঁকে বর্ধমান শহরের স্থানীয় অধিবাসী বলে মনে করার কারণ আছে।'[১] লেখকের বর্ণনায় সাহিত্যমূল্য না থাকলেও কিছু নূতন ঘটনার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৭ **শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায়—**

রাজা আজ্ঞা পেয়্যা তখন জত কর্মীগণ।
গঙ্গাজল··· করিলা শ্রীজন॥
শ্রীজন করিয়া তখন রাজাকে কহিল।
হাত করি জোড় রাজা গঙ্গা তিরে চল॥
রাজা বলে জাইব আমি শুনহ বচন।
সিন্ধুক তৈয়ার করি আনহ এখন॥
রাজ আজ্ঞা পেয়্যা তবে সিন্দুক গড়িল।
সিন্দুক আনিয়া নৃপতির পাশে দিল॥
তাহা দেখি মহারাজ হইল সানন্দ।
বসন্তবাবু সহিত চলিল ব্রহ্মানন্দ॥
গঙ্গাতিরে উপনিত হইলা রাজন।
জোড় হাথে প্রণমিল দেবির চরণ॥
পালাবার পথ নাই রাজা দেখে মনে।
ব্রহ্মানন্দ বসন্তবাবুকে বলি হে কথনে॥
শুন দুইজন তোমরা আমার বচন।
লক্ষ তঙ্কা লএ কর দান বিতরণ॥

১। বর্ধমান রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২৯৮।

দুইজনায় টাকা লয় রাজার সম্মুখে।
কথো বিতরণ করি নিজে কথো রাখে ।।
টাকা লয় দুইজন আপন আসা মেটে।
প্রতাপচন্দ্র গঙ্গার নিরে দণ্ডান করপুটে ॥
উচ্চস্বরে স্তব করে রাজার নন্দন।
আচম্বিতে অদর্শন হইলা তখন ॥
জলে ডুবি মহারাজা উঠে গিয়া নায়।
ব্রহ্মানন্দ সহিত কেহ না জানে তথায় ॥
নায়ে চাপি এথানেতে গেলেন রাজন।
দুই জনে গঙ্গাজলে নাম্বিলা তখন ॥
মহারাজায় খুজে তবে জলের ভিতরে।
জলে নাই মহিপাল গেল কোথাকারে ॥
কথোক্ষণ দুইজন ভাবিতে লাগিল।
নাই জানি নৃপতি নন্দন কোথা গেল ॥
কেহ বলে কুম্ভিরেতে খাইলেক ধরে।
কেহ বলে মলে ভাসে জলের উপরে ॥
বাবু বলে গোশাঞী পুত্র ইহার উপায় কি।
রাজা বাক্সয় আছে বলে পোড়াইয়া দিই ।।
এত বলি বাক্স জেলে দিলেন যখন।
ক্ষণমাত্রে ভস্মরাশি হইলা তখন ॥
সিন্দুকে পুড়িল রাজা হইল ঘোষণা।
তাহা কেহ নাই জানে এতেক মন্ত্রণা ॥
দ্বিজ কার্ত্তিকচন্দ্র বলে শুনহ বচন।
কোথা গেল ছোট রাজা না জানি করণ ॥

ত্রিপদী

পুত্র হত শুনি কানে মহারাজা ততক্ষণে
রানিগণ সহ সঙ্গে করি।
হাহাকার রব করি কান্দে অন্তপুরনারি
কান্দে রানি কমলকুমারী ॥

আইস পুত্র মোর কাছে তোমার বারদ্বারি আছে
ফের নিজ রত্নসিংহাসনে।
অল্পকালে রূপ ধরি ....
কি পাপে হইল ভাবি মনে।

রাজা কাঁদে ভুমে পড়ি   ওঠ পুত্র মরি ২
দেখা দিয়া রাখহ জীবন।
বিধাতা তোমারে কই   একপুত্র বই নাই
তাও তুমি করিলে হরণ।।
তোমারে কি দিব দোষ   সকল আপন দোষ
কপাল মাত্র করি আমি সার।
তুমি মাতা মঙ্গলা   দেহ মোর রত্নমালা
এই আমি বলি বারে বার।।
শুন প্রভু লক্ষীনারান   রাখহ বাছার পরান
রাজত্ব বাছার রাখ তুমি।
অপুত্র হইল রাজা   কোথায় পালিব প্রজা
রাজার বাছারে রাখ তুমি।।

প্রত্যাবর্তনের পরের অংশটি পুঁথির ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় আছে—

আনন্দিত হয়্যা রাজা গেলেন জেহেলে।
রাজা আমি মনে জানে সঙ্গের সকলে।।
আমার নিমিত্ত কষ্ট পেলে সর্ব্বজন।
জদি সত্য হয় আমি রাজার নন্দন।।
যেদিন সুদিষ্টি হবে আমায় চাইবে ভগবান।
একাধারে রাখিলেক সঙ্গের সঙ্গি গণ।।
সঙ্গে সরূপ নারান দেখ লইয়া জেহেলে।
ক্রমে ২ চারমাস বঞ্চিল অবহেলে।।
মরে নাই ছোট রাজা সহায় গোবিন্দ।
রাজার সংবাদ শুনিয়া পিথিবি নিরানন্দ।।
পিথিবির লোকজন করে হাহাকার।
তাহা শুনি পরানবাবুর আনন্দ অপার।।
লোকজন সভে বলে কি বলিব আমি।
হাকিম হয়ে অন্যায় করে রাখ চক্রপানি।।
দ্বিজ কাত্তিকচন্দ্র বলে সন ইতি জায়।
তেতা যুগে রামচন্দ্র জন্মিলেন দশরথের পায়।।

*   *   *

ইহার সহিত ফের কিসের লাগিয়া।
এ তোমার কে হয় কহ বিবরিয়া।।
সাহেবের কথা শুনি হাসিতে লাগিল।
তাছিল্য করিয়া সেও উপহাস কৈল।।

পরিচয় না পায়্যা সাহেব রাগিল তথন ।।
দুই চক্ষু রক্ত বর্ণ কাঁপিতে লাগিল ।
বর্ব্বর বলিয়া সাহেব তারে গাল ছিল ।।
সে বলে কি কারণে গাল দাও তুমি ।
প্রতাপচন্দ্র রাজার তর্জবিজ কর গিয়া তুমি ।।
তর্জবিজ করিতে আমি বলি নাই তোমারে ।
মিথ্যা গালি দেহ তুমি ত আমারে ।।
একথায় ক্রুদ্ধ [সাহেব] হইলা হেথায় ।
হেনকালে পরানবাবুর লোক গেলেন তথায় ।।
কি মন্ত্রনা কৈল সে সাহেবের কানে ।
তার মন্ত্রনা পেয়্যা সাহেব রাগিল তথনে ।।
বিষ্ণুপরে ছিলে তুমি ফকির বলিয়া ।
এবে কিছু লোক নিয়া জায় রাজা বানাইয়া ।।
এতবলি নাজিরকে ডাকিয়া বলিল কথন ।
এবেটাকে জেহেলে লয়্যা রাখগে এখন ।।
রাজা বলে কি কারণে জেহেল দিবে তুমি ।
তোমাদের কারো ঘর মারি নাই আমি ।।
কাকে খুন করিয়াছি বলনা আমায় ।
হাঙ্গামা সদরের কি আপন এক্তারে ।।
সাহেব বলে জেহেল দিব আপন এক্তারে ।
তুমি কি করিবা আমার বল না আমারে ।।
সর্ব্বস্ব লুট করি তুমি [নিয়েছ] আমার ।
আর কি করিবে কর এক্তার তোমার ।।

(এর পরের অংশ খণ্ডিত)

পরিশিষ্ট—১

মহারাজা তেজচন্দ্রের সঙ্গে প্রতাপচাঁদের রানিদের বিবাদ

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী শ্রীযুত হোল্ট মেকেঞ্জি সাহেব বরাবরেষু।—আমারদের নিবেদন যে আপনারা নিতান্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক আমারদিগের দরখাস্ত শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে সমাবেদন করেন।

আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামী মহারাজা প্রতাপচন্দ্র বর্দ্ধমানের মহারাজ ৺তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের পুত্র বাঙ্গালা ১২২৭ সালের ২৭ পৌষে ৺প্রাপ্ত হন এবং আমারদিগকে অর্থাৎ দুই বিধবাকে হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে স্থাবরাস্থাবর তাবদ্বিষয়ে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া যান। আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির জীবদ্দশায় অতিবৃহৎ জমীদারী ছিল তাহা কতক তাঁহার পিতামহীর দত্ত কতক তাঁহার পিতার দত্ত কতক তিনি স্বয়ং ক্রয় করেন। আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির মৃত্যুর ৭ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতা বৃদ্ধ হওয়াতে আপনার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত তাবদ্বিষয় দান পত্রের দ্বারা প্রতাপচন্দ্রকে দিয়াছিলেন এবং তাহা দেওয়ানী ও কালেকটরী আদালতে রেজিণ্টরী করিয়া দেন কিন্তু যুগধর্ম্মপ্রযুক্ত আমারদের স্বামী জমীদারী বিষয়ে কএক বৎসরাধি তাদৃশ মনোযোগ না করণেতে ঐ জমীদারী বৃদ্ধ রাজা আপনার জিম্মায় রাখিলেন পৃথিবীর মধ্যে ঐ পিতাই তাঁহার মিত্র ও নিকট কুটুম্ব তথাপি প্রতাপচন্দ্র ঐ সকল ভূম্যধিকারের স্বামিত্বপ্রযুক্ত তাহার বার্ষিক উপস্বত্ব পাইতেন।

পরন্তু তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামী পূর্ব্ববৎ ঐ সকল জমীদারীর খরচ বাদে উপস্বত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কেবল নহে জমীদারীর তাবদ্ব্যাপার তিনি স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেন এবং ঐ ব্যাপার নির্ব্বাহার্থ দেওয়ানী ও কালেকটরী কাছারীতে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার ঐ অধিকারের মধ্যে যে কোন ব্যাপার হইত তাহাতে রাজস্ব সম্পর্কীয় ও দেওয়ানী সম্পর্কীয় কর্ম্মকর্ত্তারা তাঁহাকেই তাহার দায়ী জ্ঞান করিতেন ইহার সাবুদের নিমিত্ত আমারদের দলীল দস্তাবেজ ও প্রচুর সাক্ষী আছে তদ্দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির মৃত্যুর পূর্ব্বে অনেক কাল ঐ তাবৎ জমীদারীর তিনি একাই অধিকারী দখলীকার ছিলেন। বর্দ্ধমানের জজ ও মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত জে আর হাচিনসন সাহেব এবং ঐ জিলার তৎকালীন রেজিস্টর শ্রীযুত এডমণ্ড মলোনি সাহেব এবং ঐ জিলার কালেকটর শ্রীযুত আনরবল এলিয়ট সাহেব এবং চিকিৎসক শ্রীযুত ডাক্তার কৌটর সাহেব ও বর্দ্ধমানস্থ বৃদ্ধ সম্পর্কীয় তাবদ্ব্যক্তি ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আছেন এতদ্ভিন্ন সকলেই অবগত আছেন যে শ্রীযুত সেক্রেটরী প্রিন্সেপ সাহেব মার্কুইস হেস্টিংস সাহেবের আমলে আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামিকে শ্রীলশ্রীযুক্তের সঙ্গে বর্দ্ধমানের রাজা বলিয়া সাক্ষাৎ করাণ এবং

শ্রীলশ্রীযুক্ত যে সম্ভ্রম ও খেলাৎ বর্দ্ধমানের রাজার উপযুক্তই কিন্তু রাজপুত্রের নহে এমত সম্ভ্রমপূর্ব্বক খেলাৎ প্রদান করিলেন এবং মুরশিদাবাদস্থ শ্রীযুক্ত নওয়াবও আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামিকে তদ্রূপ সম্ভ্রম করিয়াছিলেন ইত্যাদি তাবদ্বিষয়ের দ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে যে ঐ প্রতাপচন্দ্র বর্দ্ধমানের সম্পূর্ণ রাজার ন্যায় সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও স্বীকৃত হইয়াছিলেন কদাচ অপেক্ষিত রাজা নহেন।

তাঁহার মরণোত্তর জিলার কালেকটর শ্রীযুত এলিয়ট সাহেব বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে আইনমত আমারদিগকে তাঁহার উত্তরাধিকারিণী জ্ঞান করিয়া তাবৎ ভূম্যধিকারের দখল দেওয়াইলেন এবং তাহা আমারদের নামে রেজিস্টরী করাইলেন। জিলার জজ সাহেব ১৮২১ সালের ৬ আপ্রেল তারিখে এক রুবকারীর দ্বারা আমাদিগকে তাবৎ জমীদারীর রাজস্ব দেওনার্থ রাইয়তেরদের প্রতি হুকুম করিলেন কিন্তু হুগলি জিলার মধ্যে ঐ জমীদারীর কিঞ্চিৎ অংশ থাকা প্রযুক্ত আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির পিতা মহারাজ তেজশ্চন্দ্র ঐ জিলার জজ শ্রীযুত ওকলি সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিয়া আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির জমীদারীতে আপনাকে দখল দেওয়াইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন এবং ঐ শ্রীযুক্ত সাহেব সরাসরী মতে ডিক্রী করিয়া আপন এলাকার মধ্যে আমারদের যে ভূম্যধিকার ছিল তাহাতে আমারদিগকে বেদখল করিলেন কিন্তু ইহা সরকারী তাবৎ কাগজপত্র ও বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরদের হুকুমের নিতান্ত বিপরীত।

শ্রীযুত ওকলি সাহেবের এই বিষয়ে সরাসরী ডিক্রীর তারিখ ১৮২১ সালের ৩০ আপ্রেল। এবং তাহার মূল এই যে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র আপনার চারিজন ভৃত্য ও অধীন ব্যক্তিরদের দ্বারা এই সাক্ষ্য দেওয়াইলেন যে আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামী কেবল নাম মাত্র অধিকারী ছিলেন জমীদারীতে তাঁহার দখল ছিল না যদ্যপি এই প্রকার ব্যক্তিরদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হয় না কেন না তাঁহারা আপনার মুনীবের পক্ষ এবং ঐ মুনীবের অধীনে ২ লক্ষ আছে এবং যাঁহারা তাঁহার ইষ্ট সাধনার্থ সাহায্য করেন তাঁহারদিগকে ঐ টাকা দিতে স্বচ্ছন্দে পারেন তথাপি ঐ শ্রীযুক্ত সাহেব এমত সাক্ষির সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া আমারদের পক্ষে অতি প্রামাণিক যে সকল দলীল দস্তাবেজ উপস্থিত করা গেল অথচ তাহা গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মকারকেরদের দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছিল তাহা স্বচ্ছন্দে হেয় জ্ঞান করিলেন।

পরে হুগলির সরাসরী ডিক্রীর কোর্ট আপীলে আপীল করিলে আমারদের দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সাহেব লোকেরা আমারদের প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়া আর কিছু তজবীজ না করিয়া ওকলি সাহেবের নিষ্পত্তিই বজায় রাখিলেন। কিন্তু বর্দ্ধমানের জজ পরম বিজ্ঞ অথচ এতদ্দেশীয় ব্যবহার ও ভাষাতে অত্যন্ত নিপুণ এবং তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্র কর্তৃক নিষ্কলঙ্করূপে স্বীকৃত এমত শ্রীযুক্ত হচিনসন সাহেবের এলাকার মধ্যে যে জমীদারী ছিল তদ্বিষয়ে তাঁহার যখন বিবেচনা করিতে হইল তখন তিনি বোর্ডের সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে এই ডিক্রী করিলেন যে আমরা মৃত ব্যক্তির বিধবা তাঁহার

উত্তরাধিকারিণী হইয়া ঐ রাজার তাবৎ জমীদারীতে স্বত্ব রাখি এবং আমারদের স্বামির মরণ সময়ে তিনি ঐ জমীদারীর প্রকৃতাধিকারী ও দখলীকার ছিলেন ইহা বিলক্ষণরূপে প্রমাণ হইয়াছে। কিন্তু কোর্ট আপীলের সাহেবেরা হুগলির জজ সাহেবের অর্পিত মোকদ্দমাতে যে ডিক্রী করিয়াছিলেন তদনুসারে ঐ শ্রীযুত হর্চিনসন সাহেবের ডিক্রীও অন্যথা করিলেন এতদ্রূপে এই মোকদ্দমার প্রায় কিছুমাত্র বিবেচনা না করণেতে যে জমিদারীতে গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক বিংশতি লক্ষ টাকা রাজস্ব দেওয়া যায় এমত জমিদারী হইতে আমরা বেদখল হইলাম বিশেষতঃ আমারদের নিজ জমিদারী গঙ্গামনোহরপুর আমরা নিজে ক্রয় করিয়াছিলাম এবং আমারদের নামে সরকারী বহীতে রেজিষ্টরীও হইয়াছিল এবং যে প্রকারে জমীদারী জমীদারের পক্ষে দৃঢ় হইতে পারে সেই প্রকারে আমাদের পক্ষে দৃঢ়তর হইলে পরও তাহা ঐ সরাসরী ডিক্রীক্রমে আমারদের হাতছাড়া হইল। জাবেতামতে এই বিষয়ে আমারদের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা না হইয়াও স্দ্ধ ওকলি সাহেবের আজ্ঞাক্রমে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র সরকারী বহী হইতে আমারদের নাম উঠাইয়া আপনার নাম লেখাইয়া লইলেন এবং ওকলি সাহেবের এই ব্যাপার আপীল আদালতে সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্থ হইলে তাহাতে আমারদের খেদ ও আশ্চর্য্য বোধ হইল।

আমারদের স্বামির মৃত্যুর পর দিবস পূর্ব্বাহ্নে আমরা যখন শোকার্ণবে মগ্না ছিলাম তখন আমারদের শ্বশুর মহারাজ তেজশ্চন্দ্র আমারদিগকে অত্যন্ত দুঃখিনী ও অনাথা দেখিয়া আপনি ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিয়া আমারদের অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক আমারদের যাবৎ আভরণ ও যে বহুমূল্য সম্পত্তি ছিল সমুদায় কাড়িয়া লইলেন এবং আমারদের স্বামী যে নিজ প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন তাহা সম্পূর্ণরূপে লুঠ করত যে সকল লওয়াজিমা ও নগদ যাহা পাইলেন তাবৎ লইয়া গেলেন এবং কাগজপত্র বাহিরে যে সকল বিষয় ছিল তাহা আপনার চাবিতে বন্দ করিয়া গেলেন। তৎ সমকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের শ্যালক প্রাণচন্দ্র বাবু তাঁহার সঙ্গে যোগ করিয়া বাটীর অন্যান্য স্থানে যে সকল জহরাৎ ও প্রকারান্তর বহুমূল্য দ্রব্য যাহা পাইলেন তাহা আমারদের অসম্মতিতেই বিক্রয় করিয়া লইলেন এবং এই সকল অত্যাচার ব্যাপার আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির ইউরোপীয় কর্ম্মকারক ক্লারমণ্ড ও ফরনেণ্ড সাহেব স্বচক্ষে দেখিলেন এই সকল দৌরাত্ম্য হইলে পরে আমরা মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিস করিলাম কিন্তু তিনি তাহা গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলেন আমারদের নিতান্ত ভরসা ছিল যে সরকারী কর্ম্মকারকেরা দুঃখিনী অনাথা বিধবারদিগকে এতদ্রূপ অত্যাচার ও নির্দয় ব্যাপার হইতে রক্ষা করিবেন। আমারদের শ্বশুর এতদ্রূপে আমারদিগকে তাবৎ স্থাবরাস্থাবর বিষয় হইতে বেদখল করাতে আমরা যে কেবল যথার্থ বিচারপ্রাপণে অক্ষম হইলাম এমত নহে কিন্তু আমারদিগের এমত নিঃস্ব করিলেন যে আত্মীয় কুটুম্বের দানদ্বারা আমারদের জীবন ধারণ করিতে হইল আমরা এতদ্রূপে দুর্দশাপন্না হইয়া আমারদের মৃত স্বামী যে টাকা শ্রীযুত পামর কোং ও শ্রীযুত কাল্‌বিন কোং ও শ্রীযুত প্লৌডন কোম্পানিকে কর্জ দিয়াছিলেন তাহা আমারদের প্রাণ ধারণার্থ দাওয়া করিলাম

কিন্তু আমারদের শ্বশুর মহারাজা তেজচন্দ্র আমারদের অন্যান্য তাবৎ সম্পত্তি হরণ করত আমারদিগকে দুঃখ শোকার্ণবে মগ্ন করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া ঐ সকল টাকাই কাড়িয়া লইতে উদ্যোগ করিলেন তাহা হইলে আমরা একেবারে সম্পূর্ণরূপে উপায়হীনা হই এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থ তিনি কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টে নালিস করিলেন অভিপ্রায় এই যে ঐ স্থান হইতে বিলাত আপীল করিতে পারিবেন তিনি বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন যে আমারদের ন্যায় দীন ব্যক্তিরা এতদ্রূপ মোকদ্দমার খরচ যোগাইয়া উঠিতে পারিবে না। তাহাতে এই ফল হইলে আমারদের যে মিত্রেরা কেবল দয়া করিয়া আমারদের সাহায্য করিতে উদ্যুক্ত ছিলেন তাঁহারা দেখিলেন যে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে আমারদের উপর অশেষ লেঠা পড়িবে এবং এই নিরাশ বিষয়ে আমরা অশেষ খরচের ভার সহিষ্ণুতা করিতে পারিব না শেষে এই বোধে ক্ষান্ত হইলেন অতএব এতদ্রূপে আমারদের যথার্থবিচার প্রাপণের যে ভরসা ছিল তাহা দূরগত হইল— আনন্দকুমারী ও প্যারিকুমারীর মোহর বর্দ্ধমান ২১ জুন ১৮২৪।

পরিশিষ্ট—২

মহারাজা তেজচন্দ্রের পরলোকগমন

বর্দ্ধমানের নৃপতির লোকান্তর।—বর্দ্ধমানের ভূম্যধিকারি মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর প্রায় সত্তরি বৎসরবয়স্ক হইয়া ১২৩৯ সালের ২ ভাদ্র বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর চারি দণ্ডকালে পরলোকগমন করিয়াছেন মৃত্যুর তিন চারি দিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া পরিবারসহিত অম্বিকার রাজবাটীতে গমন করিয়াছিলেন তিন দিবস গঙ্গাবাসান্তে পরলোক হয় মহারাজের লোকান্তর হইবার তিন চারি মাস অগ্রে তাঁহার উরুদেশে এক বৃহৎ ক্ষত হইয়াছিল এবং মাসাবধি স্বল্প জ্বরও হইত আর আমাশয়ের ব্যামোহও ছিল মহারাজ আপন চিকিৎসা করাইতে কোনকালেই ব্যগ্র হন নাই কলিকাতা হইতে চিকিৎসাজন্য শ্রীযুত ডাক্তর গ্রাণ্ট সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর গ্রেহম সাহেব এবং শ্রীযুত ডাক্তর জেক্‌সন সাহেব বর্দ্ধমানে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু নিয়মমতে চিকিৎসা কাহার দ্বারা হয় নাই মহারাজের ঔরসজাত সন্তান সন্ততি নাই মহারাজের প্রথম পুত্র মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর ১২২৭ সালের পৌষ মাসে উক্ত অম্বিকার রাজবাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন যদিও তৎকালে তাঁহার উনত্রিশ বৎসর কএক মাস বয়ঃক্রম হইয়াছিল যথার্থ বটে কিন্তু তাঁহার পুত্রাদি কেহ থাকেন নাই তাঁহার কেবল দুই রাণী আছেন এবং তাঁহারা এপর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের রাজবাটীমধ্যে মাসিক বেতনগ্রহণে কালহরণ করিতেছেন যদিও মহারাজ আপন প্রধান পুত্রের

দেহত্যাগপরে মহারাণী উজ্জ্বলকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে দুই কি তিন সন্তান জন্মিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা সকলে অত্যল্প দিনেই পঞ্চত্ব পাইয়াছেন বরং তাঁহারদের জননীও লোকান্তরপ্রাপ্তা হইয়াছেন। অতঃপরে মহারাজ শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারীকে বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতাকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলেন এবং সেই দত্তকপুত্রের শ্রীযুত কুমার মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর নামকরণ হইল কিন্তু মহারাণী বসন্তকুমারীর গর্ভেও সন্তান সন্ততি হইলেন না।

এক্ষণে তাঁহার রাণীর মধ্যে কেবল প্রধান রাণী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কমলকুমারী এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারী জীবদ্দশায় আছেন কুমার মহাতাপচন্দ্র বাহাদুরের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দশ বৎসর হইবেক তিনি এক্ষণে পাঠশালায় আছেন যখন মহারাজ তাঁহাকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এইরূপ সঙ্কল্প ছিল যে শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারীর গর্ভে সন্তান জন্মিলে ইনি কতক মুদ্রা এবং জমীদারীর মধ্যে কেবল এক লাট প্রাপ্ত হইবেন নচেৎ ইঁহারই সমুদয় হইবেক।

আমরা সামান্যতঃ শুনিয়াছি যে মহারাজের অত্যন্ত ব্যামোহ হওয়া পর্য্যন্ত কোন উইল করেন নাই অথচ তাহা কর্ত্তব্য ছিল এইনিমিত্ত তথাকার শ্রীযুত জজসাহেব ইহার বৃত্তান্ত কৌন্সেলে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন সেখানকার মেম্বরেরদের অনুমতি হইবাতে উইলদ্বারা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কমলকুমারী তাঁহার ওসী অর্থাৎ নিয়ামক এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু সরবরাহকার অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।—কৌমুদী (১ সেপ্টেম্বর ১৮৩২)।

পরিশিষ্ট—৩

কারামুক্তির পর

শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর।—শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—শ্রীযুত মহারাজের হুগলির কারামুক্তি অবধি কলিকাতাতে আগমন-পর্য্যন্ত বার্ত্তা আমি গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি অতএব তাহার পরের সম্বাদ এইক্ষণে পাঠকবর্গের গোচর করি প্রতিবৎসর বারুণীয় সময়ে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথকে দর্শনার্থ লোকেরদের যেরূপ মেলা হইয়া থাকে এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা বিশিষ্টরূপ জানেন অতএব দৃষ্টান্ত স্বরূপ কহিতেছি শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুরকে দর্শনার্থ কলিকাতাবাসি ধনাঢ্য শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ বসাক মহাশয়ের বাটীতেও প্রতি দিবস সেইরূপ মেলা আরম্ভ হইয়াছে।…

শোভাবাজারনিবাসি অতিবিখ্যাত চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীযুত কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রথম সন্দর্শনেতেই শ্রীযুত রাজা বাহাদুরকে চিনিতে পারিয়া

বিস্তর খেদ প্রকাশ করিলেন এবং শ্রীযুত গঙ্গানারায়ণ লস্কর যিনি পাঁচালি গান দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে বিখ্যাত ঐ ব্যক্তি আসিবামাত্রই শ্রীযুত মহারাজ কহিলেন কহ লস্কর তুমি যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থূলকায় হইয়াছ তাহাতে লস্করবাবু মহাপুরুষকে শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর জানিয়া পূর্ব্বরীত্যনুসারে উত্তর করিলেন।...জ্ঞানান্বেষণ (১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৭)।

পরিশিষ্ট—৪

সাধারণের ধারণা

শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর।—শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—এইক্ষণে কলিকাতার মধ্যে মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের প্রসঙ্গই সর্ব্ব শুনা যাইতেছে…। ত্রিবেণী নিবাসি অতি বিখ্যাত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রপৌত্র শ্রীযুত হরদেব তর্কলঙ্কার প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা শ্রীযুতের নিকট পূর্ব্বে দান-গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারদিগের একেবারে বিশ্বাস হইয়াছেন অপর চন্দ্রিকা সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় পত্রে লিখিয়াছেন আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া নিঃশব্দে পাঠকবর্গের সন্দেহভঞ্জনার্থ শ্রীযুত মহারাজাধিরাজের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি পাঠকবর্গের স্মরণে আছে রাজাধিরাজের আগমনাবধি আমরা মধ্যে২ সংবাদ প্রকাশ করিয়া থাকি কিন্তু গত তাবৎকাগজে সন্দিগ্ধ রাজা বলিয়া লিখিয়াছি তাহার কারণ আমারদিগের সন্দেহ দূর হয় নাই এইক্ষণে সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে ঐ সম্পাদক মহাশয় বিশ্বাসের কারণ এই কহেন শ্রীযুত বাবু দেবনারায়ণ দেবের সাক্ষাতে শ্রীযুত মহারাজকে কম্পটন সাহেবের বাগান ক্রয় এবং বিচর সাহেবের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার ছিল এই সকল জিজ্ঞাসা করিবাতে মহারাজ উত্তর করিলেন কম্পটন সাহেবের বাগান ক্রয় করণার্থ দেখিতে গিয়াছিলেন আর সওদাগর বিচর সাহেব তাঁহার নিকট এক লক্ষ টাকা ধার করেন এবং যে সাহেব তাহাতে জামীন ছিলেন তিনি একজন প্রধান কর্ম্মকারক তাঁহার নামও কহিলেন।

এতদ্দেশীয় প্রাচীন লোকেরা এই সম্বাদশ্রবণে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে পারেন শ্রীযুত বিরূপাক্ষ ভট্টাচার্য্য যিনি গণনাতে লোকেরদের বিশ্বাস্য এবং অনেকে বিশ্বাস করেন তিনি দৈবীশক্তিতেই ভুতভবিষ্যদ্বিগণ কহিতে পারেন ঐ ভট্টাচার্য্য আসিয়া বহুলোকের সাক্ষাতে গমনপূর্ব্বক কহিলেন আমি সাহস করিয়া বলিতেছি এই মহাশয় মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের পুত্র শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর বর্দ্ধমান রাজ্যাধিকার অবশ্য প্রাপ্ত হইবেন যদি একথা মিথ্যা হয় তবে শাস্ত্র এবং আমার ব্রহ্মণ্যদেব মিথ্যা হইবেই। নারদ।—জ্ঞানান্বেষণ (৪ঠা মার্চ, ১৮৩৮)।

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—স্বয়ং রাজা প্রতাপচন্দ্র বলিয়া যে ব্যক্তি পতাকা উড্ডীয়মান করত কলিকাতার মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন তিনি রাজা প্রতাপ-চন্দ্র কি না আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না। কিন্তু নিজ রাজবাটীর প্রাচীন লোকের বাক্য প্রমাণে বোধ হইতেছে মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের মরণ ব্যাপার অত্যাশ্চর্য্য বটে তাহার বিস্তারিত এই যে অম্বিকা গমনের চারি দিবস পূর্ব্বে তাহার জ্বর হয় তাহাতে বারদ্বারিতেই থাকেন ঐ পীড়া শান্ত্যর্থ রাজ কবিরাজেরা অনেকে অনেক প্রকার ঔষধ দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি ঔষধের মধ্যে তাজা বিষ দেন কিন্তু মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের অতি প্রিয়পাত্র এবং বৈদ্য পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন মহারাজকে তাজা বিষ ভক্ষণ করাইবেন। অতএব ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সাক্ষাতে আনিবামাত্র প্রিয়পাত্র কবিরাজ মহারাজকে চক্ষু ঠারিয়া নিষেধ করিলেন। এই প্রকার উদ্যোগ তিন চার বার হয় এবং বৃদ্ধ মহারাজ সাক্ষাতে বসিয়া ভক্ষণার্থ উপরোধ করেন তাহার কারণ এই যে গোপনীয় বিষ প্রয়োগের ব্যাপার বৃদ্ধ মহারাজের গোচর ছিল না। কিন্তু যুবরাজ কদাচ সে ঔষধ গ্রহণ করিলেন না এবং এক হস্তীর উপর ডঙ্কা অন্য হস্তীতে আম্বারি বসাইতে হুকুম দিয়া তৎক্ষণাৎ গঙ্গাযাত্রা করিলেন।

গঙ্গাযাত্রার প্রসঙ্গ শুনিয়া শ্রীমতী ছোট বধূরাণী যুবরাজকে স্বীয় মহলে আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন তাহাতে যুবরাজ উত্তর করিলেন তাঁহার মহলে গেলেও আমার প্রাণ রক্ষা হইবেক না। অতএব ছোট রাণী যদি আমার সহিত গমন করিতে পারেন তবে আসুন নতুবা সময়ান্তরে যদি ভগবান করেন তবে সাক্ষাৎ হইবে এই গঙ্গাযাত্রা কালে ন্যূনাধিক সহস্র লোক নবীনবাগে একত্র হইয়াছিল। এবং বোধ করি পরাণচন্দ্রবাবুও এ কথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে প্রতাপচন্দ্র মহারাজ স্বাভাবিক রূপে বারদ্বারি হইতে নামিয়া হস্ত্যারোহণ পূর্ব্বক অম্বিকাতে গমন করিয়াছিলেন।

রাজা অম্বিকাতে গিয়া পাঁচ দিবস ছিলেন তাহার পরে কেহ বলে মরিয়াছেন কেহ বলে জলে অদৃষ্ট হইয়াছেন কিন্তু মরণ বা অদর্শন যাহা হউক শ্রীযুত বসন্তলালবাবু নিশ্চয় বলিতে পারেন। কেননা তৎকালে তিনি ও ব্রহ্মানন্দ গোস্বামী ও ঘাসী পুরোহিত এই তিন ব্যক্তি নিকট ছিলেন বৃদ্ধ মহারাজও অম্বিকায় যাইতেছিলেন কিন্তু পথের মধ্যেই শুনিলেন রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইল। অতএব সেই স্থান হইতে ফিরে গেলেন এবং রাজবাটীতে গিয়া বধূরাণীদিগের হস্তে যে সকল চাবি ছিল তাহা লইয়া কহিলেন যুবরাজ মরিয়াছেন।

তাহার পরে রাজবাটীর যেরূপ ব্যবহার আছে পরিবারের মধ্যে কেহ মরিলে স্ত্রী-লোকেরা একত্র বসিয়া নিয়মিত কয়েক দিন বক্ষস্থলে করাঘাত করেন সেই ব্যাপার

আরম্ভ হইল। রাজার মরণ বিষয়ে আর কেহ আন্দোলন করেন নাই এখন পতাকা-চিহ্নিত অনিশ্চিত রাজার আগমনেতে এই সকল বিষয় উত্থাপন হইতেছে। এবং ইহাও ব্যক্ত আছে যুবরাজের মরণের পর এক দিবস বাবু বাহির সর্ব্বমঙ্গলা পুষ্করিণীতে স্নানার্থ গমন করিয়াছিলেন কিন্তু চতুর্দ্দিগে লোকের করতালিধ্বনিতে পাল্কীর কপাট দিয়া সত্বর আসিতে হইয়াছিল যাহা হউক ফলে নিশানধারি ব্যক্তি বর্দ্ধমানে গেলে সাধারণ লোক দ্বারা অনেক সাহায্য পাইবেন। এবং রাজবাটীস্থ প্রাচীন লোকেরাও তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে পারেন আমার বোধ হয় অনিশ্চিত প্রতাপচন্দ্র প্রতাপচন্দ্রের মরণাবধারণার্থ যদি বর্দ্ধমানের হাকিমের নিকট সাক্ষ্য প্রমাণের আবেদন করেন তবে এ বিষয়ের অনেক আন্দোলন হইবেক এবং মরণের কারণ গুপ্তাভিপ্রায় সকলই ব্যক্ত করিতে পারিবেন। ভ্রমণকারিণঃ (১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩৮)।

(পরিশিষ্ট ১-৫, সংবাদপত্রে সেকালের কথা হইতে উদ্ধৃত)

পরিশিষ্ট—৬

সঞ্জীবচন্দ্র বর্ধমানের রাজবাড়ির প্রবীণ কর্মচারীদের কাছে যে সব লিখিত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, সেই চিঠিগুলি এখানে উদ্ধৃত হল—,

১

Burdwan
(from Rajbattee)

My dear Sunjeeb Babu,

পরাণবাবুর পিতা নিজ কন্যাকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছিলেন তেজ-চন্দ্র বাহাদুর তাহাকে দেখিয়া বিবাহ করেন অর্থাৎ তেজচন্দ্র বাহাদুর পরাণবাবুর ভগ্নীকে, তাহার পর তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। পরাণবাবুর পিতা লাহোরে থাকিতেন ও তাঁহার অবস্থা সামান্য ছিল। পরাণবাবু ১২৫০ কিম্বা ৫১ সালে মরেন। প্রতাপচন্দ্র বড় দুষ্ট ছিলেন। সাহেবদিগকে বড় ঠেঙ্গাইতে উদ্যত থাকিতেন। ঐ নিমিত্ত তাঁহার নামে পরওয়ানা বাহির হয়, কিম্বদন্তি আছে।

আপনি এই সংবাদ লইয়া কি করিবেন লিখিলেন। যদি বর্ধমান রাজের পুরাবৃত্ত লিখিবার মানস থাকে সবিশেষ লিখিবেন। জগবন্ধু ও আমার আর এই বন্ধু এই সংবাদ দিতে ভার লইয়াছেন।

Yours
....

২

...জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া তিনি তাঁহার দৈনিক কার্যের বিবরণ লিখিয়া রাখিতেন। সেই বহি জাল রাজার মোকদ্দমার সময়ে আদালতে দাখিল হইয়াছিল। তদবধি সেই পুস্তকের নিদর্শন পাওয়া যায় না। এখানকার অনেক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বিশ্বাস যে জাল রাজাই প্রকৃত প্রতাপচন্দ্র। গদাধর তেওয়ারী মহাশয়ের এই সংস্কার ছিল, শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, শ্যামচাঁদবাবু নামে একজন প্রতাপচন্দ্রের পারিষদ ছিল। সে ব্যক্তির সহিত পরাণবাবুর মনান্তর ছিল। সে পরাণবাবুকে নিরাশ করিবার অভিপ্রায়ে প্রতাপচন্দ্রের আকৃতিগত এক ব্যক্তিকে দাঁড় করাইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল। জাল প্রতাপচন্দ্র রাজ্যের সমুদয়, বিশেষ অন্য অন্য কারণে সন্ধান ও রাজপুরবাসিগণের ও নগরের সমুদয় বিষয় উক্ত শ্যামচাঁদবাবুর নিকট জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ঐ শ্যামচাঁদবাবু একজন বর্ধমান নিবাসী। তাঁহার পুত্র মদনবাবু রাসুবাবুর একজন শ্বশুর ছিলেন।

প্রকৃত প্রতাপচন্দ্রের অন্তর্ধানের বিবরণ—

যাহারা জাল প্রতাপচন্দ্র কহে, তাহারা বলে যে প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে ও তাঁহার শবদাহ করিয়াছে।

অপর দলে বলে, প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু প্রকৃত ঘটনা নহে। একদিবস তিনি তাঁহার বিমাতার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা উপবিষ্ট হইয়া দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস জন্য নিরুদ্দেশ হন। তিনি পীড়ার ছলনা করিয়া কালনায় গঙ্গাতীরে যান ও তথায় কানাত ঘেরাইয়া তন্মধ্য হইতে গঙ্গার জলে স্নান ও ডুব দিয়া প্রস্থান করেন। তৎপর একটি খালি কাষ্ঠের সিন্দুক প্রতাপচন্দ্রের শব বলিয়া দগ্ধ করা হয়। তিনি ১২ বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়া পুনরায় বর্ধমানে আসেন এবং জাল প্রতাপচন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। নৈহাটী নিবাসী শ্রীতারকচন্দ্র বসুর পিতামহ রামচাঁদ বসু সন্ন্যাসী হইয়া কিছুকাল দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন। তাঁহার সহিত প্রতাপচন্দ্রের সাক্ষাৎ ও প্রণয় হইয়াছিল। মোকদ্দমার সময়ে প্রতাপচন্দ্র তাঁহাকে সাক্ষ্য দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন।—বর্ধমান, ২০ জুলাই ৮২

(illegible)

Yours affly.

৩

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সঞ্জীবচন্দ্রকে লিখিত পত্র,—

July 8, 1883

My dear Sunjib Babu,

I have read your very interesting account of Jal Protapchand with pleasure. It contains a good deal of information which is

entirely new to me. As illustrative of the judicial procedure of the age-more than a hundred people clapped into jail without rhyme or reason the book has a peculiar value independently of its other merits.

Please send me 10 copies of the book by value payable packet post. I will sell some and distribute a copy or two gratis. The book ought to command a good sale. One of my friends here, Babu Rasik Behari Biswas has written an article on my request on the second seige of Saragopa.

I don't know if he has sent you the article. If he has not I will give him a takeed. I see only on mistake in your book, Mr. Overbeck was the Dutch Governor of Chinsurah—not the Danish Governor. Chinsurah was never a Danish settlement.

I was laid up with fever for more than a week. I am still weak.

Yours affectionately,
Taraprosad Chatterjee

উপরোক্ত পত্র তিনখানি গোপালচন্দ্র রায়ের 'সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাততথ্য' (পৃষ্ঠা-১০৩-৪ ও ১০৮) গ্রন্থ হতে লেখকের অনুমতিক্রমে ছাপা হল।

পরিশিষ্ট—৭

PETITION

AT A COURT OF NIZAMUT ADAWLUT, HELD AT THE PRESIDENCY, UNDER DATE THE 1ST JULY 1839.

Present—W. BRADDON, and C. TUCKER,
Esqrs., Judges.

Read a petition presented by Aluk Shah, alias Portaup Chunder, alias Kisto Lall Pauree Bruhmacharee, praying that Court will review or set aside, or suspend, so much of their sentence of the 13th ultimo, as relates to the question of the petitioner's identity,

and to grant a new or further trial of so much of the said charge, as relates to the said questition, upon the grounds set forth in his petition, which are briefly as follow :—

1st. That the conviction of this Court debars the petitioner from prosecuting in the Civil Court for the recovery of his rights.

2ndly. That on the point of identity the petitioner has had nothing approaching to a fair, complete, and satisfactory trial, in as much as a variety of heterogenous charges having been preferred against him, his advisers were distracted by their number, and devoted their attention to such part of them only as appeared to involve criminality. That his legal advisers, not conceiving that the charge of personation could ever amount to a tangible crime : confined themselves to adducing just so much evidence as was sufficient to throw a doubt upon the question of identity, reserving the most material evidence on that point, until the contemplated civil trial should take place. And further, in as much as several witnesses, for the attendance of whom application was duly made to the Magistrate, were not produced, because the perwannahs issued containted no penalty for non-attendance, nor was any process of Court issued to enforce their attendance, within that of witnesses for the prosecution, were enforoed by attachment and seizuro of their property.

2. On the first point the Court do not consider it necessary to enter into any discussion as to whether the petitioner's statement be correct in law or not. They observe that the fact established against the petitioner, having been declared to involve an offence punishable under the law which they are required in administor, the Court could not proceed to pass upon him a sentence of acquittal, merely because a finding of an opposite character might effect his civil claims.

3. On the second point ; the Court find on the record of the trial before the Sessions Judge, in a long and abored written defence, filed on 27th December, 1838, the following sentenc, "I should only say on this subject, (the charge of personation) that so

satisfied were my legal advisers of the small chance which I had of obtaining justice in the Magistrate's Court, that they advised me to reserve my defence for this Court. Hear I mean to set it up. Here I mean to show, by clear and undoubted testimony, that I am no impostor, but in truth and verity, the zemeendar of Burdwan." This sentence would seem to disprove the assertion, supposing it to be one entitled to consideration, that the petitioner considered the charge of personation to be of no moment, and voluntarily abstained from opposing the evidence adduced on the part of the prosecution in support of it. The Court cannot for a moment suppose, that the petitioner's advisers were not fully aware of the importance of rebutting this part of the charge, if possible ; indeed it was urged, on the part of the petitioner, that unless the charge of personation could have been established, the whole of the charges fell to the ground, as every other part of them is set forth as done in furtherance thereof. This is stated by the petitioner in the same defence, in the very outest of which he says, "the only charge that the malice of my enemies, and the ingenuity of the Government Officer, the Magistrate of Hooghly, have been able to bring against me, amounts to nothing more, if made out, than a misdemeaanor, while it is not attempted to be concealed, that this charge, brought and supported by the official influence and *extra official* labours of the Government Functionary, the Magistrate of Hooghly, was merely intended to be subsidiary to that which has all along been admitted to be the chief object of ths prosecution, viz., to try in this criminal proceeding a mere civil right, in fact, to prove that I had no right to the Guddie of of Burdwan.

4. Again, with regard to the witnesses summoned by the petitioner, the Court find the following circumstances recorded on the proceedings of the Sessions Judge.

1st. An application from the petitioner filed 5th December, 1838, consenting to withdrow a previous application for the attendance of nine Europeon gentlemen witnesses.

2dly. Two applications filed 21st and 29th, December, 1838, requesting the Court to suspend proceedings for a few days, to give his counsel time to consult and dicide whether it would or would not be necessary, to call all the witnesses cited to prove the petitioners identity, as he was in hopes, that after such consultation he would be enabled to dispense with the attendance of many of his witnesses.

3d. An application to the Sessions Court, filed 3rd January, 1839, stating his readiness to go into the whole ease of his identity, and produce the whole of the evidence in support thereof, provided he was assured, that in the event of his proving himself to be the veritable Rajah Pertaub Chund, the Government would acknowledge him as such, and put him in possession of the honors and rights appertaining to the Rajah of Burdwan. If not, he will not bring forward the whole of his evidence, but confine himself to the examination of only a few more witnesses on the question of identity.

4th. An application to the Sessions Court, filed 5th January, 1839, setting forth, amongst other things. "That your petitioner has now selected, from the very large number of witnesses subpoenaed for the defence, the names of several Europeans. as well as Natives of credit and respectability; that these winesses have given their depositions on oath in your Court, and have declared their full conviction of my identity, as the true Rajah Pertaub Chund." The petitioner goes on to state, that be had many more witnesses who would depose to the same effect, but that he was "unwilling to occupy the time of the Court to an almost indefinite period." In conclusion, the petitioner declines enforcing the attendance of the Ranness and Prawn Baboo.

5th. An application to the Session Court, filed 11th January, 1839, soliciting the early judgment of the Court, notwithstanding the absance of several witnesses, as he had not the means of compelling their attendance.

5. With reference to the foregoing remarks, it is clear to the

Court, that the petitioner not only knew in what consisted the strength of the charges against him, but that he prepared himself to meet, and further, that he himself on 11th January, 1839, called for the judgment of the Court.

6. The Court further observe, that since the trial was removed to this Court, the petitioner presented two petitions to the Court, one on the 8th March, the other on the 18th April last, the burthen of which is to deprecate delay and urge the Court to an early decision ; in neither of these, nor in a long statement, field on the 26th of April last, did the petitioner urge any further enquiry on the plea of insufficient investigation as to his identity in the Lower Court.

7. The Court consider, that on the petitioner's own showing, there are no grounds for a new trial ; in addition to which they are satisfied of the fact of the death of the late Rajah Pertaub Chunder and the burning of his body, as established by the evidence on the trial. They, therefore, see no grounds whatever for complying with the petitioner's application for a new trial, which is ordered to be rejected accordingly.

(Compared)
R. Stuart.

(True copy)
J. Hawkins.
Registrar.

পরিশিষ্ট—৮

RESOLUTION OF THE PRESIDENCY COURT OF NIZAMUT ADAWLUT.

Dated the 19th July, 1839.

Present—W. Braddon and C. Tucker, Esqrs., Judges.

Read a petition dated the 18th instant, presented by Aluck Shah, alias Pertaub Chund, alias Kisto Lall Bramacharee, praying

that he may be informed of the law and authority under which his case was referred to this Court, and under which he was convicted and sentenced.

The Court observe, that any objections the petitioner had to urge to the trial and sentence, on the point of legality or otherwise, should have been stated in his application for a new trial, and that as the proceedings in the case have been finally closed by the rejection of that application, they order that the present petition be rejected.

The Court further remark, that as they have judicially pronounced the petitioner not to be Maharajah Pertaub Chund, they cannot in future receive any petitions or applications from him under that name and title.

(Compared)
H. STUART.

(True Copy)
J. HAWKINS.
Registrar.

পরিশিষ্ট—৯

TO THE HON'BLE THE JUDGES OF THE NIZAMUT ADAWLUT

The humble Petition of
Maha Rajah Deeraj Pertab
Chund Bahadoor.

Shcweth—That the Futwa of the Law Officer of the Nizamut Adawlut in this case, having declared, that false personation for one's own advantage is an offence under the Mahomedan law, your Petitioner has made enquiry amongst those learned in the Mahomed law, for the authority on which the Law Officer of this Hon'ble Court has declared such to be an offence under the Mahomedan Law, but your Petitioner has been informed by those

from whom he has made such enquiry, that they are unable to find any authority to that effect.

That your Petitioner is desirous of being informed in what book, and by what Mahomedan Lawyer, or on what authority, the Futwa of the Law Officer is founded.

That your Petitioner is desirous of being informed, under what Order or Regulation the proceedings in this case were referred to this Court by the Judge of Hooghly.

That your Petitioner is desirous of being informed, under what rule or regulation your Petitioner was fined 1000 rupees by this Court.

Your Petitioner prays, that this Hon'ble Court will issue an order that the said Law Officer do state the authority whereon he has made such Futwa, and that your petitioner may be furnished with the number and date of the regulation or order under which this cause was referred to this Court, and under which your Petitioner was fined as aforesaid.

And your Petitioner shall ever pray, & c.

পরিশিষ্ট—১০

To the Editor of the Bengal Hurhkaru.

Sir—Although I have no doubt that your readers and the public generally, are really tired of the case of the claimant to the Burdwan Raj, I trust that there are many who take an interest in seeing the mode in which Justice is administered, as well in the Supreme Court, as in the Courts of the Hon'ble Company. Under the impression that there are many who do so, I take the liberty of forwarding to you for publication, in case you consider the documents of sufficient public interest, an order made by the Nizamut Adawlut, on a petition presented by me on behalf of my client for a new trial, an application made by me for the

authority on which the Law Officer of that Court gave his Futwa, and for the particulars of the Regulation under which the case was refered to the Nizamut by the Judge of Hooghly, and under which my client was fined 1,000 rupees.

As you have published the petition for a new trial, I need not say that the Nizamut Adawlut, in their order of the 1st of July, have *misstated* the grounds on which that application was made. I must presume that this has been done unintentionally; I think it, how ever, right to state, that the Judges of that Court have, unintentionally I must presume, misrepresented the defence, and the other petitions of my client from which they have been pleased to quote, with the evident intention of supporting the line of argument which they have adopted to support their determination to refuse to my client a new trial. They have quoted *parts* of a sentence favorable to their view of the case, and they have omitted those parts of that sentence that were favorable to my client. This shews *impartiality* at least!

But it is not to that circumstance that I am desirous to draw public attention, On referring to the order of 1st July, you will find that the Judges say, that there are *no grounds* for a new trial. In April last I presented a petition to the Nizamut, containing a few charges against the officers who conducted the trial at Hooghly, and an *offer* was made in that petition, to *prove* these charges to be true. Of that offer no notice has been taken, and with these charges filed in their Court. and, so far as I know, uncontradicted, the Judges of the Nizamut have decided against my client, and they have refused to him a new trial. I do not pretend to know what are considered sufficient grounds to support an application to a Company's Court for a new trial; but it was offerd to be proved, that during the trial at Hooghly he was a close prisoner in Jail, and was denied free communication with his legal advisers. That he was refused to be held to bail to any amount, by the Magistrate and the Judge of Hooghly, and by the Nizamut Adawlut. That he had spies put upon him, whilst in jail, by the Magistrate of Hooghly. That his

mooktears and servants were confined in Jail. That many of them died there from ill usage, and want of clothing, and sustenance. That some of his witnesses were, by the orders of the Magistrate. sanctioned by the Judge, detained by the Government servants in their custody ; and that his legal advisers were denied access to them, save in the presence of Government Officers. That an order was issued by Mr. Samuells, to prevent him seeing his Vakeels in Jail, save in the presence of a man whom he appointed for the purpose of overhearing, and communicating to him all that passed. That the Judge, who was trying the prisoner in the Sessions Court, the Magistrate who was prosecuting him there, and the gentleman who was conducting the prosecution, were, when out of Court, in constant communication together. That the Judge applied to the Government Prosecutor, behind the prisoner's back, to furnish him with an authority from English Law Books, with the intention of using the same against the prisoner. That my client had applied for many witnesses, and that it was given out publicly, by the Judge, that the official authorities had no means of compelling the attendance of witnesses on the prisoner's behalf. That the Judge was communicating in private with at least one witness, and that he ordered witnesses to be detained to give evidence on behalf of the prosecutor—the Government—without there being any evidence before him judicially, to shew that these witnesses knew the prisoner. That the subpoenas issued to the witnesses for the prosecution, contained a penalty for not attendance whilst no such penalty was inserted in those issued to the witnesses for defence. That the properties of the witnesses for the prosecution *were* seized to compel their appearance, though the Perwannahs were not *served*. That the properties of the witnesses for the defence, on whom Perwannahs *had been served*, *were not* seized. That the prisoner's mocktears were beaten by a Government servant high in office and plundered on the high way, and on their road to Court, by other Government servants. of their papers, and then thrown into jail. That many of the prisoner's material witnesses were not

produced. That no reason was given why they were not produced. That witnesses were examined against him in his absence, and in the absence of any one on his behalf. That Mr. Samuells wrote to Dwarkanauth Tagore, the letter which has been quoted in the petition. That Mr. Samuells furnished or sanctioned the furnishing, of *untrue exparte reports* of the evidence for the prosecution, to a public newspaper. That be brought witnesses to prove the accused to be Kistololl, and that he sent them away, without public examination, after ascertaining from them that he was not Kistololl, and that these *same* witnesses were not produced again when applied for as witnesses for the prisoner. That Mr. Samuells purchased and distributed numbers of a native newspaper in his district, (which created an impression against the prisoner) *before* the prisoner had called a single witness in his behalf. That it was in the paper so distributed stated, that it had been clearly established that the prisoner was Kisto Loll and that he, Mr. Samuells, had been at *length* appointed full magistrate. That part of the evidence given in the magistrates Court, was abstracted. That part of the proceedings in Court were falsified. That the judge treated the prisoner's witnesses in a jeering and improper manner while sitting on the bench. That the judge took upon himself, gratuitously, to advise one of them not to give evidence for the prisonor until his expences were paid, knowing, as he must have done, that the prisoner had not the means of paying them, and that he was a prisoner in jail. That the same judge, while sitting on the bench, called one of the prisoner's witnesses, (a most respectable man, a Rajah, and a Member of one of the oldest families in Bengal,) a "guddah", or in plain English "an ass, for coming to give his evidence on the prisoner's behalf, without having first received payment of his expences from the prisoner, and that the proceedings in the Court of the Magistrate and in the Sessions' Court, were grossly unjust, partial, and unfair.

From the Nizamut having taken no notice of these changes, I am entitled to conclude that they were thought of no moment by

that Court, and that in fact, that Court, considered the conduct of the judge and Magistrate of Hooghly "quite correct."

I have little to say on the order of the 19th of July. It may happen that this may be sent to England by way of appeal. Before applying for permission to appeal, I thought it proper to assertain the authority on which the futwa was founded, in order that the authorities at home, before whom the case might come, might be aware of it, and, it necessary, might refer to it. There is nothing in the petition on which that order was made to authorise the Court to suppose that an objection was about to be raised in Court to the "legality or otherwise" of the trial and sentence. The petition was a simple application for information. After the voluntary and gratuitous expression of the Court, contained in the last paragraph of the order of, 1st July last, I was too well aware of the fate which would attend any further applications, to that Court, for a reconsideration of the case, to present any further petitions for rehearing to that Court. My own opinion is, that this excuse, which to me appears a lame one was made to avoid an admission that there was no *authority* for the Moulovy's Futwa. It is clear from the concluding paragraph of the order of the 19th of July, that the Nizamut Adawlut is determined that it will not be troubled with any more applications in this case. The value put upon a name by the government and its Courts, is apparent from the proceedings in this case, and it must be satisfactory to the Government to find, that its own courts have concurred so fully in its views, and that it has been enriched in the sum of 1,000 rupees by the ingenuity of this Law Officer.

I am aware that many object to take an interest in the proceedings in this case, because they believe my client to be an impostor. If those who view him as such, would only consider the nature of the proceedings of Government against him, they would, I am certain, admit, that even if he is an imposter, he has had gross injustice done to him; and if gross injustice is done to one

man, it may be done to all who may have the bad fortune to be prosecuted at the suit of Government, in Government Courts.

I have to apologise for trespassing on your columns at such length, and

I remain, yours obediently,

Calcutta, *August* 2, 1839. W. D. SHAW.